জাগ্রত কাশ্মীর

দুর্গাপদ তরফদার

মায়া পাবলিশার্স
১৫।এ, হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার,
কলিকাতা—১৪

ভূমিকা

কাশ্মীরের মুক্তি-আন্দোলন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে তার গভীর যোগাযোগ রয়েছে। কাশ্মীরের মুক্তিকামী নরনারীর সঙ্গে ভারতবাসীর এই ঐক্যের কথা জানা আজ প্রত্যেক দেশভক্তের কর্তব্য।

কাশ্মীরের মুক্তি-আন্দোলনের তাৎপর্য এই যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ "কুইট ইণ্ডিয়া" বলে ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসন ও শোষণ (?) মুক্ত করবেন বলে যে শপথ নিয়েছিলেন, কাশ্মীরের মুক্তিকামী জনগণের জমায়েৎ ন্যাশনাল কনফারেন্স সেই আন্দোলনকে আরও এক কদম বাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন যে, শুধু বৃটিশই ভারত ছাড়বে না, তার ছত্রচ্ছায়া-তলে পুষ্ট দেশীয় রাজ্যের শোষণকারী দেশীয় রাজা-মহারাজারাও ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত হবে। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর শোষিত মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের মর্ম কথা—অর্থাৎ সমাজে ধনী-নির্ধনের কৃত্রিম ব্যবধানের অবসান—এই আদর্শকেও নিজেদের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ।

বর্তমান কাশ্মীরে সব কিছু মিলিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আবার এক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বের চরম পরীক্ষা হবে। কাশ্মীরের জনগণের এই প্রাণবন্ত সংগ্রামের কাহিনীকেই রূপ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ের মধ্যে। পাঠককে মনে রাখতে হবে, বইটি ঐতিহাসিক গবেষণা নয়, ঘটনা পরম্পরার বিবরণী মাত্র। সেই

কাজে কতখানি সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার শ্রীসুনীল জানার 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের সংগ্রামের প্রতীক—' ছবিটি এবং তরুণ শিল্পী শ্রীচিত্ত করের স্কেচ্ গুলি বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করেছে। প্রচ্ছদপটটী এঁকে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত দেবব্রত রায়চৌধুরী।

গত দুই বৎসরের বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এই পুস্তকের প্রকাশ আজ সম্ভব হলো। ফলে ভুলত্রুটি হয়ত অনেক রয়ে গেছে।

এই বিপর্যয়ের ভেতরে কাজ করবার সময় যিনি যতটুকু যেভাবে সাহায্য করেছেন তা' আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার ক'রে তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ — দুর্গাপদ তরফদার

স্বাধীন নয়া কাশ্মীরের সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ শহীদ মকবুল শেরোয়ানীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বই উৎসর্গ করা হলো

ভারত ও কাশ্মীর···আলিঙ্গনাবদ্ধ পণ্ডিত নেহরু ও শের-ই-কাশ্মীর

মুখে হাসি চোখে বিষাদ—ন্যাশনাল কনফারেন্সের সংগ্রামের
প্রতীক আর ডোগরা-রাজের শোষণের চিহ্ন

"কাশ্মীর কাশ্মীরীদেরই"—গোলাম মহম্মদ বক্সী

শ্রমিক নেত্রী······মিস্ "কুইট কাশ্মীর"

"ডোগরা রাজ কাশ্মীর ছাড়ো"—গোলাম মহীউদ্দীন

নূতন কাশ্মীরের চারণ মজদুর কবি আসি

জাগ্রত কাশ্মীর

বা

শেখ আবদুল্লা ও নয়া কাশ্মীরের সংগ্রাম

এক

কাশ্মীরের প্রাণ স্পন্দন

তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের শাখা পরিবেষ্টিত প্রকৃতির লীলা নিকেতন কাশ্মীর। ভারতের মস্তকে যেন রৌদ্র স্নাত তুষার কিরীট। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য একে গৌরব দান করেছে; মর্ত্ত্যের অমরাবতী এই কাশ্মীরের তাই পৃথিবীতে পরিচয় "ভূস্বর্গ" বলে। এর নদ-নদী সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব ইত্যাদি, এর পার্ব্বত্য অঞ্চল, এর শান্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী—দেশদেশান্তর থেকে মানুষকে আহ্বান করেছে। কিন্তু যে দেশে প্রকৃতি তার সম্পদকে অকাতরে ঢেলে দিয়েছে সেই দেশের অধিবাসীরা কিন্তু অমরাবতীর দেবতাদের ন্যায় সুখী নয়। বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে তাদের ওপর আক্রমণকারীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন ও প্রতারণা যার ফলে ভূগোলের সীমারেখা বদ্ধ কাশ্মীর, প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের লীলা নিকেতন হ'লেও—কাশ্মীরবাসী কিন্তু রয়ে গেছে পরাধীনতা, অজ্ঞতা ও শোষণের মাঝখানে। বিদেশী আক্রমণকারী কাশ্মীরের ওপর চড়াও হয়ে তার সমাজ-জীবনকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। দেশী রাজা মহারাজা ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে পশুর মত কাশ্মীর-

বাসীদের কিনে নিয়েছে। দেশ বিদেশের ধনিক বনিক কাশ্মীরে গিয়ে ঐ মহারাজারই গুণ গান করে এসেছেন; কিন্তু কাশ্মীর অধিবাসীদের বুকভরা দুঃখের কেউ সন্ধান করেনি। সেন্সাসের গণনার মধ্যেই মাত্র তার পরিচয় সংখ্যার অঙ্কে নিবদ্ধ। কাশ্মীরবাসীর দুঃখ, বিদেশীর বুকে বিদ্রোহের আগুন না জ্বালালেও ভারতবর্ষের দেশময় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ কাশ্মীরের বাতাসকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। রাজা মহারাজা স্বার্থপর শাসকের দল কাশ্মীরের দুঃখকে বোঝেনি—কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একটী কাশ্মীরী যুবক তার দেশবাসীর ব্যথায় চঞ্চল চিত্তে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—

"মা এরা এত গরীব কেন?"

মা তাকে উত্তর দিয়েছিলেন "আল্লাহতালার ইচ্ছা।"

যুবক তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তার মাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করত—"কেন ভগবান তার এক ছেলেকে ধনী আর এক ছেলেকে পথের কাঙ্গাল করে দেবেন?"

মা তার পুত্রের প্রশ্নের সদুত্তর খুজে পেতেন না—তিনি শুধু ছল ছল নেত্রে চেয়ে থাকতেন। তখন বালকের মা বুঝতেও পারেন নি যে তাঁর এই ছেলেই হবে এক মানব দরদী বিপ্লবী; আর তার সেই বাল্যের প্রশ্ন এবং তার সমাধানই হবে এই যুবকের জীবনের একমাত্র ব্রত। ইতিহাসের উপেক্ষিত কাশ্মীরী নরনারীদের তিনিই এনে দিবেন নবজীবন—তিনিই শোনাবেন তাদের শেকল ভাঙ্গার গান। কিন্তু কে এই দুরন্ত বালক যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাশ্মীরের সাথে কাশ্মীরীদেরও স্থান করে দিতে চায়?—

দুই

শতাব্দীর অসম্মান ভার

১৮৪৬ সালের কথা, তখন ইংরেজ উত্তর ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য শেষ ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে। পাঞ্জাবের শিখ শক্তিকে বিভক্ত করে, সেই সুযোগে উত্তর ভারতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করবার চক্রান্ত চলেছে। এই জাল যদি গুটিয়ে তুলতে পারে তবে ইংরেজের করায়ত্ব হবে পাঞ্জাব হ'তে আরম্ভ করে কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিচিত্র গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ প্রদেশের গুরুত্বের কারণ শুধু এদেশের সম্পদরাজিই নয়। কারণ কাশ্মীর এমন একটী রাজ্য যার সীমানায় এসে মিশেছে এসিয়ার বৃহত্তম কয়েকটী দেশ। কাজেই সামরিক ঘাটি হিসাবেও এ-অঞ্চলের গুরুত্ব খুবই বেশী। কাশ্মীর রাজ্যের :উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে তিব্বত মহাচীনের সীমানা। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সোভিয়েট রাশিয়া ও ইংরেজ শত্রু আফগান রাজ্য। দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তকে ঘিরে রেখেছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব। ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগাযোগ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমানায়। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এই পথ দিয়েই পূর্ব্বে বহিঃশত্রুরা ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ করেছে। কাজেই ইংরেজ যখন দিল্লীতে অধিকার স্থাপন করল, তখন তার স্বভাবতই চক্ষু গেল এই অঞ্চলকে নিজ আয়ত্বে আনবার জন্য। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শিখদের পাঞ্জাব ইংরেজের হস্তগত হলো। কিন্তু কাশ্মীরে চলেছে তখনো শিখদের রাজত্ব। তাই কাশ্মীরে আধিপত্য স্থাপন

করতে ইংরেজকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল এমন একজন শিখ সর্দার-রাজাকে যিনি ইংরেজের জন্য স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইংরেজকে সহায়তা করবেন। তিনিই হলেন রাজা গুলাব সিংহ। বংশে এরা ডোগরা রাজপুত। কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা স্যার হরি সিংহ্ গৌর তারই বংশধর।

রাজা গুলাব সিংহ ইংরেজের কাছ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকায় আবার কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য কিনে নেন। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে স্বীকার করতে হয় ইংরেজের পরাধীনতা। গুলাব সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজের আধিপত্য সমগ্র কাশ্মীরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ক্রমে ভারতের শেষ প্রান্তে সোভিয়েট সীমান্তের গিলগিট অঞ্চলেও ইংরেজের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সামন্তরাজাদের স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হলো। কিন্তু তারা ইংরেজদের সহায়তায় ও ছত্রছায়া তলে সামন্তরাজ্যের প্রজাদের বুকের ওপর চেপে বসল ইংরেজের শাসন ও শোষণকে কায়েম করার জন্য।

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস আমরা পণ্ডিত কল্হন (দ্বাদশ শতাব্দী) কর্ত্তৃক লিখিত "রাজ তরঙ্গিনী" থেকেই জানতে পারি। এই পুস্তকটীর অনুবাদ করেছেন শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী স্বর্গীয় রণজিৎ পণ্ডিত। এই পুস্তকটী কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের সর্ব্বাধিক প্রাচীন লিখিত ইতিহাস। কাশ্মীরের জনসাধারণের কোন স্থান এতে নাই। কাশ্মীরের ওপর বিভিন্ন ধর্ম্মের রাজন্যবর্গ বিভিন্ন সময়ে এসে জনসাধারণের ওপর চেপে বসেছে। এবং তাঁর, বই থেকে আমরা জানতে পারি যে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে, বৌদ্ধযুগেই কাশ্মীরের ওপর একটা সুসংবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট্ অশোকের (খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০) এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলবার প্রচেষ্টার ফলে। এবং আরও জানা যায় যে তিনিই কাশ্মীরের

রাজধানী শ্রীনগর নির্ম্মাণ করেছিলেন। আজ পর্য্যন্তও কাশ্মীরের সর্ব্বাধিক প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনগরের ৺শঙ্করাচার্য্যের মন্দির। এই মন্দির বহু প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যখন হূনদের আক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন উত্তর ভারতের ওপর দিয়ে তারা অত্যাচারের বন্যায় জনসাধারণের জীবন ও সমাজকে ভাসিয়ে দেয়। মধ্য এসিয়া থেকে বর্ব্বর হূনরা (৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) আক্রমণ চালায় প্রথম তোরোমান নামক একজনের নেতৃত্বে এবং তিনি নিজেকে উত্তর ভারতে রাজা বলে ঘোষণা করেন। তখন ভারতবর্ষে চলেছে বিশ্রুত-কীর্ত্তি গুপ্ত সম্রাটদের শাসন। কিন্তু এই বর্ব্বর আক্রমণকে তাঁরা তখনো পরাস্থ করতে পারেন নি। হূনদের অত্যাচারও ক্রমশঃ উত্তর ভারতে বাড়তে থাকে। তোরোমানের মৃত্যুর পর মিহিরকুল হূনদের রাজা হন। তিনি জনসাধারণের ওপর পাশবিক অত্যাচারের জন্যই ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। পণ্ডিত কল্‌হনের রাজ তরঙ্গিনী থেকে জানা যায় যে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করেই তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর নাকি খুব প্রিয় ক্রীড়া ছিল—হাতী বা অন্য কোন প্রাণীকে উঁচু থেকে কাশ্মীরের পার্ব্বত্য খাঁদে ফেলে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা। এই অত্যাচারী হূন নেতাকে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ হিন্দুরাজা বলাদিত্যের নেতৃত্বে আক্রমণ করে পরাস্থ করেন। বলাদিত্য পরাজিত হূন নেতাকে ক্ষমা করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু হূন নেতা "ভারত ত্যাগে"র ভাণ করে কাশ্মীরে এসে লুকিয়ে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে বলাদিত্যকে আবার আক্রমণ করে। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারে না। এর পরই তাদের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্রমশঃ হূনরা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে

যায়। ঐতিহাসিকরা বলেন যে রাজপুতনার এবং মধ্যভারতের কোন কোন গোষ্ঠির মধ্যে হূনদের রক্ত মিশে আছে।

উত্তর ভারতে হূনদের অত্যাচারের শেষ পর্য্যায় কাশ্মীরের ওপর দিয়েই বিশেষ করে চলে। মিহিরকূলের উত্থান-পতনের প্রধান এক ক্ষেত্র ছিল এই দেশ। কাশ্মীরী জনসাধারণের জীবন তাতে হয়েছে ক্ষত বিক্ষত।

হূনদের পরাজিত করে কাশ্মীরে হিন্দু রাজন্যবর্গ আধিপত্য বিস্তার করেন ৭ম শতাব্দীতে এবং হিন্দু রাজাদের মধ্যে যারা কাশ্মীরে শাসন করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রবরসেনা (২য়), ললিতাদিত্য এবং অবন্তীবর্মা বিখ্যাত। এদের শাসন কালে কাশ্মীরের জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য দূর না হলেও বাইরের দিক থেকে কাশ্মীরকে সুন্দর করবার চেষ্টা চলতে থাকে। হিন্দু নৃপতিগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ হওয়ায় তাঁরা কাশ্মীরে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এদের মধ্যে রাজা প্রবরসেনা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কালী অষ্টপানির মন্দির, রাজা রামাদিত্য প্রতিষ্ঠিত *মার্ত্তণ্ডের মন্দির; রাজা অবন্তীবর্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রাজধানী অবন্তিপুর—এ সবই ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আজ আর অবন্তিপুরের সে ঐশ্বর্য্য নেই—আছে শুধু মহাদেবের ২টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার প্রতীক প্রাচীন নগরীর ধ্বংশাবশেষ।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আবার ক্ষমতা লোলুপ বিদেশীর আক্রমণে বিপর্য্যস্থ হ'তে থাকে। কাশ্মীরের জনসাধারণ হূন আক্রমণের পর হিন্দু রাজাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে যে শান্তির [সুখ না হলেও] আস্বাদ পেয়েছিল তা আবার ভেঙ্গে চুড়ে যায়। সুলতান মাহমুদ (১০০১ খৃঃ) থেকে আরম্ভ করে তৈমুরলং (১৩৯৮ খৃঃ) পর্য্যন্ত সমগ্র

* ৮ম শতাব্দীতে এই মন্দিরের বিশেষ সংস্কার করেন রাজা ললিতাদিত্য।

উত্তর পশ্চিম ভারতের উপর যে পাশবিক আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি চলতে থাকে, তাতে কাশ্মীরে শাসন অতি দ্রুত বিভিন্ন হাতে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। এই বিভিন্ন হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে যখন ভারতে মুসলিম অধিকার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কায়েম হলো তখন ধীরে ধীরে কাশ্মীরের ওপর নেমে আসল আবার নূতন অত্যাচারের পালা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাশ্মীরে পাকাপাকি ভাবে মুসলিম শাসন কায়েম হলো। এবং সুলতান সিকান্দার এই সময় কাশ্মীরে শাসন আরম্ভ করেন! ঐতিহাসিকরা বলেন যে তিনি কাশ্মীরের জনসাধারণের ওপর আবার অত্যাচার স্থরু করেন। তিনি কাশ্মীরের জনসাধারণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। ফলে বহু দরিদ্র হিন্দু কাশ্মীরী পরিবার প্রাণের ভয়ে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বহু কাশ্মীরী পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিকরা বলেন যে সিকান্দার শাহ, তরাদেগা (৬৯৭ খৃঃ) নামক জনৈক হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী মন্দিরকে ভেঙ্গেই তার উপর তিনি কাশ্মীরের বর্ত্তমান জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। অবশ্য জয়নাল আবেদীন নামক আর এক-জন মুসলিম শাসন কর্ত্তা কাশ্মীরে উদার শাসন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন; এবং তাঁর নীতির ফলে কিছু কিছু কাশ্মীরী জনসাধারণ যারা সুলতান সিকান্দারের অত্যাচারে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তারা কিছু সংখ্যায় ফিরে আসেন। কিন্তু সিকান্দারের অত্যাচার কাশ্মীরে যে আঘাত দেয় তা কাশ্মীরী জনসাধারণের জীবনে এক স্থায়ী রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। যার ফলে কাশ্মীর মুসলমান প্রধান হয়ে ওঠে।

শোনা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরের বহু ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তি আবার হিন্দু সমাজে ফিরে আসবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

করায়, কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তা কাশীতে হিন্দু পণ্ডিত সমাজের কাছে বিধান চেয়ে পাঠান। কিন্তু কাশীর গোঁড়া পণ্ডিতের দল বিধান দেন যে ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তি আর হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে পারে না।*

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে (১৫৮৬ খৃঃ) কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং মোগল শাসন কাশ্মীরে প্রায় দুইশত বৎসর চলে। মোগল শাসনের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন রকমের মসজিদ, প্রমোদ উদ্যান ইত্যাদি। হিন্দু সামন্ত রাজাদের ন্যায় এখানেও আমরা দেখতে পাই ধর্ম্মকে আশ্রয় করেই শাসন চলতে থাকে ও তারই নিদর্শন স্বরূপ মন্দিরের ন্যায় গড়ে ওঠে মস্‌জিদ। কাশ্মীরের ওপর ধর্ম্মের নামে শাসনের পরাকাষ্ঠা হয়ে আজও তারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে কী ভাবে ধর্ম্মের আবরণ দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে এই সব সামন্ত রাজা ও বাদশাহরা জনসাধারণকে শাসনের নামে শোষণ করেছে।

মোগল শাসনের আমলে যে সমস্ত প্রমোদ উদ্যান কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগরের আশে পাশে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সম্রাট আকবরের স্থাপিত

---

*"In Kashmir a long continued process of conversion to Islam had resulted in 95% of the population becoming Moslems, though they retained many of their old Hindu customs. In the middle nineteenth century the Hindu ruler of the State found that very large numbers of these people were anxious or willing to return en bloc to Hinduism. He sent a deputation to the pundits of Benares inquiring if this could be done. The pundits refused to countenance any such change of faith and there the matter ended."—Discovery of India—Nehru. Page 218-19 [Third edition]

নাসিম বাগ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের শালামার বাগ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী আসীফ খান দ্বারা স্থাপিত নিশাত বাগ, সম্রাট শাহজাহান কর্ত্তৃক স্থাপিত চশমা শাহী উদ্যান প্রসিদ্ধ। শ্রীনগর থেকে অনতিদূরে বারমূলার পথে সাড়ীবদ্ধ সফেদা বৃক্ষশ্রেণী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান নগর-পথটীকে সুসজ্জিত করবার জন্ম বিশেষ ভাবে বিদেশ থেকে এনে লাগিয়েছিলেন। এ ছাড়াও কাশ্মীরে মোগল ঐশ্বর্য্যের আরও নিদর্শন রয়েছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য যখন ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে তখন (১৭৪৮ খৃঃ) কাশ্মীরের ওপর নেমে আসে আবার বহিঃ শত্রুর আক্রমণ। এবার আক্রমণ করে আফগানিস্থানের আহমদ শাহ আবদালী এবং ঐতিহাসিকরা বলেন যে এদের শাসন কাশ্মীরের ওপর চলে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এরা দুর্ব্বল হয়ে পড়লে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর পাঞ্জাব কেশরী শিখ নেতা মহারাজা রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কাশ্মীরের ওপর আহমদ শাহের শাসন খুবই নিষ্ঠুর ছিল। সেই নিষ্ঠুর শাসনে নিপিষ্ট কাশ্মীর আবার ভারতীয় সামন্ত রাজার অধীনে ফিরে এল। বিদেশী আক্রমণকারীর হাত থেকে কাশ্মীর বানী আবার ফিরে এল ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে। মহারাজা রণজিৎ সিংহ কাশ্মীরে একটী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহারাজার একজন বিশ্বস্থ রাজপুত সৈনিক গুলাব সিং (ডোগরা বংশীয় রাজপুত) পদোন্নতির ভিতর দিয়ে আপন প্রতিভা ও কৌশলের বলে জম্মুর রাজা বা শাসন কর্ত্তার পদলাভ করেন। এই গুলাব সিং একজন সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। এবং ১৮৩৯ খৃঃ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ পুরোপুরি তিনি গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর অপর দুই ভাইদের আপন স্বার্থ সিদ্ধির পথ হতে সড়িয়ে দেবার চক্রান্ত

করেন ; এবং তার পর যখন ১৮৪৫-৪৬ খৃঃ শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে, তখন এই গুলাব সিং শিখদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইংরেজ-দের জয়লাভে সহায়তাই করেন। তিনি বাহ্যতঃ নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে কার্য্যতঃ ইংরেজদেরই সহায়তা করেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি দেখতে পেলেন যে এই স্বজাতিদ্রোহী রাজাকে দিয়ে আরও অনেক কাজ হবে। সুতরাং গুলাব সিংকে তার আপন জাতি ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্রিটিশ পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা উচিৎ।

পরাজিত শিখ শক্তির কাছ থেকে ইংরেজ এমন সন্ধি চুক্তি আদায় করল যাতে বলা হল যে লাহোরের মহারাজা [অর্থাৎ শিখ শক্তি] গুলাব সিংহের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপই তাকে জম্মু এবং তৎসংলগ্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্বাধীন নৃপতি বলে স্বীকার করলেন। এই চুক্তিই ১৮৪৬ সালের লাহোর সন্ধিপত্র বলে খ্যাত। কিন্তু ইংরেজ আর একটু বেশী করে গুলাব সিংকে পুরস্কৃত করবার জন্য পরাজিত শিখ দরবারের কাছে প্রায় দেড় কোটী টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবী করে। কিন্তু তাঁরা ইংরেজের এত দাবী মেটাতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু টাকা নগদ দিয়ে বাকী টাকার পরিবর্ত্তে ইংরেজকে অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চরদিগকে—কাশ্মীর রাজ্য দিয়ে দেন। কিন্তু ইংরেজ ত' আর এদেশে নিজে শাসন করতে তখনো শেখেনি তাই তারা গুলাব সিংহের সঙ্গে ১৮৪৬ সালের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে এক পৃথক সন্ধি করল, যার সহজ অর্থ হল—ইংরেজ ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে গুলাব সিংহের কাছে কাশ্মীর বিক্রী করে দিল। কিন্তু গুলাব সিংহ ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করেই এই রাজ্য দু'টী পেলেন।

এই সন্ধির ১ম সর্ত্তেই স্পষ্ট করে বলা হল :—

"The British Govt. transfers and makes over, for ever, the independent possession to Maharaja Golab Singh, and the male heir of his body, all the hilly or mountainous country, with its dependencies, situated to eastward of the river Indus and westward of river Ravee, being part of the territory ceded to British Government by the Lahore state."

—অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে লাহোর ষ্টেট (পরাজিত শিখ শক্তি) সিন্ধুনদের পূর্ব্বে ও রবিনদের পশ্চিমে অবস্থিত যে বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চল অর্পণ করেন, তা সেই অঞ্চলের সমস্ত অধীনস্থ রাজ্য সহ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চিরদিনের মত মহারাজা গুলাব সিংহ ও তাঁর পুরুষ উত্তরাধিকারীগণের কাছে হস্তান্তর করে দিল।

এই সন্ধির ৩য় ধারায় বিক্রীর কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :—

"In consideration of the transfer made to him and his heirs..... Maharaja Golab Singh will pay to the British Govt. the sum of rupees 75 lakhs"—

—অর্থাৎ এই হস্তান্তরের বিনিময়ে মহারাজা গুলাব সিংহ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ৭৫ লক্ষ টাকা দেবেন—

আর ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করে নেবার জন্য চুক্তিতে বলা হয় :—

"...in token of such supremacy to present annually to the British Government, one horse, 12 goats of approved breed (six male and six female) and three pairs of Kashmiri shawls."—

—অর্থাৎ এই আধিপত্য স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ প্রতি বৎসর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে **একটী** ঘোড়া, **১২টী** মেষ (ছয়টী পুরুষ এবং ছয়টী স্ত্রী জাতীয়) এবং ৩ জোড়া কাশ্মীরী শাল, মহারাজা দেবেন।

এমনি করেই কাশ্মীর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন শক্তির আক্রমণ ও শোষণের মধ্য দিয়ে এসে গুলাব সিংহের কাছে হস্তান্তরিত হয়। কাশ্মীরবাসীদের ওপর দিয়ে আক্রমণকারীদের স্বেচ্ছাচারিতার রথচক্র এমনিভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু এই হতভাগ্য কাশ্মীরবাসীদের কথা কেউ কোন দিন চিন্তা করেনি। তাদের ভাগ্য নিয়ে এমনিভাবেই চলে এসেছে ছিনি মিনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনসাধারণের শিরে জমেছে এই সামন্ত রাজাদের শাসন, শোষণ ও নিষ্পেষণ। এই শতাব্দীর অসম্মান ভার তাদের হীনবল করেই রেখেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ায় আসমুদ্র হিমাচল নতুন শক্তিতে জেগে ওঠে। নবীন কাশ্মীরের প্রাণেও আসে জিজ্ঞাসা—কেন এই দারিদ্র্য ? কেন এই শোষণ ? কেন এই শতাব্দীর অপমান চিহ্ন তাদের ললাটে অঙ্কিত ?

পণ্ডিত নেহেরু আজ যে-ভাবে কাশ্মীরের জনসাধারণকে বর্ব্বর আক্রমণের হাত থেকে বাচাবার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন, ঠিক এই দরদী দৃষ্টি দিয়েই উপেক্ষিত কাশ্মীরবাসীর ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর Glimpses of World History নামক পুস্তকে। এই গুলাব সিংহের কুকীর্ত্তির কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"Kashmir was sold by the British to a certain Raja Gulab Singh of Jammu for about seventy five lakhs of rupees. It was a burgain for Gulab Singh. The poor people of Kashmir of course did not count in the transaction.".

—জম্মুর রাজা গুলাব সিংহের কাছে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকায় কাশ্মীরকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিক্রী করে দেয়। গুলাব সিংহের পক্ষে এই বিক্রয় লাভজনক হলেও হতভাগ্য কাশ্মীরের অধিবাসীদের কোন স্থান এতে ছিল না।

আজ কাশ্মীরের সেই প্রবঞ্চিত জনসাধারণ জেগেছে। তারা আপনাকে চিনেছে, আপনার শক্তিকে চিনেছে ও আপনার দেশকে ভালবাসতে শিখেছে। এবং আজ যখন আবার তার ওপর এনেছে সেই বর্ব্বর বহিঃশত্রুর আক্রমণ তখন সে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে ভারতের প্রগতিপন্থী শক্তির সাহায্য নিয়ে সেই পাশবিক হামলা ও শোষণের ঘাটিকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে বদ্ধপরিকর। নিজের আজাদীকে সে রক্ষা করছে কারণ অসম্মানের বোঝা এবার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে মানুষের মত সে দাড়াতে চায়। স্বাধীন ভারতে কাশ্মীরী জনসাধারণ সর্ব্বাঙ্গীন দাসত্ব ও শোষণের হাত থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে চায়।

এই নূতন প্রাণ স্পন্দন যাকে আশ্রয় করে কাশ্মীরে জন্মলাভ করেছে তিনিই আমাদের শেখ আবদুল্লা। কাশ্মীরের জাতীয় আন্দোলন তাঁকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। তাঁর জীবন ও কাশ্মীরের জাতীয় আন্দোলন একই। এই আন্দোলনের ইতিহাসও যা শেখ আবদুল্লার জীবনও তাই।

———

তিন

আবদুল্লার ছেলেবেলা

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উপকণ্ঠে (৬ মাইল দূরে) সৌরা গ্রাম। কাশ্মীরের দুটী মনোরম হ্রদ ডাল ও আনচার, এর মাঝখানে এই গ্রামখানি। এখানকার শাল পৃথিবী বিখ্যাত। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই এক সময়ে শাল বুনিয়ে জীবন যাপন করত। কিন্তু সস্তায় বিদেশী নকল শাল বাজার ছেয়ে ফেলায় এদের অধিকাংশের অবস্থা আজ খারাপ হয়ে গেছে। এদের অনেকেই আজ মজুরে পরিণত। যেমন পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ তাঁত শিল্পী—যারা মসলিন ইত্যাদি একদিন প্রস্তুত করতেন, তারা আজ কেউ বা স্বর্ণকার, কেউ বা মিলমজুর, কেউ বা দেশ বিভাগের ধাক্কায় তলিয়েই গেছেন।

এই সৌরাগ্রামের এমনি একটী দরিদ্র শাল সওদাগরের বংশে ১৯০৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে এক মুসলিম শেখ পরিবারে আবদুল্লার জন্ম হয়। তার পিতার নাম ইব্রাহিম। তিনি পুত্রের জন্মের ১৫ দিন পূর্ব্বেই মারা যান। তিনি দুটী বিয়ে করেছিলেন এবং তার ছয় পুত্র। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেই সেখ আবদুল্লার জন্ম।

ছেলে বেলা থেকেই আবদুল্লা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। এবং তার খেলার সাথীদের মধ্যে তিনি বেশ "কেউ কেটা" ছিলেন। তিনি খেলাধূলায় যেমন পটু ছিলেন, দুষ্টামিতেও তেমনি পটু ছিলেন। আর তার ঝোক ছিল ভূতের গল্প শোনবার জন্য। গল্প শোনবার জন্য তার মাথায়ও যেন ভূত পেয়ে বস্‌ত। কিন্তু ভূতের গল্প শুনে ঘাবড়াবার পাত্র

তিনি ছিলেন না। তার দুষ্টপনাতে তার বড় ভাই সব চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। অন্য উপায় ভেবে না পেয়ে, ৫ বৎসর বয়সের সময় তাকে এক মোল্লার কাছে বর্ণপরিচয় এবং পবিত্র কোরাণ শিক্ষাভ্যাসের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দুই বৎসর মোল্লার কাছে পাঠ শিক্ষার পর তাকে নৌসেরা সহরে ইসলামিয়া হাই স্কুলের একটী শাখা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। ক্রমে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ২ বৎসর পড়বার পর তার বড় ভাই তার পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তার মেঝ ভাই এদের মধ্যে কিছু লেখাপড়া জানতেন। তাই তিনি আবদুল্লার শিক্ষা বন্ধ করে দিতে মত দিলেন না। সুতরাং তাকে আবার সেই প্রাইমারি স্কুলে ফিরে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো। এখানে তিনি আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত পড়াশুনো করেন। এবং কিছু কিছু ইংরেজী ও অঙ্ক উর্দ্দূ ভাষার সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করেন। পড়াশুনোর দিকে তার বেশ ঝোক ছোট বেলা থেকেই দেখা যায়। এবং এই বিদ্যালয়ে ভাল পড়াশুনো হ'তো না বলে আবদুল্লা সে স্কুলে পড়বে না বলে বেঁকে বসল। আর অন্য স্কুলে যাবার জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে অনুমতি পত্র চাইলেন। কিন্তু মাষ্টার মশায় অনুমতি পত্র দিতে অস্বীকার করায় তার রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনিও ছাড়বার পাত্র নন। সেই বার বৎসরের ছেলে তার দাবী প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্কুলের ইনস্পেক্টরের কাছে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত করলেন এবং অনুমতি পত্র আদায় করতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত সক্ষম হন। তার জীবনে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এই প্রথম "যুদ্ধ"। এতেই তার ভবিষ্যৎ জঙ্গী নেতৃত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনুমতি পত্র পাওয়ার পর তিনি নিকটবর্ত্তী বিচারনগর গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকেই পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আবদুল্লার মনে একাধারে ছিল যেমন দুর্দান্ত সাহস অপর দিকে ছিল তেমনি নিজ গ্রামবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসা। শিশু মনের এই স্বজন ও স্বদেশ প্রীতিই তার দেশাত্মবোধের মূল ভিত্তি। এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য সিংহের শক্তিতে লড়াই করে থাকেন। এই সময়ের একটা ঘটনা থেকেই আমরা তা কিছুটা অনুমান করতে পারব।

আবদুল্লার বাড়ীর পাশেই বাস করত একটী ঋণগ্রস্থ দরিদ্র পরিবার। সেই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব গৃহস্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর একটী ১৬ বৎসরের যুবকের উপর পরে। সেই অপরিণত বয়স্ক যুবক দিন মজুরী করে অনাহারে অর্দ্ধাহারের মধ্য দিয়ে কোনরূপে তাদের সংসার চালাত। কিন্তু অনাহারে থাকলেও মহাজনের হাত থেকে পরিবারের নিস্তার ছিল না। দেনার দায়ে তাদের প্রতিদিন শুনতে হ'ত অকথ্য গালিগালাজ ও সহ্য করতে হত অসহ্য অপমান। যুবক আরও কষ্ট করে দিনমজুরীর আয় বাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল যাতে মহাজনের দেনা শোধ করা যায়। দেনা যদিও শোধ করা যায় কিন্তু সুদ কিছুতেই শোধ হয় না। অতিরিক্ত খাটুনীতে সুদর্শন কাশ্মীরী যুবকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং হঠাৎ সে মারা যায়। তার মৃত্যুতে সেই অসহায় পরিবারের সম্মুখে নেমে আসে অনাহার ও ভিক্ষুক জীবনের কালো ছায়া! সেই পরিবারের আকুল ক্রন্দন বালক আবদুল্লার মনে শেলের মত বাজলো। তার মনে হলো আজ তার ভাই আছে, তাই তার দুবেলা আহার জুটছে; কিন্তু যদি তারা না থাকতো তবে তার নিজেরও এদেরই মতো অনাহারে হয়ত মরতে হতো! তার না হয় ভাই আছে তাই আহার জুটছে, কিন্তু এই হতভাগাদের ন্যায় তার শত সহস্র প্রতিবেশীরও ত আহার জুটছে না! কে তাদের হিসাব রাখে।

কে তাদের খোঁজ করে। তার শিশু মনে কেবল প্রশ্ন আসত কেন এই দারিদ্র্য, অপমান ও মৃত্যু? কেন? কেন? কাশ্মীরী জনগণের দুঃখ-সাগরের আহ্বান বালক আবদুল্লাকে চঞ্চল ক'রে তুলত। কী যে সে করবে তা সে নিজেই ভেবে পেত না। নিস্ফল আক্রোশে তার প্রাণটা শরবিদ্ধ পাখীর ন্যায় ছটফট করে গুমরে কাঁদত! তবে কি মুক্তির কোন পথই নেই?

প্রাইমারী স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করবার পর সমস্যা দাঁড়ালো তার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে। তার বাড়ীর কাছে স্কুল না থাকায় স্থির হলো যে যদি আবদুল্লা ৫ মাইল দূরে যে সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে সেখানে যেয়ে পড়তে রাজী হয় তবেই তার পড়া চলতে পারে নচেৎ নয়। কারণ পরিবারের অবস্থা এমন ভাল নয় যে তাকে সহরের ছাত্রাবাসে রেখে তারা পড়াতে পারেন। আবদুল্লা ঠিক করলেন তিনি পায়ে হেটেই এই পাচ মাইল পথ যাতায়াত করবেন কিন্তু তবু পড়াশুনো তাকে করতে হবেই। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে তাকে প্রতিদিন দশ মাইল পথ হাটতে হত। এতে পড়াশুনোর কিছু ব্যাঘাত হতোই, তা সত্ত্বেও এইভাবেই তিনি পড়াশুনো চালিয়ে যান, এবং ১৯২২ খৃঃ ১৭ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করবার সময় একটী ঘটনা তার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিন স্কুলের পথে যেতে তিনি দেখেন একটী গরীব কাঠুরিয়াকে একজন রাজকর্ম্মচারী মারছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানতে পারলেন যে, গরীব কাঠুরিয়া অনেক দূর থেকে কাঠগুলি কিনে এনেছে বাজারে বিক্রি করবার জন্য, যাতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করে তার পরিবারবর্গকে অনশনের হাত থেকে কোনরূপে বাচাতে

পারে। সরকারী কর্ম্মচারী তার কাছে বিনা পয়সায় ভাল ভাল কাঠগুলি চাওয়ায় গরীব লোকটী অনুনয় করে বলে "আপনি দয়া করে এগুলি নেবেন না; কারণ এগুলি যদি বাজারে নিয়ে যেয়ে আমি বিক্রি করতে পারি তবে দু'পয়সা পাবো।"

এতেই সরকারী কর্ম্মচারীটী রেগে তাকে মারতে আরম্ভ করে। এমন সময় আবদুল্লা সেখানে এসে উপস্থিত হওয়ায় লোকটীকে আর তিনি মারতে পারলেন না। এবং আবদুল্লাও ঘটনাটী শুনে সরকারী কর্ম্মচারীটীকে এমন কথা শুনিয়ে দেন যে বাধ্য হয়ে তিনি পালিয়ে রক্ষা পান। তখন আবদুল্লার মনে হলো যে, শাসনকর্ত্তার আমলে এমন অত্যাচার চলে সে শাসনকর্ত্তা নিজেও নিশ্চয়ই খারাপ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবার পর স্থির হয় যে আবদুল্লা ভবিষ্যতে ডাক্তারী পড়বে এবং তার জন্যই তাকে বিজ্ঞানে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো। তাঁর গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে শ্রীপ্রতাপ কলেজে আই, এস, সি বিভাগে আবদুল্লা ভর্ত্তি হলেন। প্রতিদিন তাকে এই ছয় মাইল পথ যাতায়াত করতে হতো। দৈনন্দিন পড়া, দিনান্তে বারো মাইল রাস্তা হাটবার পথ-ক্লান্তি এবং বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবোরেটরীর কাজের চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তখন তাকে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও আবদুল্লা পড়া ছাড়তে রাজী নন। তিনি তাঁর ভাঙ্গা স্বাস্থ্য নিয়েই পড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটরীর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে যোগ দেওয়ার সুবিধা খুব কমই হয়। কাজেই ১৯২৪ সালে অসুস্থতা নিয়েই পরীক্ষা দিলে পরীক্ষার ফল তাকে নিরাশ করে। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে উপযুক্ত নম্বর না রাখতে পারায় অকৃতকার্য্য

হলেন। যাহোক তিনি পরের বৎসর কৃতকার্য্য হলেন এবং লাহোরের ইসলামিয়া কলেজে বি, এস, সি পড়বার জন্য ভর্ত্তি হলেন। এই প্রথম তিনি কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থা বাইরের জগতের তুলনায় বোঝবার সুযোগ পেলেন।

১৯২৪ সালে যখন তিনি পরীক্ষা দেন তখন কাশ্মীরে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাকে কাশ্মীরের প্রজা আন্দোলনের সূচনা বলতে পারি। এই বৎসর কাশ্মীরের কতিপয় মুসলিম প্রজা রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানিয়ে একটী আবেদন মহারাজার নিকট পেশ করেন। মহারাজা আন্দোলনকারীদের ওপর ভয়ানক রেগে যান এবং তাদের সকলকেই রাজ্য থেকে বের করে দেন।

তাঁরা কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে আসেন। এখানে তাদের আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তারা অনুযোগ করে বলেন যে, যে কাশ্মীরী জনসাধারণের জন্য তারা আবেদন করলেন—(যার ফলে তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হল)—সেই জনসাধারণই আজ তাদের কথা একবার স্মরণও করে না।

আবদুল্লা তাদের বললেন যে তোমরা ভুল করেছ। জনসাধারণকে তোমাদের কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষ সমর্থন করত। কিন্তু আবদুল্লার কথার অর্থ তাঁরা বুঝতে না পেরে তাঁকে সহানুভূতিহীন ভেবে মনঃক্ষুণ্ণ হন। আবদুল্লা কিন্তু তাদের নিরুৎসাহিত না করে বললেন যে তিনি একাজ নিজে করে প্রমাণ করে দেবেন।

আলিগড় বিশ্ববিত্থালয়ে

১৯২৪ সালে আবদুল্লা বি, এস, সি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতায় তাঁর পড়াশুনা খুবই ব্যাহত হয়েছিল। ফলে পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হলেন। পর বৎসর (১৯২৫) তিনি বি, এস, সি পরীক্ষায় পাশ করেন এবং আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য আলিগড় বিশ্ববিত্থালয়ে এম, এস, সি ক্লাশে ভর্ত্তি হলেন। এম, এস, সিতে তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)।

আবদুল্লা যখন আলিগড়ে আসলেন ভারতবর্ষে তখন চলেছে খিলাফৎ আন্দোলনের পরবর্ত্তী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্মরণীয় যুগ। এই আন্দোলনের প্রভাব তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। আর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঐক্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলেন। এই ধারণা তাঁর আরও বদ্ধমূল হলো যখন তিনি লবণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যক্ষ দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন কি করে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম ভারতবাসী উদ্ধত ইংরেজ শাসকের দম্ভকে পরাস্ত করতে সমর্থ হচ্ছে। আবদুল্লা এক নূতন প্রেরণা ও এক নূতন অস্ত্রের সন্ধান নিয়ে ১৯৩০ সালে এম, এস, সি পরীক্ষায় পাশ করে—কাশ্মীরে ফিরে আসলেন; যেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম আকাশের এক ফালি বৈশাখী মেঘ।

আবদুল্লা কাশ্মীরে ফিরে গেলেন ভাল ও মন্দ দুই রকম অভিজ্ঞতা নিয়েই। তিনি আলিগড় ও লাহোরে দেখতে পেলেন ভারতবর্ষের জনসাধারণ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে কী ভাবে লড়াই করছে, আর কাশ্মীরে তিনি দেখতে পেলেন জনসাধারণ শোষিত হয়েও

অম্লান বদনে কীভাবে এই দাসত্বের জীবন বহন করছে। কোন প্রতিবাদ করছে না। লাহোরে ও আলিগড়ে তিনি দেখেছেন যে কাশ্মীরীদের এই ভীরুতার জন্য কি ঘৃণার চক্ষেই না তাদের দেখা হ'তো। এই অপমান কাশ্মীরী হিসাবে তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনায় বিশেষভাবে আঘাত করে। এইরূপ ভাবেই তাঁর মধ্যে জাতীয় আত্ম-সম্মান বোধ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে

কাশ্মীরে এসে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে তিনি কী করবেন? ভাল ছেলেটির মত একটী চাক্‌রী নিয়ে বাকি জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবেন, না কাশ্মীরীদের দাসত্ব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন? প্রশ্ন খুবই কঠিন, কারণ তাঁর প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে তাঁর চাক্‌রী নেওয়া ছাড়া অন্য এমন কিছুই করা উচিত হবে না যা তাঁর উপার্জ্জনের ব্যাঘাত করবে। কিন্তু তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে কাশ্মীরের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে ঠেলে নিয়ে আসে। কাজেই গোড়া থেকেই দেখা যায় যে শেখ আবদুল্লার জীবন পেশাদারী সৌখীন নেতার জীবন নয়। ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে মর্য্যাদাপূর্ণ জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশই আমরা শেখ আবদুল্লার জীবনে দেখতে পাব।

কাশ্মীরে ফিরে আসবার পর তিনি দেখতে পেলেন যে কাশ্মীর রাজদরবারের সরকারী চাকুরীতে কাশ্মীরী মুসলমানদের কোন স্থান নাই। যদিও তারা শিক্ষায় খুবই পশ্চাৎপদ তথাপি যারা শিক্ষিত কাশ্মীরী মুসলমান তাদেরও সরকারী চাকুরীতে স্থান নাই বললেই

হয়। সরকারী চাকুরী ও রাজকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রেই ডোগরা (রাজপুত) সম্প্রদায়ের ও মোটা মাইনের ব্রিটীশ কর্ম্মচারীদের আধিপত্য। আর সরকারী চাকুরীতে ঢোকবার জন্য যে "Civil Service Recruiting Board" গঠন করা হয়েছিল—সেই বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষও এমন সর্ত্ত চাকুরীর জন্য আরোপ করতেন যে তাতে কাশ্মীরী মুসলমানদের চাকুরী পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই কাশ্মীরের সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায় হয়েও কাশ্মীরের মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে তাদের ন্যায্য অংশ হ'তে বঞ্চিত ছিলেন। সেখ আবদুল্লা স্থির করলেন যে তিনি এর প্রতিকার প্রার্থনা করে রাজদরবারে একখানি আবেদন পেশ করবেন। ১৯৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করে রাজদরবারে সত্যিসত্যিই আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু তাঁর এই আবেদনে সই সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ ৬ বৎসর আগে যারা অনুরূপ আবেদনে সই করেছিল তাদের কথা মনে করে অনেকেই ভয়ে সই করতে চাইলেন না। কিন্তু ১৯২৯ সালের শেষভাগে লাহোর কংগ্রেসের ঢেউ কাশ্মীরেও এসে লাগে এবং কয়েকজন কাশ্মীরী যুবক সাহসী হয়ে সেখ আবদুল্লার কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। তাদের সহায়তাই সেখ সাহেবের আবেদনে সই উঠে যায়। তিনি ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন পত্র রাজদরবারে পাঠান। এদিকে মহারাজা হরি সিং তখন স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য ফ্রান্সে থাকায় রাজকার্য্য পরিচালনাকারী মন্ত্রীসংসদ সেখ আবদুল্লাকে ডেকে পাঠান। সেখ আবদুল্লা এই প্রথম কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সামনাসামনি বক্তব্য বলবার সুযোগ পেলেন। স্বভাবজাত নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার সঙ্গেই তিনি দরিদ্র কাশ্মীরী মুসলমানদের

দাবীর কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু মন্ত্রীসংসদ তাঁর দাবী মানতে রাজী হলেন না। এই ভাবেই তাঁর আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হলো। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামও প্রথম যুগে আবেদন নিবেদন পন্থার ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করেছিল। কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাব।

রাজদরবারের ব্যর্থতা সেখ আবদুল্লাকে এক সমস্যায় ফেলল। নিরুৎসাহিত চিত্তে তিনি কি সংগ্রামের পথ ছেড়ে দেবেন, না রাজদরবারের এই উপেক্ষার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেন? সেখ আবদুল্লা শেষের পথটাই বেছে নিলেন। জীবনে ব্যর্থতাকে তিনি জানেন না। তিনি তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে জনমত সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন। এই সময় তাঁরা একটী পাঠাগারের সংগঠনের মধ্য দিয়ে কাজ সুরু করেন। তারজন্য তাদের দল শ্রীনগরে "রিডিং রুম পার্টি" (Reading Room Party) বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেখ সাহেব কাশ্মীরের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করবার জন্য সংবাদ পত্রের সহায়তা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কোন এক বন্ধুর মারফৎ কাশ্মীরের প্রজাদের দুর্দ্দশার সংবাদ ও তার ওপর ভিত্তি করে বিবিধ প্রবন্ধ কাশ্মীর রাজ্যের বাইরে পাঠাতেন। বিশেষ করে লাহোরের কয়েকটী সংবাদপত্র এগুলি প্রকাশ করে কাশ্মীরবাসীদের বিশেষ উপকার করে। লাহোরের "ইনকিলাব" নামে উর্দ্দু দৈনিক এগুলি প্রকাশ করায় —এই পত্রিকাটীর প্রচার কাশ্মীরের রাজদরবার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এর ফল হল এই যে লাহোর থেকে "কাশ্মীরী মুসলমান" নাম দিয়ে আর একটী পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে আর তা কাশ্মীরের ডাক বিভাগ মারফৎ প্রচার হতে থাকে। কিন্তু কাশ্মীরের ডাক বিভাগ ভারত

সরকারের হাতে থাকায়—কাশ্মীরের রাজদরবার সহসা এর প্রচার বন্ধ করতে অসমর্থ হন। এদিকে এর প্রচার দিনে দিনে বাড়তে লাগলো এবং এর লেখাগুলি কাশ্মীরীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন এনে দেয়। রাজদরবার তখন এই পত্রিকাটির সংখ্যাগুলি ডাকঘর থেকে বিলি করবার জন্য বের হওয়া মাত্র বাজেয়াপ্ত করতে থাকেন। এতে শিক্ষিত কাশ্মীরী মুসলমানদের জনমত বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যখন "কাশ্মীরী মুসলমান" পত্রিকার উপর সরকার এইরূপ দমননীতি চালাতে আরম্ভ করলেন তখন আন্দোলনকারীরা দমে না যেয়ে "মজলুম কাশ্মীর" নাম দিয়ে আরও একটী পত্রিকা, কাশ্মীরী মুসলমানদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করবার জন্য প্রকাশ করলেন। কাজেই ধীরে ধীরে আন্দোলন চলতে লাগল এবং সরকার হঠাৎ আরও দমননীতির পথ গ্রহণ করতে সাহস পেলেন না। তারাও আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মহারাজা (স্যার হরি সিং) ফ্রান্স থেকে ফিরে আসলেন এবং ঘটনার বিবরণ অবগত হলেন।

মহারাজা ফিরে আসবার পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধনী জায়গীরদারের দল তাদের রাজানুগত্য দেখাবার জন্য এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। প্রথমে ঠিক ছিল যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জায়গীরদারগণ এক সাথেই "রাজানুগত্য" একই অভ্যর্থনা সভায় প্রকাশ করবেন। কিন্তু মুসলিম জায়গীরদারগণ তাদের স্বাতন্ত্র প্রকাশ করবার জন্য তারা পৃথক সভার আয়োজন করেন। এবং নিজেদের পক্ষ জোড়দার করবার জন্য সেখ আবদুল্লার সহায়তা প্রার্থনা করলেন। সেখ সাহেব তাদের সহায়তা করতে এক সর্ত্তে রাজী হবার কথা জানালেন, সেটা হচ্ছে এই যে তাঁদের অভ্যর্থনা

সভায় মহারাজার কাছে তারা কাশ্মীরী মুসলমানদের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে তার কথা যদি ওঠাতে রাজী হন। জায়গীরদারেরা জানালেন যে যদি কোনরূপ গরম গরম কথা না বলা হয় এবং সৌজন্য সহকারে শুধু মাত্র আবেদন পেশ করা হয় তবে তারা রাজী আছেন। সেখ আবদুল্লা দেখলেন মহারাজার সামনা সামনি আসার ও তাঁর দাবীর কথা ব্যক্ত করবার এই একটা সুযোগ। তিনি এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন। সেখ সাহেব জায়গীরদারদের নিজ সর্ত্তে রাজি করে তিনি নিজে লেগে গেলেন শ্রীনগরে ও নৌসেরার উপকণ্ঠে জনসভা করতে। যাতে জনমত সুসংবদ্ধ ভাবে গঠিত হয়। এই ভাবেই তিনি জনসাধারণের কাছে তাদের দাবীদাওয়ার কথা আলোচনা করবার সুযোগ পান। শুধু তাই নয়—এই সুযোগ তাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসবার এবং সুষ্ঠুভাবে জনতার মূক ব্যথাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার সুযোগও এনে দেয়।

তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন এবং কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতাও করেন। কিন্তু জনসভায় বক্তৃতা দিতে যেয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে অশিক্ষিত কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর মৌলভী মোল্লাদের তখনো বিপুল প্রভাব। তাদের কাছে রাজনীতির ত' দূরের কথা নাগরিক হিসাবে তাদের সামান্য দাবী দাওয়ার কথা আলোচনা করতে হলেও এদের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। সেখ সাহেব এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এদের মধ্যে শ্রীনগরের জুম্মা মসজিদের মৌলানা ঈউসুফ সাহ এবং মীর ওয়াহেজ হামাদানির নাম প্রধান। এদের সহায়তায় সেখ সাহেব জুম্মা মসজিদে প্রার্থনা সভার পর কাশ্মীরী

মুসলমানদের সভায় তাদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাদের এই পদ্ধতি মোটামুটি ফল প্রসব করল। শ্রীনগরের ও তার উপকণ্ঠে গ্রাম—গ্রামান্তরে আবদুল্লার কথা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা মহারাজার কানে গেল। তিনি ঘটনার গতি লক্ষ্য করে তাঁর পরামর্শদাতাদের মন্ত্রণা অনুসারে কোন জায়গীরদারদেরই অভ্যর্থনা সভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। মহারাজার অভ্যর্থনা সভার কাজ যদিও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো, আবদুল্লার কাজ কিন্তু এই সভাকে উপলক্ষ্য করে অনেক দূর এগিয়ে গেল। সেখ সাহেব এই সময় আর একটী কাজ করেন যাতে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এবং সভা সমিতির পূর্ণ বিবরণ নিজে প্রবন্ধাকারে লিখে কাশ্মীরের বাইরে বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন। আবার পরে এগুলিকে একত্র করে পুস্তিকা আকারে বিতরণও করবার ব্যবস্থা করলেন। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর চারপাশে এসে জোটে একদল যুবক কর্ম্মীবৃন্দ যারা ভবিষ্যত জীবনে তাঁর আন্দোলনে প্রধান সহকারী হিসাবে কাজ করেছে এবং আজও করছে।

এই সময় সেখ সাহেব টাকা পয়সার বেশ অভাব বোধ করছিলেন। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত কোন উপার্জ্জন তখনও ছিল না। তিনি তাঁর বাড়ী থেকে যে ২৫।৩০৲ টাকা হাত খরচা বাবদ আনতেন তাতে এখন তাঁর কাজ চলে না। এদিকে তাঁর বাড়ীও সহর থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে। কিন্তু তাঁর বর্ত্তমান কাজের জন্য তাকে শ্রীনগরে থাকতেই হবে। তারজন্যও খরচা চাই।

বন্ধুদের পরামর্শক্রমে তিনি স্থির করলেন যে তিনি শ্রীনগরেই কোন

কাজ গ্রহণ করবেন। কারণ তাহলে তিনি সহরে থাকতে পারবেন এবং আপন কাজে অধিক সময় দিতে পারবেন। এই সময় সরকারী বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। তিনি ঐ পদ প্রার্থী হওয়া মাত্র কর্তৃপক্ষ অতি উৎসাহের সঙ্গে সেখ আবদুল্লাকে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন (১৯৩১)। তাঁরা ভাবলেন সেখ আবদুল্লাকে এবার তাদের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছেন। এবং তাঁর আন্দোলনও এইখানেই খতম। কাশ্মীরের সরকারী মহলে একটা চাপা উল্লাসের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সত্যই কি ডোগরা রাজের উল্লাসের দিন আসছিল?

চার

বিদ্রোহের ফুল্‌কী

"মানবো না ! মানবো না !! মানবো না !!! বিদেশীর আইন আমরা কিছুতেই মানবো না"—ব্রিটিশের আইন ভঙ্গকারী বিদ্রোহী জনতার অন্তরের ভাষা ব্যক্ত হলো এই কথাগুলিতে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন এক বিদ্রোহের প্লাবন বয়ে চলেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহী জনসমুদ্রের গতি চলেছে এক সুশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে !

১৯৩০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বৃটীশের কৃত লবণ আইনকে রদ করবার জন্য। গান্ধীজীর আহ্বানে সমস্ত ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে যেন এক তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ব্রিটিশ শক্তির চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময় পথে আবর্ত্তিত হতে লাগল। এই অন্দোলনের পুরোভাগে আছেন বিদ্রোহী নগ্ন ফকির মোহনচাঁদ করমদাস গান্ধী। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর বেদনার বোঝা মাথায় করে তিনি ইংরেজের লবণ আইন অমান্যের অভিযান সুরু করে সদলবলে সবরমতী আশ্রম থেকে চললেন ডাণ্ডির অভিমুখে। তাঁর মুখমণ্ডল নির্ভীক ও প্রশান্ত, পদক্ষেপ দৃঢ়। দিনের পর দিন এই বিচিত্র তীর্থযাত্রীদের গতি সমস্ত ভারতবর্ষ উৎসুকদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। দেশব্যাপী উৎসাহের আগুন দিনের পর দিন প্রদীপ্ত হতে লাগলো। দেশের সর্বত্র, প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈয়ারীর কথা আলোচিত হতে লাগল। এবং লবণ তৈয়ারীর নানারূপ উপায়ও আবিষ্কৃত হ'তে লাগল। ১৯৩০

সালের ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে ডাণ্ডির বেলাভূমিতে গান্ধীজী প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। তিন চারদিন পর সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় ঐরূপ আইন অমান্য আন্দোলন করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে সুদূর পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিদ্রোহী ভারতবাসী অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সাথে এই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো। পণ্ডিত নেহরু তার আত্মজীবনীতে এই সময়কার কথা লিপিবদ্ধ করতে যেয়ে বলেছেন— "যেন বাঁধ ভেঙ্গে অকস্মাৎ প্রবল বন্যার জল এসেছে।" সুশৃঙ্খল বিদ্রোহী জনতার মিছিল, পুলিশের লাঠি চালনা, পেশোয়ারে সত্যাগ্রহী পাঠানদের উপর গাড়োয়ালী সৈন্যদলের গুলি চালাতে অস্বীকার করবার সংবাদ ইত্যাদি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক নূতন প্রাণস্পন্দন এনে দিল। আন্দোলনের গতি আরও তীব্র হলো যখন পর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (তখন কংগ্রেসের সভাপতি) মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, ডাঃ সৈয়দ মহমুদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হলো ; এবং বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে মহিলা সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশ-জুলুম চললো। বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ এবং বাংলাদেশে আন্দোলন নূতন নূতন পথ ধরে চলতে লাগলো। দেখে সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গনলো। শেষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ শক্তির সঙ্গে আপোষের পথে ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৬ সালে এই সংগ্রামের শেষ হয়।

ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে যখন এই আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল তখন তা' কাশ্মীরের আকাশ বাতাসকেও চঞ্চল করে তোলে। এবং জম্মু সহরে ঈদ পর্ব্বের সময় বিক্ষুব্ধ মুসলিম জনতা ও সরকারী পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। জম্মু সহরে নানারূপ পুলিশ

জুলুমের প্রতিবাদে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ জুলুমের নানারূপ পোষ্টার বিলি হতে থাকে। সেখ সাহেব তখন শ্রীনগরে। তিনি ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে বই ও পোষ্টার করে তার স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা এগুলি শ্রীনগরে বিলি করাতে লাগলেন। উৎসাহী তরুণেরা কাজে লেগে গেল। কিন্তু দু'একদিন যেতে না যেতেই সেখ সাহেবের বাসার কাছেই পুলিশ এদের একদল ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ সহরে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত সহস্র উত্তেজিত জনতা এসে পুলিশকে ঘেরাও ক'রে তাদের হাত থেকে বন্দী ছাত্রদের ছিনিয়ে নেয়। সেখ সাহেব ঘটনার বিবরণ শুনে অমনি জনতার মাঝখানে ছুটে আসেন। তিনি দেখলেন যে এই উত্তেজিত জনতাকে যদি শান্ত না করা যায় তবে এখনি এক বিরাট সংঘর্ষ বেধে যাবে। সেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি উল্কার বেগে ছুটে তাদের সহরের বুকে জুম্মা মসজিদে এসে হাজির হবার জন্য বলে বেড়াতে লাগলেন। জনতা সেখ সাহেবের কথা মত জুম্মা মসজিদে এসে হাজির হলো। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার জনতার সম্মুখে তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে তাদের কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে হয়। জীবনে এত বড় জনতার সম্মুখে এই তাঁর প্রথম ভাষণ। আর শুধু বক্তৃতা দিলেই হবে না—তাঁকে এই বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতাকে তখনই কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশও দিতে হবে। সুতরাং তাঁর নিজের পক্ষেও এটা চরম পরীক্ষার সময়। কিন্তু সেখ আবদুল্লার জীবনে আমরা দেখেছি যে তাঁর রাজনীতি জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তাঁর দেশবাসীর দুঃখ দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। তিনি গগন বিহারী বিবৃতি-সর্ব্বস্ব নেতা ছিলেন না। তিনি কাশ্মীরী মুসলমানদের

দুঃখ দারিদ্র্যের কথাও যেমন জানতেন তাদের দুর্ব্বলতার কথাও তেমনি তাঁর অজানা ছিল না। তিনি জানতেন যে এখনো তাদের শক্তি সুপ্ত ও বিচ্ছুরিত। সুতরাং যদি এখনই সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে—তাতে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে খুবই বাধার সৃষ্টি হবে। কাজেই সেখ সাহেব সেই উত্তেজিত জনতাকে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে বললেন এমন এক সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য যার মারফৎ তারা অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা চায় এখনই তারা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবে।

সেখ সাহেব যখন জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা করে ঘরে ফিরছিলেন তাঁকে অনুসরণ করে চললো বিশ সহস্র জনতার মিছিল। তাদের দাবী তারা এখনই আন্দোলন আরম্ভ করবে। সেখ সাহেব ঘরে পৌঁছে গেলেও কিছুতেই স্থান ত্যাগ করল না। কাজেই সেখ সাহেবকে আবার তাদের সামনে বক্তৃতা করতে হল এবং সমস্ত আন্দোলনের ধারাকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের শান্ত করতে হলো। কাশ্মীরের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষে শান্ত ও শক্তিবদ্ধ আন্দোলন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কীভাবে চলছিল—সেখ সাহেব সকলকে তা বুঝতে ও অনুসরণ করতে বলে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে বললেন; এবং অদূর ভবিষ্যতে যে এই অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন আরম্ভ করবেন তার প্রতিশ্রুতি তিনি দেবার পর সকলে ঘরে ফিরে যায়।

সেখ আবদুল্লা এই দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে সরকারও তাঁকে এই বিক্ষুব্ধ জনতা থেকে আর পৃথক করে দেখতে পারছিলেন না। এই বিক্ষুব্ধ জনতাকেও যেমন সরকার সরাসরি আঘাত হানতে সাহস পাচ্ছিল না—সেখ আবদুল্লাকেও তেমনি সরাসরি গ্রেপ্তার করতে বা নির্য্যাতন করতে সাহস না পেয়ে সরকার

এক নূতন কৌশল অবলম্বন করল যাতে কাশ্মীরের জাগ্রত জনতার মধ্য থেকে সেখ আবদুল্লাকে সড়ে যেতে হয়। সেখ সাহেবকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডেকে এনে জানালেন যে তাঁকে শ্রীনগর বিদ্যালয় থেকে ১০০ শত মাইল দূরে মুজাফ্‌ফরাবাদে একটী সরকারী বিদ্যালয়ে বদলি করা হলো।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে তিনি এই সময়ে টাকা পয়সার অভাবেই সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তাঁকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে হচ্ছিল তখন তাঁর চাকরী মাত্র কয়েক মাস হয়েছে।

সেখ সাহেব সরকারী বিভাগের চক্রান্ত বুঝে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন: "এইভাবে আপনারা আমার মুখ বন্ধ করতে চান? কিন্তু জানবেন, যেখানেই আমাকে পাঠান না কেন আমি সেখানেও চুপ করে থাকবো না। প্রতিটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি।"

ডিরেক্টর তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সরকারের আদেশ মেনে চলতে তিনি বাধ্য।

দৃপ্ত কণ্ঠে সেখ সাহেব উত্তর করলেন: "আমার কাশ্মীরী ভাইদের জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। তাদের সেবার সুযোগ পাবার জন্যই এ-কাজ আমি গ্রহণ করেছি, যাতে আমি শ্রীনগরে থাকতে পারি এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় দিনের ৮ ঘণ্টা সরকারের কাছে বিক্রী করেছি। কিন্তু বাকি ১৬ ঘণ্টার মালিক আমি নিজে।"

ডিরেক্টর উত্তর করলেন: "আপনি সরকারের ২৪ ঘণ্টার চাকর।"

সেখ সাহেব উত্তর করলেন: "তবে আমি এরূপ চাকরি করি না।"

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এরূপ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি ভেবেছিলেন যে এই হুম্‌কিতে সেখ সাহেব তাঁর পথ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তা যখন হলো না তিনি আপাততঃ ব্যাপারটাকে এই খানেই চাপা দিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন।

কাশ্মীরের শিক্ষামন্ত্রী নবাব খসরু জঙ্গ সেখ সাহেবকে মিষ্টি কথায় বোঝাতে চাইলেন যে তিনি যদি তাঁর আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেন তবে সরকারের কাছ থেকে উচ্চতম সরকারী চাকরীত তাকে দেওয়া হবেই, উপরন্তু প্রচুর অর্থও দেওয়া হবে। সেখ আবদুল্লার স্থায় নেতার পক্ষে এরূপ প্রস্তাবের কী প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। সেখ সাহেব ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিলেন —"আমি সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিলাম।" শিক্ষামন্ত্রী ক্রোধে ও অপমানে সেখ সাহেবকে বললেন যে তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে না। তাঁকে পদচ্যুত করা হবে। এবং এই মর্ম্মে সরকারী আদেশ লিখে সেখ সাহেবের কাছে পাঠান হলো। দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁকে পৃথক করবার সরকারী ষড়যন্ত্র এইভাবেই ব্যর্থ হলো। সেখ সাহেবের নেতৃত্বের দিক দিয়েও এই পদত্যাগ তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তুললো।

১৯৩১ সালের ১৩ই জুলাই কাশ্মীরের ইতিহাসে ও সেখ মহম্মদ আবদুল্লার জীবনে চিরস্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিনই সেখ সাহেব চাকুরী থেকে ইস্তাফা দেন। ঐ দিনই তিনি বুঝতে পারলেন যে ডোগরা রাজের সঙ্গে আপোষ করে তিনি তাঁর সমস্ত দেশবাসীর ত' দূরের কথা, সমগ্র কাশ্মীরী মুসলমান সম্প্রদায়েরও দাবী দাওয়া আদায় করতে পারবেন না। ঘটনার গতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে সংগ্রামের পথে নিয়ে আসল।

পদত্যাগ করবার পরই তিনি তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে

পরামর্শ করতে বসে গেলেন। কিন্তু কাশ্মীরের জনসাধারণ কোন আহ্বানের প্রতীক্ষা না করেই—সেখ সাহেবের পদত্যাগের সংবাদে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কাশ্মীরের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম তার জনসাধারণ তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিতে চাইল। ভূস্বর্গ কাশ্মীর সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠল। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের রাজপথ শহীদের তাজা লাল রক্তে রঞ্জিত হোলো। জনসাধারণের বিক্ষোভ সহস্র পথে রাজশক্তির বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে লাগল।

শেখ সাহেবের সঙ্গে যখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের বাদানুবাদ চলছিল—সে সংবাদ চাপা ছিল না। জনপ্রিয় নেতাকে জনতার কাছ থেকে সড়িয়ে নেবার চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়তেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সভা হতে থাকে। সভা-সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলতে থাকে বারমুলা, সোপর, হান্তবারা, উরি, অনন্তনাগ, মিরপুর, কোটলী, জম্মু ও পুঞ্চ প্রভৃতি জায়গায়। এইসব সভায় যদি সরকারের পক্ষে ওকালতি করে কোন বক্তা কিছু বলতে চাইতেন তবে জনতা এরূপ বক্তাদের চীৎকার করে স্তব্ধ করে দিত। এই সব থেকেই জনতার সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ পেল। সরকার এই অবস্থা করায়ত্ত করবার জন্য দুটী পন্থা অবলম্বন করলেন। একদিকে তাঁরা সভাসমিতির অনুষ্ঠানে বাধা দিতে আরম্ভ করলেন। অপর দিকে জনমতকে বিভ্রান্ত করবার জন্য জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তদন্ত করে দেখবার জন্য (!) এক কমিটি নিয়োগ করবার কথা আধা সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন। সেখ সাহেব শ্রীনগরে জুম্মা মসজিদে এক বিরাট জনসভায় ঐ ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত তদন্ত কমিটিতে কাশ্মীর

উপত্যকার ৭ জন প্রতিনিধি ও জম্মুর ৪ জন প্রতিনিধির নাম পেশ করেন এবং তা সেই সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা কোনরূপ আপোষ নীতির পথে চলতে যে রাজী নয় তা বোঝা গেল যখন একজন বক্তা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সভায় দাঁড়িয়ে বলেই ফেললেন "সরকার আমাদের দাবী দাওয়া না মানলে আমরা ইট পাথর ছুড়বো।" এই বক্তার নাম আবদুল কাদির।

সরকারের পক্ষে এরূপ অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং দুদিন পরে পুলিশ আবদুল কাদিরকে রাজদ্রোহ প্রচার করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। যদিও সেখ আবদুল্লা এই চরমপন্থী যুবকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বক্তৃতার সঙ্গে তখনো একমত হতে পারেন নাই—তথাপি যখন তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তখন তাকে পুলিশের দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে তিনি রাজি হলেন না। তিনি আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করবার সব ব্যবস্থা করলেন। বিচারের দিন আদালতে অসম্ভব রকম ভীড় হ'তে থাকে। এতে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে মামলা শ্রীনগর জেলের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন। এবং পরদিনই অর্থাৎ ১৩ই জুলাই (১৯৩১) বিচারের দিন ধার্য্য করেন। এদিকে সরকারের সঙ্গেও সেখ সাহেবের চাকুরী সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা ১৩ই জুলাই তারিখেই চরমে পৌছায় এবং তিনি সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। এই সংবাদ তড়িৎ গতিতে শ্রীনগরে ও তার উপকণ্ঠে পৌছে যায় এবং দলে দলে মানুষ শ্রীনগরের দিকে সেই বিদ্রোহী যুবকের কী শাস্তি সরকার দেয় তা দেখবার জন্য আসতে আরম্ভ করে। সেখ সাহেব দেখলেন যে এই অগণিত জনস্রোত যদি জেলখানায় যেয়ে ঠেকে তবে সরকার যে কোন অজুহাতে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলতে পারে। তাই তিনি উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলে যান যে জেলের মধ্যে বিচার স্থলে যেন

কেউ না যায়। কিন্তু সেখ সাহেবের কথা ভালভাবে প্রচারিত না হওয়ায় ঐদিন জেলের দরজায় যেয়ে অনেক লোক হাজির হয়। সহরে অগণিত জনতা দেখে সরকার এমন ঘাবড়ে যান যে বেলা এগারটা বাজতেই সামরিক আইন জারি করে সহরে বিশেষ পুলিশ ও সৈন্য আমদানি করলেন। এদিকে জনতা জেলের দরজায় যেয়ে দাবী জানায় যে বিচার স্থলে তাদের যাবার অধিকার দিতে হবে। সরকার সে অধিকার দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ না হয়ে জেলের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। সরকারও আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে তারা বিদ্রোহের মূর্ত্তি দেখতে পেলেন।

কাশ্মীর উপত্যকার গভর্ণর স্বয়ং পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন; এবং তিনি এসেই যে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সেখানে জনতাকে আক্রমণ না করে তাদের শান্ত রাখতে চেষ্টা করছিলেন, তাকে জনতার নেতাদের গ্রেপ্তার না করবার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত নেতাদের বন্দী করবার হুকুম দেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি এক নূতন কাশ্মীরের জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই হুকুম দিচ্ছিলেন! নেতাদের গ্রেপ্তার করবার হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তারা নেতাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রোধে দিশেহারা গভর্ণর গুলী করবার হুকুম দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন গুলীর ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পালাতে আরম্ভ করবে। কিন্তু ফল দাঁড়ালো সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেই সহস্র সহস্র জনতার ওপর গুলী চালনার ফল হলো তারাও গর্জ্জে উঠল। জনতা ক্ষেপে গুলীবর্ষণকারী সৈন্যবাহিনীর ওপর ইট পাথর ছুড়তে

আরম্ভ করল। গভর্ণর বাহাদুরও এর উত্তর দিলেন বিক্ষুব্ধ জন-সমুদ্রের ওপর উপর্য্যুপরি গুলী চালিয়ে। কিন্তু জনতাকে এভাবে দমন করা যায় না এবং গেলও না। তারা ক্ষেপে গিয়ে যোদ্ধার সাহস নিয়ে লড়্তে লেগে গেল। পুলিশ বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের লরিগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল, জেলের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে অফিসের আসবাবপত্র তচ্নচ্ করে দিল। এদিকে বাইরে তখনো গুলী চলছে। পুলিশের গুলিতে যারা প্রাণ দিল জনতা সেই দেহগুলি পুলিশের হাতে না দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। এবং জেলের পুলিশ ব্যারাকে ঢুকে খাটিয়া টেনে বের করে তার ওপর মৃত সহকর্মীদের নিস্প্রাণ দেহগুলিকে শুইয়ে দিয়ে, রক্তমাখা বস্ত্রকে লাঠির মাথায় বেঁধে পতাকা করে সহরের দিকে শোভাযাত্রা করে আসবার জন্য রওনা হলো। কাশ্মীরের ইতিহাসে এই প্রথম কাশ্মীরীর তাজা টকটকে রক্ত রাজপথকে রঞ্জিত করে অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাল। কাশ্মীর আজ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ঐদিনের গুলী চালনার ফলে ২২ জন তরুণ কাশ্মীরী প্রাণ হারায়। তাদের মৃতদেহ নিয়ে সহরে আসবার কথা ও পুলিশের গুলী চালনার সমস্ত বিবরণ সেখ সাহেবের কাছে পৌছে যায়। তিনি তখন সবে মাত্র রাজ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর ঔদ্ধত্যের জবাবে, সরকারী চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে এসেছেন। তিনি ঘটনার বিবরণ শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে খবর পৌছে যায় যে পুলিশের গুলীতে নিহত শহীদদের লাসগুলিকে নিয়ে জনতা সহরের দিকে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছে ; এবং ভয়ে সহরের দোকানপাট বন্ধ হতে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর কাছে আরও সংবাদ পৌছে গেল যে সহরের হিন্দু দোকানদার ও সাধারণ নাগরিকরা

খুবই ভীত হয়ে পড়েছেন। কারণ—যেহেতু মহারাজা একজন হিন্দু সেই হেতু জনতার আক্রোশ যদি সাধারণ হিন্দু কাশ্মীরীদের ওপর এসে পড়ে তবে তাদের রক্ষা করবে কে? সেখ সাহেবের পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো। তিনি ঘরে বসে না থেকে অমনি রাস্তায় বেরিয়ে আসলেন এবং শহীদদের লাস নিয়ে শোভা-যাত্রাকে সহরে ঢুকতে না দিয়ে তাদের জুম্মা মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসলেন। তিনি তাদের বোঝালেন যে যদি কোনরূপ বিভেদ বা আত্ম কলহ দেখা দেয় তবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে না। কিন্তু সেখ সাহেবের চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক-জন আহত ব্যক্তি সহরে পৌঁছে যায়। এবং গুরুতররূপে আহত এক ব্যক্তিকে নিয়ে উত্তেজিত একদল জনতা যখন সহরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল তখন অত্যাচারের প্রতিবাদে চারিদিকে দোকানপাট বন্ধ হতে আরম্ভ হয়। এই হট্টগোলের মাঝখানে কিছু দোকানপাট লুট হতে সুরু হয়; এবং শেষের দিকে রাজ-নৈতিক সংঘর্ষ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত হয়।

সেখ সাহেব পুলিশের গুলীতে নিহত ২২ জনকে যোগ্য সম্মানের সঙ্গে কবর দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর মন ভেঙ্গে গেল যখন তিনি শুনলেন যে সহরে দোকানপাট লুঠ করা হয়েছে ও কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষও হয়েছে। এইবার সেখ সাহেবের কাছে মনে হলো যে তিনি তাঁর আন্দোলনের মধ্যে কাশ্মীরের নিপীড়িত হিন্দুদের না ডেকে ভুল করেছেন। কারণ ডোগরা রাজের শোষণ গরীব হিন্দু মুসলিম কাশ্মীরী উভয়ের ওপরই সমান ভাবে চলেছে। কিন্তু তিনি শুধু মুসলমানদের জন্য লড়াই করেছিলেন এই ভেবে যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ডোগরা রাজের

বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনে যোগদান করবে কি না সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের তাঁর আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য আহ্বানও করেন নাই। এইবার তিনি অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে দেখতে পেলেন যে গণ-তান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা না হ'লে আন্দোলনের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পদে পদে আন্দোলনের পথে বাধা স্মৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। এবার সাম্প্র-দায়িক সংঘর্ষ তাঁকে এই শিক্ষা দিল। কাজেই যখন মুসলিম জনতা জুম্মা মসজিদে তাঁকে তখনই আন্দোলন আরম্ভ করতে বলল, তিনি তাদের বললেন যে শুধুমাত্র মুসলিম জনতাকে নিয়ে আন্দোলন স্থরু করা ঠিক হবে না। কিন্তু ডোগরারাজ সেখ সাহেবের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে কস্থর করল না। আন্দোলনের প্রাণ সেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে সরকার ১৪ই জুলাই (১৯৩১) গ্রেপ্তার করে কাশ্মীরের "ব্যাসষ্টাইল" হরিপর্ব্বত দুর্গের কারাগারে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কাশ্মীরী জনসমুদ্র থেকে সেখ আবদুল্লাকে সরকার বল প্রয়োগ ক'রে বিচ্ছিন্ন করতে দৃঢ় পণ ঘোষণা করলেন। কিন্তু সত্যিকারের জননায়ককে কি কখনো জনতা থেকে কোন দিন কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে?

পাঁচ

সংগঠনের যুগ

সেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করবার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুতে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগল। জম্মুতে গণ-বিক্ষোভ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে ডোগরারাজের সৈন্য তা দমন করতে অসমর্থ হয়। এবং মহারাজা তাঁর বন্ধু বৃটিশ সরকারের নিকট সৈন্য সাহায্য চান এই বিক্ষোভকে দমন করতে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তা পাঠাতে বিলম্ব করলো না। এদিকে জম্মু প্রদেশের মিরপুর জেলায় বিক্ষোভ আরও জটিল আকার ধারণ করে। উত্তেজিত জনতা সহরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের সব ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরে দিয়ে সহরকে প্রায় একরূপ বহির্জ্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সাম্রাজ্যবাদের দোসর সামন্তরাজ দেখল যে যদি এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে সমর্থ হয় তবে তার সমূহ সর্ব্বনাশ। তাই যেকোন প্রকারে এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে শ্রীনগর জম্মু, মীরপুর প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় রাস্তায় সৈন্যবাহিনী নির্ব্বিচারে গুলী চালিয়ে ও নিরীহ পথচারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে আন্দোলনকে দমন করতে লেগে গেল। শুধু মাত্র গুলী চালিয়েই সামন্তরাজ ক্ষান্ত হলো না, পাইকারী জরিমানা (punitive tax) প্রকাশ্যে আন্দোলনকারীদের ওপর বেত্রাঘাত প্রয়োগ এবং সর্ব্বশেষে

সামরিক আইন জারী করে আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করল। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এই বিরোধ বৎসরের বাকি কয়েকমাস ধরেই চলে। এবং বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ যে এই বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ ও মিলিটারী জুলুমের ফলে প্রায় ৩।৪ শত লোক প্রাণ দেয়।

সরকার সেখ আবছুল্লাকে ২১ দিন ধরে হরি পর্ব্বত দুর্গে আটক রাখেন। কাশ্মীর উপত্যকার এবং জম্মু প্রভৃতি স্থানের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ এই ২১ দিন ধরেই হরতাল পালন করে। জুলাই মাস কাশ্মীরে ব্যবসার মরসুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ২১ দিন পরিপূর্ণ হরতাল চলতে থাকে। ২১ দিন বাদে সরকার সেখ সাহেবকে মুক্তি দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে গুলী চালনা ও পুলিশ জুলুমের তদন্ত করবার জন্য স্যার বারজোর দালালের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি বসানো হলো। কিন্তু জনমত তখন এত বিক্ষুব্ধ যে স্যার বারজোর দালালের ন্যায় গভর্ণমেন্ট ঘেষা ব্যক্তির সভাপতিত্বে গঠিত কোন কমিটিকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না। সেখ সাহেব নিজেও কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে জনমতের দৃঢ়তা ও জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপণা দেখে খুবই আশান্বিত হন। যদিও শ্রীনগরে আন্দোলন কিছুটা সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় পরিণত হয়েছিল তথাপি অন্যান্য স্থলে তা হয় নাই। কাজেই সেখ সাহেব জনতার অত্যাচার-বিরোধী মনোবলের উপর বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে এই তদন্ত কমিটিকে কখনই তারা গ্রহণ করবেন না। ফলে সরকারের সঙ্গে তাঁকে আবার সংঘর্ষে আসতে হলো এবং সরকার তাকে ২৫ [illegible] ১৯৩১) তারিখে আবার গ্রেপ্তার করে ৮ দিন আটক করে রেখে

দেয়। আট দিন পরে সেখ সাহেবকে ছেড়ে দিলেও তাঁর গতি বিধির ওপর সরকার কড়া নজর রাখলেন এবং যখন কিছুদিন পর সরকার দেখলেন যে, সেখ সাহেব জাগ্রত জনমত সংগঠিত করে একটি স্থায়ী আন্দোলনে রূপ দেবার জন্য চেষ্টা করছেন তখন তাঁকে ১৯৩২ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে বে-আইনী কার্য্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

কাশ্মীরের ইতিহাসে ১৯৩১ সাল এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে গেল। শহীদের রক্তে জনতার বেদনা পেল মূর্ত্তি। কাশ্মীর শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল ও মুক্তির পথে পা বাড়ালো। তাই বৎসরের পর বৎসর ধরে কাশ্মীরের নরনারী শ্রদ্ধার সঙ্গে শহীদের রক্তে পবিত্র ১৩ই জুলাই তারিখ থেকে আরম্ভ করে সাতদিন "শহীদ সপ্তাহ" আজও পালন করে আসছে। ১৩ই জুলাই কাশ্মীরের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

যদিও এই আন্দোলন সাময়িকভাবে তখন দমন করতে গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সক্ষম হয়েছিলেন তথাপি এই আন্দোলন কাশ্মীরের মধ্যে এক নূতন চেতনা ও শক্তি এনে দিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেখ সাহেব তাঁর চারপাশে পেলেন একদল নিষ্ঠাবান সহকর্ম্মী যারা ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর সাথে কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন। এদের মধ্যে গোলাম মহীউদ্দিন, গোলাম মহম্মদ সাদিক, গোলাম মহম্মদ বক্সী প্রভৃতির নাম সকলের কাছেই আজ সুপরিচিত। এঁরা সকলেই এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেখ সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ান। আর এদের ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে বিদ্রোহী আবদুল কাদিরের ন্যায় শত শত দেশ প্রেমিক যুবক ও শ্রীমতী জোনির ন্যায় শত শত দেশভক্ত যুবতী গড়ে ওঠে

শ্রীমতী জোনি সাধারণ শ্রমিকের কন্যা। ১৯৩১ সালে যখন শ্রীনগরের বুকের ওপর পুলিশের বুলেট ২২ জন কাশ্মীরী তরুণের প্রাণ হরণ করল, তখন জোনির তরুণ রক্ত বুকের মধ্যে টগবগ করে উঠেছিল। পুলিশ যখন তার মহল্লায় এসে অত্যাচার সুরু করে তখন সে পর্দ্দা ছিড়ে ফেলে দিয়ে তার সঙ্গীদের নিয়ে অত্যাচারী পুলিশের পথ বীরত্বের সঙ্গে রুখে দাড়ায় এবং বর্শা নিয়ে আক্রমণকারী পুলিশকে আক্রমণ করে অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দেয়। পুলিশের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এইরূপ দেশভক্তদের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে সেখ আবদুল্লার কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হবার কথা ঘোষনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"আজ আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরের যে সমস্ত নরনারী সহযোগীতা করছে ও তাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তারা কাশ্মীরের মুক্তি যুদ্ধে নবাগত নয়। কারণ এদের মধ্যে অনেকেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে এসেছেন, তার জন্য অশেষ দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন। [৫ই মার্চ্চ ১৯৪৮]

এই গণ-বিক্ষোভ সেখ সাহেবের কাছে অভিজ্ঞতার দিকে দিয়ে খুবই মূল্যবান। এই বিক্ষোভের সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে সংগঠন না হলে কোন আন্দোলন সফল হতে পারে না। কাজেই ১৯৩২ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে যখন তিনি মুক্তি লাভ করলেন তখন তাঁর প্রধান কাজই হোলো সংগঠন গড়ে তোলা—যার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ আন্দোলন প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলো। কারণ প্রধানত সরকারী

চাকুরীর ক্ষেত্রে কাশ্মীরী মুসলমানদের যথোপযুক্ত সংখ্যায় নিয়োগের দাবী নিয়েই আন্দোলন সুরু হয়। যদিও আন্দোলন গোড়ার দিকে কাশ্মীরী মুসলমানদের দাবী নিয়েই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এর পশ্চাতে গণতান্ত্রিক শক্তি ও সেখ সাহেবের নেতৃত্ব থাকায় কোন ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা এর মধ্যে প্রবেশ করলেও জয়লাভ করতে পারেনি। কাজেই পরিণামে এই আন্দোলন সমস্ত কাশ্মীরী নরনারীদের জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। কারণ নির্য্যাতিত নরনারীর সমস্যা মূলতঃ মানুষের অধিকার লাভের সমস্যা। কোন ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা এর সমাধানের পথ নয়।

প্রথম "মুসলিম" কনফারেন্স

সেখ সাহেব ও তাঁর সহকর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে রূপ নিল কাশ্মীরের "মুসলিম" কনফারেন্স। এবং সেখ মহম্মদ আবদুল্লা হলেন এর প্রথম সভাপতি। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত এ সংগঠন সাম্প্রদায়িক নীতিতে না চললেও এই নামেই চলে। শ্রীনগরে ১৪-১৬ অক্টোবর (১৯৩২) তারিখে কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হয়। এবং সেখ সাহেব তাঁর অভিভাষণে বলেন:—"ভাইসব বাইরের দুনিয়া কাশ্মীরের জনসাধারণকে জানে তারা ভীরু, তারা অসাধু এবং তারা এক আত্মমর্য্যাদাহীন জাতি। কিন্তু চিরদিন কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে এই বদনাম বরদাস্ত করবে না।"·········তিনি তাঁর আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন: "আমাদের এই আন্দোলন কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। সকলের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য এই আন্দোলন। আমি সকলকে আজ এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি আজ মুসলমানদের অধিকার লাভের জন্য যেমন লড়াই করছি,

তেমনিভাবে সকলের—হিন্দু ও শিখ ভাইদের—দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্যও সমানভাবে লড়াই করতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত।”

সেখ সাহেবের উপরোক্ত বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম কন্‌ফারেন্সের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কোন পথে চলবে।

কাশ্মীর রাজসরকার জনমত ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে দেখে বুঝতে পারলেন যে জনমতকে উপেক্ষা বা পীড়ন করা এখন যুক্তিসঙ্গত হবে না। কাজেই সামন্ততন্ত্র আর এক নূতন কৌশল অবলম্বন করল। বৃটিশ শাসিত ভারত সরকারের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের (Foreign and Political Department) ঝানু আই, সি, এস স্যার বারট্রাণ্ড জেমস গ্লান্সির সভাপতিত্বে এক কমিশন সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত করে নির্দ্দেশ দেবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনমতকে সম্মান দেখাবার জন্য এতে বেসরকারী কয়েকজন সদস্য উভয় সম্প্রদায় থেকেই গ্রহণ করা হলো। এই সদস্যদের মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ইনি সেখ সাহেবের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন; এবং কার্য্যতঃ যখন কাশ্মীর সরকার এই কমিশনের মূল নির্দ্দেশ (কাশ্মীরী মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে যথাযোগ্য সংখ্যায় নিয়োগের দাবীর বিষয়ে মতামত) মেনে নিতে টালবাহনা করেন তখন তিনি সেখ আবদুল্লার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক সাথে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন ও কাশ্মীরী প্রজাদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন।

গ্লান্সি কমিশনের রিপোর্টে মোটামুটিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে সরকারকে আরও মনোযোগ দিতে বলা হয় এবং

শিক্ষকতার কার্য্যে শিক্ষিত কাশ্মীরী মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা তদারক করবার জন্য বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করতে বলা হয়। যদিও জমির ওপর মালিকানা রাজ-সরকারেরই স্বীকার করে নেওয়া হয়, প্রজাদের জন্য জমিতে দখলিস্বত্ব স্বীকার করে নেবার কথা সুপারিশ করা হয়। বেগারী খাটার প্রথা, গোচারণ ভূমির ওপর ট্যাক্স ইত্যাদি লোপ করবার জন্য কমিশন মত প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবার জন্যও এই কমিশন নির্দ্দেশ দেন। আন্দোলনের সময় যে সমস্ত ধর্ম্মস্থান সরকার কর্ত্তৃক দখল করা হয়েছিল তা অনতিবিলম্বে ফেরৎ দিতে, সরকারী চাকুরীতে সকল সম্প্রদায়ের প্রজার সমান অধিকার মেনে নিতে এবং প্রতিনিধিমূলক আইন সভা প্রতিষ্ঠা করতেও কমিশন সুপারিশ করেন। আইন সভার নির্ব্বাচনের জন্য কমিশন পৃথক নির্ব্বাচনের সর্ব্বনাশা পথের কথাও সেই সঙ্গে সুপারিশ করতে ভোলেন নি।

কাশ্মীর রাজসরকার এই কমিশনের রিপোর্টের কতকাংশ গ্রহণ করেন এবং কতকাংশ চাপা দিয়ে রাখেন। সরকারী চাকুরী বিষয়ে কমিশনের মতামত সরকার কার্য্যকরী করতে রাজী হলেন না—যদিও কিছু চাকুরীতে মুসলমান নিয়োগ করে জনমতকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করা হোলো। কিন্তু কাশ্মীরী দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হোলো না। সরকার অবশ্য কমিশনের মত অনুসারে একটী আইন সভা করতে স্বীকৃত হলেন। এবং ৭৫ জন সভ্য নিয়ে একটী আইন সভার (State Assembly) কথা ঘোষণা করা

হলো। এই সভার সভ্য অধিকাংশই হলো মনোনীত। কারণ ৭৫ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ৩৩ জন সভ্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হবেন। বাকি ৪২ জন হবেন মনোনীত। মাত্র এইটুকু অধিকার মেনে নিতে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত, প্রায় দুই বৎসর সময় টাল বাহনা ক'রে সরকার কাটান। কিন্তু এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সেখ সাহেব দেখলেন যে কাশ্মীরের আমলাতন্ত্র গ্লান্সি কমিশনের নির্দ্দেশগুলিও যথাযথ ভাবে মেনে নিতে রাজী নয়। ১৯৩৪ সালে যখন আইন সভার কাজ প্রথম আরম্ভ হয় তখন দেখা গেল, মনোনীত সভ্যের দল আইন সভার কাজে নির্ব্বাচিত সভ্যদের সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই বিরোধিতা করতে লাগলেন। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে বাস্তবিক পক্ষে যে প্রজাদের মূল দাবী স্বীকৃত হবার কোন উপায়ই নেই তা ক্রমশঃ পরিস্কার হয়ে উঠতে লাগল। দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসানের কোন সম্ভাবনা যে এই পথে হতে পারে না আন্দোলনের নেতাদের কাছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। দুটো বেশী চাকরী, দুটো বেশী সভ্য পদ লাভ, এসকল পথে উচ্চ মধ্যবিত্তদের হয়ত কিছু সুবিধা হতে পারে, কিন্তু তাতে কি কাশ্মীরী কৃষক, মজুর প্রভৃতির যুগ যুগ সঞ্চিত দারিদ্র্যের বোঝা কমবে? সেখ সাহেবের কাছে তখন এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠল। আর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লা আর একটি সমস্যারও সম্মুখীন হলেন। তা হচ্ছে এই যে, তিনি যে দরিদ্র্য কাশ্মীরী প্রজাদের দাবী দাওয়া নিয়ে লড়বেন সে প্রজাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকল সম্প্রদায়ের কাশ্মীরী প্রজাই রয়েছে। কিন্তু তাঁর আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে সাম্প্রদায়িকরূপ নিয়ে। কাজেই অমুসলমান কাশ্মীরী দরিদ্র প্রজাদের কাছে "মুসলিম কন্‌ফারেন্স" তাদের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারল না। কিন্তু সেখ সাহেবের নেতৃত্বে

দরিদ্র প্রজা মাত্রেরই পূর্ণ আস্থা ছিল। এই সময় কয়েকটি ঘটনা সেখ সাহেবকে তাঁর আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপ দিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯৩৩ সালে কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর যখন তিনি আন্দোলনের নির্দ্দেশগুলিকে কার্য্যকরী করে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তখন সরকারের সঙ্গে তাঁকে সংঘর্ষে আসতে হয়। এবং সরকার ১৯৩৩ সালের মে মাসে সেখ সাহেবকে পুনরায় দেড়মাস বন্দী করে রাখেন। মুক্তি পেয়ে সেখ সাহেব কাশ্মীর ও জম্মুতে আবার সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জম্মুতে তিনি যে অভ্যর্থনা হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে পান তা' সেখ সাহেবের মনে গভীর রেখাপাত করে।

কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা যেমন মুসলিম প্রধান, জম্মুও তেমনি হিন্দু প্রধান। এখানকার হিন্দু প্রজারা স্বতপ্রবৃত্তঃ হয়েই সেখ সাহেবকে এক বিশেষ অভ্যর্থনা সভায় সম্মানিত করে; এবং সেখ সাহেবের কাছে তাদের সুখ দুঃখের কথা জানায়। হিন্দু প্রধান জম্মুর জনসাধারণ দেখল যে সেখ সাহেব যদিও মুসলিমদের দাবী দাওয়া নিয়েই সংগ্রাম করছিলেন, তার ফল কিন্তু হিন্দু মুসলমান গরীব প্রজা উভয়েই সমানভাবে ভোগ করতে পারছে। সেখ সাহেবও প্রত্যক্ষ করলেন যে তিনি যে দাবী দাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন ও করবেন তা শুধু মুসলমানদের দাবীই নয়, হিন্দু মুসলমান ও শিখ নির্ব্বিশেষে দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজা মাত্রেরই দাবী। সেখ আবদুল্লার জীবনে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর আন্দোলন শুধু মাত্র এক সম্প্রদায়ের দাবীদাওয়ার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত কাশ্মীরী জনসাধারণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে প্রবুদ্ধ করে। আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত

করবার জন্য তিনি কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছিলেন তা সেখ সাহেবের সেই সময়ের বক্তৃতা থেকে বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। ১৯৩৫ সালে কনফারেন্সের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :—

"আমাদের রাজ্যের সাম্প্রদায়িকতা পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক নেতাদের মিথ্যা প্রচারের ফল। আমি চাই এই ভূঁইফোর নেতারা যেন আমাদের আভ্যন্তরিণ সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামান। এখন থেকে আমাদের রাজ্যের প্রজা আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) পথে চালিত করাই আমার একমাত্র কাজ হবে। এই পথে আন্দোলনের গতিকে ঘুরিয়ে আনতে হয়ত কিছু সময় লাগবে। কিন্তু আমি স্থির সংকল্প করেছি যে আমি আমার দেশকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করব। এতে যে কোন বাধাই আসুক না কেন তাকে অতিক্রম করবই।"

শ্রীনগরে যখন ঐ বৎসরই সেখ সাহেবকে হিন্দু মুসলমান প্রজাবৃন্দ মিলিত ভাবে এক অভিনন্দন দেয় তখন সেই অভিনন্দনের উত্তরে সেখ সাহেব আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন :—

"আমাদের সংগ্রাম হোলো আমাদের দেশের জনসাধারণের মুক্তির সংগ্রাম,—স্বাধীনতার সংগ্রাম। আসুন আমরা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও নীচতার উর্দ্ধে উঠি, সকলের উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। আমি আমার হিন্দু ভাইদের কাছে নিবেদন করছি আপনারা আপনাদের মন থেকে কাল্পনিক ভয় ও সন্দেহ দূর করুন।"

১৯৩৫ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে কাশ্মীর রাজসরকার সেখ সাহেবকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে এবং উত্তেজনাকর বক্তৃতাদি দেওয়ার অপরাধে সেখ সাহেবকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেখ সাহেবের যোগ্য সহকর্মীবৃন্দ তাঁর আরব্ধ কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালনা করেন, যেমন আজও তাঁরা করে থাকেন।

তাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও গণ-সংযোগের ফলেই কাশ্মীরে আমরা দেখতে পাই আন্দোলন অগ্রগতির পথে চলেছে। মুসলিম কনফারেন্স তার সাম্প্রদায়িক গণ্ডী কাটিয়ে সর্ব্বসাধারণের মুখপাত্র হিসেবে জাতীয় সম্মেলনরূপে গড়ে উঠেছে। কাশ্মীরের সর্ব্বহারা, যুগ যুগ প্রবঞ্চিত প্রজার দল, শোষণকারী সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় "নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন"-এর মধ্য দিয়ে।

ছয়

জাতীয়তার পথে

মুসলিম কন্‌ফারেন্সের গোড়ার ইতিহাসের কথা বলতে যেয়ে সেখ সাহেব "নিউ কাশ্মীর" নামের বিখ্যাত পুস্তিকার মুখবন্ধে লিখেছেন—"যদিও এই আন্দোলন 'মুসলিম কনফারেন্স' এই নামের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছিল কার্য্যতঃ কিন্তু সমস্ত কাশ্মীরী প্রজাদেরই মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ করেছিল এই সভা। মূলতঃ এই আন্দোলন ছিল কাশ্মীরী প্রজাদের জাতীয় আন্দোলন এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রজার মঙ্গলের জন্যই এই সভা কাজ করেছে।"……

তিনি আরও বলেন: "আমাদের আন্দোলন, ক্রমে একটি প্রগতিপন্থী ধারা অনুসরণ করে চলে এবং দিনের পর দিন এই আন্দোলন কাশ্মীরের মাটীতে দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। সুতরাং ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি আমাদের 'মুসলিম কনফারেন্স'কে 'নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সভা'রূপে পুনর্গঠিত করে তুলতে বাধ্য করে।"

"ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি" কী সেখ সাহেবের নিজের কথা থেকেই তা পরিস্কার হবে। তিনি বলেছিলেন—"দেশ বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, একটি শিক্ষাই আমাদের দিয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই যে সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক বন্ধন-মুক্তিই সত্যিকারের রাজনৈতিক

গণতন্ত্রের সূচনা করে এবং আর্থিক শোষণ মুক্ত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বাগাড়ম্বর মাত্র।" সেখ সাহেব দেখতে পেলেন যে কাশ্মীরের সমস্যা, মুসলমান কাশ্মীরীর দুটী বেশী চাকুরী বা একটু বেশী সুবিধা লাভের সমস্যা নয়। মূলতঃ এ সমস্যা হলো গোটা কাশ্মীরী দরিদ্র প্রজাদেরই সমস্যা। তাদের ওপর যে দারিদ্র্যের বোঝা চেপে আছে তা উচ্চশিক্ষিত জনকয়েক মুসলমানদের চাকুরী পাওয়ার মধ্য দিয়ে দূর হতে পারে না। কাজেই কাশ্মীরবাসীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ দাসত্ব ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক মুক্তির পথে পা বাড়ালো।

অন্ধকারের নমুনা

কাশ্মীর ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম রাজ্য। ইহার আয়তন ৮৪,৪৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালের হিসাবে ৪০,২১,৬১৬ জন। ইহার মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ও অনুপাত এইরূপ :

ধর্ম্ম	সংখ্যা	শতকরা অনুপাত
মুসলমান	৩১,০১,২৪৭	৭৭·১১
হিন্দু	৮,০৯,১৬৫	২০·১২
শিখ	৬৫,৯০৩	১·৬৪
অন্যান্য	৪,৬০৫	·১১

কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৩৭ লক্ষ লোক ৯ হাজার গ্রামে বাস করে। এবং এই ৩৭ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৩৩ লক্ষ অধিবাসীর উপজিবীকা কৃষি ও পশু-পালন। শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ।

কাশ্মীরের প্রজাদের বাৎসরিক আয় গড়ে হিসাব করে দেখা গিয়েছে, ১০ টাকা ১০ আনা ৩ পাই। মাসিক আয় ১৪ আনা ২ পাই; দৈনিক আয় ৫-২/৩ পাই।

শিক্ষার হার নিম্নলিখিত রূপ:

সম্প্রদায়	শতকরা হার
হিন্দু ও শিখ	৪৭.০
মুসলিম	৪.২
বৌদ্ধ	৫.১

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই কাশ্মীরে জ্ঞানের চর্চ্চা চলে আসছে। পণ্ডিত কল্‌হন কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে যান, তা তারপর ক্রমান্বয়ে হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত হতে থাকে। এইভাবে কল্‌হনের পর সম্রাট জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকালে (১৪২০-১৪৭০ খৃঃ) যোনা রাজা ও মোল্লা আহমদ নামক দুইজন মুসলমান পণ্ডিত গ্রন্থের নূতন অধ্যায় রচনা করেন; এবং ক্রমান্বয়ে এই রচনা বিভিন্ন পণ্ডিতগণের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছে। তা ছাড়াও হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষ্য ইত্যাদিতে কাশ্মীরে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বসুগুপ্ত, সোমানন্দ, অভিনব গুপ্ত, শ্রীভট্ট প্রভৃতি শৈব দর্শন ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। শোনা যায় যে বিখ্যাত পণ্ডিত পাতঞ্জলি নাকি কাশ্মীরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং বিখ্যাত রোগ নির্ণয় পণ্ডিত চরকও একজন কাশ্মীরী। এছাড়া সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষনা ও পুস্তক রচনা করে হিন্দু, মুসলমান বহু পণ্ডিত কাশ্মীরের যশ ও খ্যাতি

ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরেও প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাশ্মীরের এই পাণ্ডিত্যের গৌরব হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রাপ্য। কারণ উপরোক্ত হিন্দু পণ্ডিতগণের ন্যায় মুল্লা আহমদ আল্লামা (ইনি রাজতরঙ্গিনী ও মহাভারত পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন) মোহম্মদ তাহির খান (ইনি পারসী ভাষায় বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন) ইত্যাদি মুসলমান পণ্ডিতগণও প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরে মহিলা কবি, সুরশিল্পী প্রভৃতিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাশ্মীরের অনেক পণ্ডিত পারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন; আবার অনেক মুসলিম পণ্ডিতও সংস্কৃতের চর্চ্চা করে অনেক গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করেছেন। কাজেই কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত সংস্কৃতি গোড়া থেকেই গড়ে উঠছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-চর্চ্চা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ সুবিধা দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজা পর্য্যন্ত এসে কখনই পৌছায় নাই; তাই কাশ্মীরী প্রজা সাধারণের শিক্ষার হার—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রায় একই রূপ।

কাশ্মীরের বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ৪৯৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু দরিদ্র কাশ্মীরীদের অভাব দূর করবার জন্য প্রতি বৎসর যা বরাদ্দ (বাজেট) হয় তা হাস্যকর। কারণ মহারাজার জন্য প্রতি পাচ টাকায় এক টাকা হিসেবে রেখে তারপর অন্যান্য বরাদ্দ। এরপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মাইনে মিটিয়ে যা থাকে তা দিয়ে বৎসরের পর বৎসর প্রজাদের দারিদ্র্যকে জীবিত রাখবার খরচই পোষায় মাত্র!*

"The king of England receives roughly one in 1,600 of the national revenue, the king of Belgium one in 1,000, the kng of Italy one in 500,the king of Denmark one in 300, the Emperor of Japan one in 400. No king receives one in 17 like the Maharani of Travancore

পণ্ডিত নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এইসব সামন্ত রাজাদের লক্ষ্য করেই একদিন বলেছিলেন—"How much of the wealth of the States flows into that palace for the personal needs and luxuries of the prince how little goes back to the people in the form of any service"—অর্থাৎ রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত বিলাস ব্যসনে কত অর্থই না অপব্যয় হয়, আর কত সামান্যই না প্রজাদের জন্য ব্যয় হয়। দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজা, যারা শতকরা ৮৫ জন গ্রামে বাস করে থাকে; এবং যাদের শতকরা ৯৬ জন কৃষিকার্য্য করে মৃত্যুর হাত থেকে কোনরূপে নিজেদের বাঁচায় তাদের দুঃখের কাহিনী এইখানেই শেষ নয়। বিদেশী নকল শাল আমদানী হওয়ায় কাশ্মীরী শাল শিল্প একরূপ ধ্বংস হয়ে গেছে; বেগার খাটা প্রথা প্রজাদের জীবনকে করেছে পশুর চেয়েও অধম। আর এই অবস্থা হিন্দু মুসলিম শিখ সকল প্রজারই এক। সহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত, যারা ডোগরা রাজের উচ্ছিষ্ট ভোগীর দল, তাদের সঙ্গে সাধারণ কাশ্মীরী প্রজার জীবনের কোন সম্পর্কই নেই।

এই দুঃখের চেতনা কাশ্মীরের রাজনীতিতে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। মুসলিম কনফারেন্সের মধ্যে প্রভাবশালী অংশ বুঝলেন যে কাশ্মীরের আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদের পথে নিয়ে গেলেই প্রজাদের সত্যিকারের দাবীদাওয়া প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দৃঢ় হবে। ১৯৩৯ সালের ৮ই মে তারিখে মুসলিম কনফারেন্স—"দায়িত্বশীল

---

one in 13 as the Nizam of Hyderabad or the Maharaja of Baroda one in 5 as the Maharajas of Kasmir and Bikaner. The world would be scandalised to know that not a few Princes appropriate one in 3 and one in 2 of the revenues of the State." (A.R. Desai, "Indian Federal States and the National Liberation Struggle,"—Quoted in "India To-day" by R. P. Dutt.)

সরকার" প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে এক বিশেষ দিবস পালন করলেন। এতে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাই যোগদান করে। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কতিপয় কাশ্মীরী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে পত্র আদান-প্রদান হয় তা বিশেষভাবে কনফারেন্সের কর্ম্মীদের প্রভাবান্বিত করে। পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজের নিকট এক পত্রে পণ্ডিত নেহরু লিখেছিলেন : "It seems to me a great pity that the movement in Kashmir to gain additional freedom has a definite communal tinge. I wish it gave up communal garb and stood for firm nationalist colours"--অর্থাৎ কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেখে আমি বড়ই দুঃখিত। আমি আশা করি সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দূর করে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।

কাশ্মীরে তখন জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ; এবং কাশ্মীর যুব সভা (Kashmir Youth League) কিসান মজদুর সভা, ছাত্র সভা ইত্যাদি গড়ে উঠল। ১৯৩৭ সালের পূজার সময় খুব উৎসাহের সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর তদানীন্তন সেক্রেটারী ডাঃ আস্‌রফের (বর্ত্তমানে ইনি কমিউনিষ্ট মতবাদী) সভাপতিত্বে, ছাত্র সভার দ্বিতীয় অধিবেশন শ্রীনগরে হয়। এর ফল প্রগতিবাদী সেখ আবদুল্লার ওপর শীঘ্রই দেখা গেল।

নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে [স্থান জম্মু, তারিখ ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩৮] সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন :—

"আমাদের (মুসলিম প্রজাদের) ন্যায় হিন্দু ও শিখ কাশ্মীরী প্রজাও

দায়িত্বহীন স্বৈরাচারী [illegible] অত্যাচারে জর্জরিত। আমাদের মত শিক্ষার আলো তাদের জীবনেও পৌছে না; অত্যাধিক কর ভার, ঋণ ও ক্ষুধার জ্বালায় তাদের জীবনও জর্জরিত। জনগণের নিকট দায়িত্বশীল সরকার আমাদের পক্ষেও যেমন প্রয়োজন, তাদের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন। অতি শীঘ্রই তারাও আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। কোন সাম্প্রদায়িক প্রচারই তাদের আমাদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না।"

"আমাদের লক্ষ্যের পথে যে শক্তি বাধা দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে এক হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলাই আমাদের বর্ত্তমানের প্রধান কাজ। তার জন্য প্রয়োজন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটা সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলরূপে গড়ে তোলা এবং তার জন্য গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন। আমি আবার বলছি আমরা অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করবো। এবং যখন রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবো তখন মুসলিম বা হিন্দু কোন ভেদ আমাদের মধ্যে থাকবে না। যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্ব্বাচন অবশ্যই হবে। তা ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারে না এবং হলেও তা প্রাণহীন।"

তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন:—"আপনাদের অভিযোগ এই যে বিশেষ সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং আপনাদের আন্দোলনের বাধা সৃষ্টিকারী। কিন্তু বিশেষ সুবিধা ভোগী ধনী মুসলমানদের সম্বন্ধেও কি আমাদের ঐ একই অভিজ্ঞতা নয়? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আশার কথা যে প্রভূত বাধা থাকা সত্বেও কিছু কিছু দেশপ্রেমিক অমুসলমান আমাদের

সঙ্গে সহযোগিতা করছে ; যদিও আজ সংখ্যায় তাঁরা কম ; কিন্তু তাদের নিষ্ঠা ও নৈতিক সাহস থেকেই আমরা :তাদের শক্তি বুঝতে পারি। সুতরাং যে সমস্ত হিন্দু ও শিখ, এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসী তাদের জন্য অবশ্যই আমাদের প্রতিষ্ঠানের দুয়ার খুলে দিতে হবে।"

ঐ বৎসরই ২৮শে জুন মুসলিম কনফারেন্সের কার্য্যকারী সমিতির এক সভায় ৫২ ঘণ্টা ধরে আলোচনার পর, জেনারেল কাউন্সিলের কাছে মুসলিম কনফারেন্সের দুয়ার সংগ্রামকামী সকল সম্প্রদায়ের কাশ্মীরীদের নিকট খুলে দেবার জন্য সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাশ হয়।* আর ৫ই আগষ্ট "দায়িত্বশীল সরকার দিবস" পালন করবার জন্য জনসাধারনের উদ্দেশ্যে এক আবেদনও প্রচার করা হয়। কিন্তু সরকার আন্দোলনের এই গতিকে মোটেই ভাল চক্ষে দেখলেন না। এই আন্দোলনের ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন কাশ্মীর সরকারের বিভেদ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবারও তাই হলো। সংগ্রামের মুখে আন্দোলনের গতিকে কিছুতেই তাঁরা রোধ করতে পারলেন না। ঐদিন সরকার তখন দমন নীতির পথই গ্রহণ করলেন। এদিকে জম্মু ও শ্রীনগরে

"Where as in the opinion of the Working committee the time has come when all the progressive forces in the country should be rallied under one banner to fight for the achievement of responsible Government, the Working Committee, recommends to the General Council that in the forth coming annmal session of the Conference the name and constitution of the organisation be so altered and amended that all such people who desire to participate in this political struggle may easily become members of the Conference irrespective of their caste, creed or religion." —Inside Kashmir By P. N. Bazaz.—chapter Communalism to Nationalism—page 194

অনেক সভা সমিতি হয় এবং তাতে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারনই যোগ দেয়। এই দেখে সরকার আরও ঘাবড়ে যান এবং কাশ্মীরের কুখ্যাত "১৯-এল" অর্ডিনান্সের কবলে শত শত কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনকে গুণ্ডার উৎপাত বলে আখ্যা দিয়ে পুরোপুরি দমনরাজ চালু করেন। গ্রেপ্তার, জরিমানা, লাঠিচালনা—কিছুই বাদ যায় না। ফলে কাশ্মীরের সুপ্ত সংগ্রামীশক্তি সমস্ত সাম্প্রদায়িক বাধাকে ভেঙ্গে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করল। সরকারের দমন নীতি ব্যর্থ হলো। ২৯শে আগষ্ট (১৯৩৮) ১২ জন হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচার করা হয়। তাঁরা সকলে মহারাজার শাসনে শাসিত কাশ্মীরীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে মূল শাসন যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ব্যতীত কাশ্মীরী প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান অসম্ভব। এবং তার জন্য যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আবশ্যক তা'ও তাঁরা ব্যক্ত করেন। এই ১২ জন নেতার নাম :— (১) সেখ মহম্মদ আবদুল্লা (২) এম, এম, সৈয়ীদ (৩) গোলাম মহম্মদ সাদিখ্ (৪) মিঞা আহমদ ইয়ার (৫) এম, এ, বেগ (৬) পণ্ডিত কাশ্যপ বন্ধু (৭) পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজ (৮) এস, বুধা সিং (৯) পণ্ডিত জিয়ালাল কিলাম (১০) গোলাম মহম্মদ বক্সী (১১) পণ্ডিত শ্যামলাল সরফ্ (১২) ডাঃ শম্ভুনাথ পেসিন।

এদের স্বাক্ষরিত প্রচার পত্রে বলা হলো :—"Our movement has a gigantic urge behind it It is the urge of hunger and starvation which propels it onward in even most adverse circumstances.

"The ever-growing menace of unemployment amongst our educated youg men and also among the

illiterate masses in the country, the incidence of numerous taxes. the burden of exhorbitant revenue, the appalling waste of human life due to want of adequate modern medical assistance, the miserable plight of uncared for thousands of labourers outside the state boundaries, and, in face of all this, the patronage that is being extended in the shape of subsidees and other amenities to out side capitalists, as also the top heavy administration that daily becomes heavier,—point to only one direction that the present conditions can never be better as long as a change is not made in the basic principles underlying the present system of Government.

"Our cause is both rightious, reasonable and just. We want to be the makers of our own destinies and we want to shape the ends of things according to our choice."—অর্থাৎ "আমাদের এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে বিপুল প্রেরণা, সে প্রেরণা এসেছে শোষিত জনতার ক্ষুধার জ্বালার মধ্য দিয়ে ; এবং তা শত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এগিয়ে চলেছে।

"শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কর্মক্ষম যুবকদের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার অবস্থা, জনসাধারণের ওপর অত্যধিক কর ও রাজস্ব ভার, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার নিম্নতম আধুনিক ব্যবস্থার অভাবে অসম্ভব জীবনী-শক্তির অপচয়, রাজ্যের সহস্র সহস্র দিন মজুরের দুঃখ দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের ওপর এক ব্যয়বহুল "গুরুভার" শাসনযন্ত্র চাপিয়ে রেখে কৌশলে রাজ্যের বাইরে থেকে ধনীদের আমদানী করে তাদের যেভাবে সুখ, সুবিধা ও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তাতে মাত্র এই একটি সিদ্ধান্তই হয় যে—যতদিন সরকারী শাসনযন্ত্রের

মূল কাঠামোর পরিবর্ত্তন না হবে ততদিন জনসাধারণের মুক্তির আশা নাই।"

"আমাদের দাবী যুক্তিসঙ্গত এবং সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্যের পরিচালনা করবার অধিকার চাই; এবং আমাদের ইচ্ছানুসারে ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাই।"

সেখ সাহেবের মনের ভেতর তাঁর দেশবাসীর পুঞ্জীভূত দুঃখের কথা এত তীব্রভাবে লেগেছিল যে তিনি মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে যখনই তাদের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করতে উঠতেন তখনই তাঁর চিন্তাধারা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠত। তাঁর দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠতো তাঁর নিপীড়িত দেশবাসীর ক্লিষ্ট মূর্ত্তি—যারা মানুষ হ'য়েও গৃহপালিত পশুর মত জীবন যাপন ক'রছে। শেখ সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে তাদের আহ্বান ক'রে বলতেন, "একবার আপনারা উঠুন এবং ধ্বনি তুলুন "জিয়েঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" (হয় বাঁচার মত বাঁচবো নয় মরবো)। এবং এগিয়ে চলুন। কারাবাস, পুলিশ জুলুম, গোলাগুলি লাঠি চার্জ, জরিমানা, বেত্রাঘাত এবং ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত কিছুই আমাদের পথ রুখতে পারবে না।" (পুঞ্চে পঞ্চম মুসলিম কন্‌ফারেন্সে শেখ সাহেবের অভিভাষণ—তারিখ ১৪ই মে ১৯৩৭)।

তিনি বুঝতে পারলেন যে সামন্তবাদী (Feudalistic) এবং পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাই জনসাধারণের ঐ দুর্দ্দশার মূল কারণ। জম্মুতে ২৫-২৬ মার্চ্চ (১৯৩৮) ষষ্ঠ মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সে প্রজাদের একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলেন যে "পুঁজিপতিরা এই প্রজা আন্দোলনকে ঘায়েল করবার জন্য একে হিন্দুরাজের পরিপন্থী ব'লে বা কখনও একে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পরিপন্থী ব'লে জিগীর তুলে প্রজাদের বিরোধ

করছে এবং তাদের মূল দুঃখ দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।" তিনি তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "কাশ্মীরের স্বাধীনতার লড়াইয়ে মুস্‌লিম, হিন্দু ও শিখ পুঁজিপতিবৃন্দ একদিকে মিলেছে, সুতরাং গরীব হিন্দু, মুস্‌লিম ও শিখদিগেরও একই শিবিরে একত্র হওয়া খুবই প্রয়োজন।

"ন্যাশনাল কনফারেন্স"

১৯৩৯ সালের ১০ই জুন তারিখে শ্রীনগরে নিখিল জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলিম কনফারেন্সের এক বিশেষ অধিবেশন হয় মুসলিম কনফারেন্সকে জাতীয় কনফারেন্সে পরিবর্ত্তিত করবার দাবী বিবেচনা করবার জন্য। সভাপতিত্ব করেন গোলাম মহম্মদ সাদিক্। সমস্ত সহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে ১৭৬ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১০ই তারিখের সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি মূল প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হয়। এবং ১১ই তারিখেও বেলা ২টা পর্য্যন্ত আলোচনার পর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলে ১৭৬ প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৩ জন বিপক্ষে ভোট দেন। বিপুল উদ্দীপনা ও আত্মসমালোচনার মধ্যদিয়ে ১১ই জুন নিখিল জম্মুও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের (All Jammu and Kashmir National conference) জন্ম হলো। কাশ্মীরের রাজনৈতিক সংগ্রাম সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালি পার হয়ে নূতন পথে চলল। সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করে "জাতীয়" শক্তি জয়লাভ করল। এবং সম্মেলন এখন থেকে প্রকাশ্যেও সকল সম্প্রদায়ের কাশ্মীরী প্রজার সম্মেলন হয়ে দাঁড়াল। দেশভক্ত কয়েকজন হিন্দু ও শিখ কাশ্মীরী নেতাদের কনফারেন্সের কার্য্যকরী সভায় (ওয়াকিং কমিটী) সাদরে গ্রহণ করা হলো; এবং সম্মেলনের সভ্যপদ সকল সম্প্রদায়ের কাশ্মীরী দেশভক্ত প্রজাদের নিকট উন্মুক্ত করা হলো। কার্য্যকরী সমিতিতে

যাদের লওয়া হলো তাদের নাম :—সরদার বুধা সিংহ, পণ্ডিত জিয়ালাল কিলাম, লালা গিরিধারী লাল, পণ্ডিত কাশ্যপ বন্ধু এবং পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজ।

এদের মধ্যে একজনের বিশেষ পরিচয়ের দরকার। তিনি সর্দ্দার বুধা সিং—ইনি একজন কাশ্মীরী শিখ! তিনি কর্ম্মীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর বর্ত্তমান (১৯৪৯) বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর। তিনি কাশ্মীর সরকারের একজন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। কিন্তু প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করবার অপরাধে ১৯৩১ সালের গণবিক্ষোভের পূর্ব্বেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে বাহু দুর্গে (Bahu Fort) বন্দী করে রাখা হয়। তাঁর দেশপ্রীতির অপরাধে কাশ্মীর রাজ সরকার তাঁর পেনসন বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু সর্দ্দারজী তা'তে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে আরও উৎসাহের সঙ্গে দেশের কাজে লেগে যান। তিনি মুসলিম কনফারেন্সে যোগ দিতে না পারায় শেখ সাহেবকে পুনঃ পুনঃ বলতে থাকেন যাতে সকল সম্প্রদায়ের কর্ম্মীদের জন্য সেখ সাহেব তাঁর কনফারেন্সের দুয়ার খুলে দেন। কাশ্মীর প্রজা পরিষদের নির্ব্বাচনে তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং যখনই সুযোগ হয়েছে তখনই তিনি প্রজাদের পক্ষ নিয়ে সেখ সাহেবের পার্টির সাথে মিলিত ভাবে সরকারের সঙ্গে লড়েছেন। প্রয়োজন বোধে সেখ সাহেবের সঙ্গে ভোট দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধতা করেছেন। তিনি খুবই সরল জীবন যাপন করে থাকেন এবং গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ১৯৩৬ সালের থেকে তিনি জাতীয় সম্মেলনের আদর্শে একান্তভাবে কাজ করে আসছেন। ১৯৪৬ সালের "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনের সময় সরকার কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হন। বর্ত্তমানে তিনি সেখ সাহেবের অন্যতম সহকারী মন্ত্রীরূপে কাশ্মীর সরকারে যোগদান করেছেন।

এরূপ দেশসেবকবৃন্দ যখন শেখ আবদুল্লার সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে কাশ্মীরী প্রজাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবার সুযোগ পেলেন তখন কাশ্মীরের প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে যে তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ঘটনা-বিন্যাস থেকেই পাঠকের কাছে তা পরিষ্কার হবে।

সাত

নয়া কাশ্মীরের স্বপ্ন

১১ই জুন কাশ্মীরের ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। সংগ্রামী কাশ্মীরী প্রজাসাধারণের দাবী আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের ওপর জয়লাভ করেছে। কাজেই কাশ্মীর ও জম্মু উপত্যকায় "জাতীয় সম্মেলনের" সংগঠণের জন্য সেখ আবদুল্লার আহ্বানে শত শত হিন্দু-মুসলমান কাশ্মীরী যুবক উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল। সমস্ত কাশ্মীরে যেন এক নূতন জীবন দেখা দিল। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের আকাশ-বাতাস আবার যেন কোন যাদুমন্ত্রে চঞ্চলতর হয়ে উঠল। কিন্তু এবার যে সাড়া পাওয়া গেল তা শুধু শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকেই আসেনি; এবার নীচের তলার নির্য্যাতিত মানুষ নূতন জীবনের সন্ধানে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসবার সংকেতও জানিয়ে দিল।

সংগঠণের কাজ যখন পুরোদমে চলল তখন কর্ম্মীরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে বুঝতে পারলেন যে "জাতীয় সম্মেলনের" মূল দাবীদাওয়ার বিষয় জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য কর্ম্মীদের এক সম্মেলনে মিলিত হওয়া খুবই দরকার। সাব্যস্ত হ'লো সেপ্টেম্বর ৩০-৩১ ও অক্টোবরের ১লা (১৯৩৯) তারিখে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শ্রীনগর সহর থেকে ৩৪ মাইল উত্তরে অনন্তনাগে গ্রামঞ্চলের পরিবেষ্টনীতে হবে।

নির্দ্ধারিত দিনে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হ'লো। এবং এই সম্মেলনের

উদ্যোগ আয়োজন জনতার মধ্যে বেশ আলোড়ন এনে দেয়। সম্মেলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রায় প্রত্যেকটী সহর থেকেই—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকল ধর্ম্মের—দেশ প্রেমিক কর্ম্মীবৃন্দ সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের সাফল্য প্রতিক্রিয়াশীলদের খুবই ঘাবড়ে দেয় এবং দেখা গিয়েছে যে সম্মেলন যখনই নিপীড়িত কাশ্মীরী প্রজাদের দাবী নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি করেছে তখনই তারা গা ঢাকা দিয়েছে। সংগ্রামী জনতা ও নেতাদের নিকট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি—সামন্ত প্রথাই হোক বা সাম্প্রদায়িকতাই হোক, সর্ব্বদাই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আপোষ-রফাকামী নেতৃত্বই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে; কিন্তু সংগ্রামী বিপ্লবী শক্তি তা করে না। কাশ্মীরের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিপ্লবী জাতীয় শক্তির কাছে পরাজয়ের ইতিহাস তারই সাক্ষ্য। কিন্তু যখনই জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী কর্ম্ম-পন্থা ত্যাগ করছেন তখনই তাদের আপোষ করতে হয়েছে।

সম্মেলনে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে কাশ্মীরের স্বৈরাচারী সরকারের পরিবর্ত্তে দায়িত্বশীল সরকার দাবী ক'রে যে মূল প্রস্তাব (জাতীয় দাবী) পাশ হয় তা দু'টী কারনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ জাতীয় সম্মেলন এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় কাশ্মীরের দরিদ্র জনসাধারণ সম্মেলনের নেতৃত্বের ওপর আরও আস্থাবান হয়ে উঠল। এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারের পক্ষেও আর শুধু দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে আন্দোলনকে ব্যর্থ করবার দুঃসাহস ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে মোটামুটি দাবীগুলি করা হয়:

(ক) কাশ্মীরের বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার অবসান ও তার পরিবর্ত্তে দায়িত্বশীল সরকার গঠন।

(খ) মন্ত্রীসভা কাশ্মীর-জম্মু আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল হবে এবং শুধু মাত্র মহারাজার ব্যক্তিগত দায়িত্বে ব্যয়ের তালিকা ব্যতীত সাধারণ আয় ও ব্যয়ের ওপর কর্ত্তৃত্ব করবে।

(গ) আইন সভার রাজ্যের সকল প্রকার ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনার অধিকার থাকবে। কিন্তু মহারাজার সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতায় ব্যয় করবার ক্ষমতা থাকবে।

(ঘ) আইন সভার সভ্য সকলেই প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্ব্বাচিত হবেন। শ্রমিক, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নির্ব্বাচিত সভ্যও থাকবেন।

(ঙ) পরিষদের নির্ব্বাচন যুক্ত-নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হবে। এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকবে। তাদের ধর্ম্ম-সংস্কৃতি ও শিক্ষার সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট থাকবে।

(চ) জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল কাশ্মীরী প্রজাকেই দেশ রক্ষার কার্য্যে সৈন্য বাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। এবং তারজন্য একজন বিশেষ মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন যিনি পরিষদের নিকট তাঁর কার্য্যের জন্য দায়ী থাকবেন।

(ছ) রাজ্যের কোন প্রজার ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনা বিচারে হরণ করা চলবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে "জাতীয় সম্মেলনের" পতাকা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। স্থির হ'লো যে পতাকার রং হবে লাল (বিপ্লবের চিহ্ন) এবং তাতে দরিদ্র কাশ্মীরী কৃষকের প্রতীক লাঙল অঙ্কিত থাকবে। তৃতীয় প্রস্তাবে পূর্ব্ব বৎসর (১৯৩৮) ২৯শে আগষ্ট তারিখে নেতৃবৃন্দ যে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন তা সমর্থন করা হয়। দারিদ্র্য নিষ্পেষিত কাশ্মীরী প্রজার অবস্থার উন্নতি যে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায়

সম্ভবপর নয়, নেতৃবৃন্দ এই বিবৃতিতে সেই কথাই বিশদভাবে বলে শাসন যন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন দাবী করেছিলেন।

মোট কথা সেখ সাহেবের নেতৃত্বে ও তাঁর বিশ্বস্ত হিন্দু-মুসলিম-শিখ সহকর্মীদের সহায়তায় কাশ্মীরের আন্দোলন এখন গণ-আন্দোলনের পথে চলল। সেখ সাহেব এবার আরও উৎসাহে সংগঠণের কার্য্যে লেগে গেলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরদল তাদের এই পরাজয়কে সহ্য করতে না পেরে তারা কাপুরুষের মত শ্রীনগরে জাতীয় সম্মেলনের কার্য্যালয় "মুজাহিদ মন্‌জিল'' আক্রমণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয় সম্মেলনের কর্ম্মীদের শক্তি দেখে তারা আর আক্রমণ করার সাহস করে না। স্বার্থ-সম্পন্ন ধনী মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদারা যারা মুসলিম কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে তাদের সুখ সুবিধা করে নেবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা দেখলেন যে এখন তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ গরীবের অবস্থার উন্নতিতে তাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ কোথায়? কাজেই তারা জাতীয় কনফারেন্স সম্বন্ধে তাদের পত্রিকা মারফৎ নানারূপ মিথ্যা কুৎসা রটনা করতে থাকে ও সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু সেখ সাহেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে তিনি মিথ্যাকে কখনো বরদাস্ত করতে পারতেন না। এবং মিথ্যাবাদী ও অনাচারী প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক না কেন, অমিত বিক্রমে সত্যের পক্ষ নিয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও হলো তাই। জাতীয় সম্মেলনের কর্ম্মীদের সেখ সাহেব এমনভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন যাতে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা তাদের টলাতে না পারে। এই সময়ে মুসলিম কনফারেন্সের যে কয়েকজন প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতাবাদী জাতীয় কনফারেন্সের মধ্যে ছিল—সেখ সাহেবের আত্মসমালোচনার

কঠোর আঘাতে তাদের জাতীয় সম্মেলন ছাড়তে হয়। এদের মধ্যে প্রধান হলেন চৌধুরী গোলাম আব্বাস। ইনিই মুসলিম কন্‌ফারেন্সের বর্ত্তমান সভাপতি এবং কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচারে ব্যর্থ-কাম হয়ে বর্ত্তমানে করাচীতে তার আস্তানা করেছেন এবং সেখান থেকে জাতীয় সম্মেলনের নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করছেন।

জাতীয় সম্মেলনের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসভ্যদের মধ্যেও কতিপয় সদস্য এই পথই অনুসরণ করতে বাধ্য হন। কারণ সেখ সাহেব তাঁর জীবনের গণআন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কর্ম্মী নির্ব্বাচনের ও জনসাধারণের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সত্য পথ নির্ব্বানের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দূর দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এ পরিস্থিতি অভাবনীয় কিছু নয়। কাজেই সুবিধাবাদীদের গণসম্মেলনে আর স্থান হলো না। একে একে তাদের খসে পড়তে হয়।

সেখ সাহেব কর্ম্মীদের সাথে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সম্মেলনের মূল দাবী, যাতে দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তণ ও প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি সভার নিকট দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছে—তা বুঝিয়ে দিতে সভা-সমিতি করতে লাগলেন জনসাধারণের কাছে যাওয়ায় তারা বুঝতে পারল যে সেখ সাহেবের শত্রুদের প্রচার কতখানি মিথ্যা। সরল প্রাণ কাশ্মীরী মুসলিম কৃষকদের কাছে সেখ সাহেবের প্রতিপক্ষ প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে সেখ সাহেব মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চাকুরীর লোভে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে তিনি হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু সেখ সাহেব যখন তাঁর সরল মুসলিম দেশবাসীর কাছে যেয়ে দাঁড়িয়ে বললেন যে তাঁর আপন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস সরলপ্রাণ কাশ্মীরী মুসলমানদের মতই গভীর এবং তার ধর্ম্ম অপরকে ঘৃণা করতে শেখায় না

এবং তিনি কাশ্মীরের সকল সম্প্রদায়ের গরীব ও শোষিত প্রজার জন্যই লড়বেন তখন তাদের চিত্ত তিনি এক নিমিষেই জয় করলেন।

আজ পর্য্যন্তও আপন ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা সেখ সাহেবের অসাধারণ। প্রতি শুক্রবারে তাঁকে প্রার্থনা সভায় সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়। এবং প্রার্থনান্তে তিনি জনসাধারণের সঙ্গে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। আবার অপর ধর্ম্মের বিশিষ্ট দিনগুলিতে সভাসমিতিতে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা ও মনের ভাব আদান প্রদান করেন। জনসাধারণের সঙ্গে এই ভাবেই মেশবার ফলে তাঁর প্রতি জনতার প্রীতি এত বেড়ে যায় যে সেখ সাহেবকে তারা "শের-ই কাশ্মীর"—বা বীর কেশরী আখ্যা দেয়। এই সময় সেখ সাহেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে কাশ্মীরে নানারূপ লোকসঙ্গীত ও লোকনাট্য ইত্যাদি গড়ে ওঠে। দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে।

একদিন কোন কাজের জন্য তাঁকে কাশ্মীর উপত্যকা পার হয়ে লে-র পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেতে হয়। ফেরবার সময় তিনি একদল রাখাল ছেলেকে রাস্তার ধারে ভীড় জড়ো করে সহজ সরল ভাষায় গান গাইতে দেখেন। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরই তিনি বুঝলেন যে এ গান তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। এবং তার জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করেএইসব গাঁথা এরা রচনা করেছে।

আর একদিন তিনি শ্রীনগরের অন্য একটি মহল্লায় রাত্রিতে কোন কাজ উপলক্ষে থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু গভীর রাত্রিতে ঘুমাতে যেয়ে তিনি তার পাশের বাড়ীতে উৎসবের হট্টগোলে ঘুমাতে পারেন না। তিনি তাঁর শোবার ঘরের জানালা খুলে উঁকি দিতেই দেখতে পান যে ডোগরা রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর

(সেখ সাহেবের) জীবনকে নিয়েই একটি নাটকের অভিনয় করছে এরা।

একজন সাংবাদিক শ্রীনগরের একজন সাধারণ কাশ্মীরী মেয়ে-ছেলেকে সেখ সাহেবের এত জনপ্রিয়তা দেখে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, "শের-ই-কাশ্মীর তাদের জন্য কি করেছেন?"

"কী করেছেন?......কী তিনি আমাদের জন্য করেন নাই? তিনি আমাদের জন্য সব কিছু করেছেন। তাঁকে ছাড়া যেন আমরা কিছুই না। আমি একজন অশিক্ষিত মেয়ে মানুষ। কিন্তু আমি তোমার সাথে সহজ ভাবে নির্ভয়ে কথা বলবার সাহস পেয়েছি তাঁরই জন্য।"

ডোগরা রাজের একটি পুলিশকে দেখিয়ে দিয়ে সে নির্ভয়ে বলল—"আজ আর আমরা ওকে ভয় করে কথা বলি না।"*

কাশ্মীরের রাজনীতির এই নূতন অগ্রগতি এই সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে (১৯৪০) কাশ্মীরে আসেন। জাতীয় সম্মেলনের অতিথি পণ্ডিত নেহেরুকে, কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলিম জনতা এমন অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে যে কোন মহারাজা বা বড়লাট বাহাদুর কোনদিন তা পাবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

কাশ্মীরের নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিই পণ্ডিত নেহরুর এবারের আগমনের প্রধান কারণ। তিনি দশদিন কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করেন। এবং তাঁর বক্তৃতায় তিনি জাতীয় সম্মেলনকে দরিদ্র কাশ্মীরী প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য অভিনন্দিত করেন। এবং হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে সকলকে এই সংগ্রামে যোগ

* ঘটনাগুলি কল্পনা নয়। Illustrated weekly নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৪৮) সংখ্যায় খাজা আহাম্মদ আব্বাস এগুলি প্রকাশ করেছেন।

দেবার জন্ম আবেদন করেন। তিনি আরও বলেন যে ভারতবর্ষের যে কোন অংশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তির আন্দোলন ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অংশ। তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিত ও অন্যান্য হিন্দু যারা রাজ দরবারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছেন ও নিজেদের প্রজা আন্দোলন থেকে পৃথক করে রাখছেন বা প্রজা আন্দোলনের বাধা সৃষ্টি করছেন, তাদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে জাতীয় সম্মেলন কর্তৃক উত্থাপিত "দায়িত্বশীল সরকার" প্রতিষ্ঠার দাবী সাফল্য লাভ করতে বাধ্য।

পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা কাশ্মীরের জনসাধারণকে খুবই প্রেরণা দেয়। এবং জাতীয় সম্মেলনের সভ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সুবিধাবাদীরা পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায় খুবই প্রমাদ গনল। এমন কি সম্মেলনের মধ্যেও কিছু কিছু প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বকামীর দল সম্মেলনের প্রগতিবাদী ধারা দেখে দলত্যাগ করেন। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মানুষ তখন জেগে উঠেছে।

বলাবাহুল্য পণ্ডিত জওহরলালের তখনকার গণতান্ত্রিক মতবাদ ও ভারতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্য এই সব কারণে আরও দৃঢ়ভাবে আবদুল্লাকে তাঁহাদের সহকামী ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সকে তাদের বন্ধু স্থানীয় করে তোলে।

কাশ্মীরের সাধারণ অধিবাসী মুসলমান, অত্যাচারী রাজা হিন্দু।— কাজেই অতি সহজেই এই গণ-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে পরিণত করা সম্ভব। আর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যখন কংগ্রেস লীগের বিরোধীতা জমেছে, তখন লীগ নেতারা কাশ্মীরকে তাদের করায়ত্ত করতে চাইবেন, এ সহজেই বুঝা যায়। পণ্ডিত নেহরুর

কাশ্মীর ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে মুস্‌লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশেষ করে যারা সম্মেলন ত্যাগকারী, তারা প্রচার চালাতে আরম্ভ করলেন যে জাতীয় সম্মেলন "হিন্দু" কংগ্রেসের লেজুর এবং সেখ মহম্মদ আবদুল্লা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সত্য সত্যই এই প্রচার যে কত মারাত্মক হতে পারে তা' পরবর্ত্তী কালে আমরা সীমান্ত প্রদেশে খান্ আবদুল গফুর খানের বিরুদ্ধে যেভাবে মুস্‌লিম লীগ মুসলমান জনগণকে ক্রমশঃ মাতিয়ে তোলে তা' দেখে বেশ অনুমান করতে পারি। কিন্তু সেখ সাহেব ভরসা রাখলেন দৃঢ়ভাবে জনশক্তির উপর আর গণ-তান্ত্রিক মতবাদের উপর। সেখ সাহেব এই প্রচারের প্রত্যুত্তর দিলেন জনসাধারণের কাছে জাতীয় সম্মেলনের দাবী ও কার্য্যাবলীর ব্যাখ্যা ক'রে। মুসলমানদের কাছে তিনি বলতেন যে ধর্ম্ম হিসাবে ইস্‌লামই তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু ইস্‌লাম তাঁকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা বা দ্বেষ করতে শেখায় না। আর তাদের বুঝাতেন যে তাদের যে মূল সমস্যা অর্থাৎ দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা, তার ওপরে তো আর কোন ধর্ম্মের ছাপ মারা নেই; সে সমস্যা তো দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, শিখ কাশ্মীরী প্রজা মাত্রেরই সমস্যা। সুতরাং তাকে দূর করতে হলে চাই, যে শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা তাদের এই অবস্থায় এনেছে তার চিরতরে অবসান। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ভিন্ন এই শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা দূর হতে পারে না। আর সে সংগ্রাম যদি হিন্দু-মুসলমান ও শিখ কাশ্মীরী প্রজার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম না হয় তবে তা' সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হ'তে বাধ্য। এবং সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম আত্মকলহ, আর তা হলেই তাদের সংগ্রাম মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে।

প্রজার দাবী

১৯৪০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বারমূলা সহরে জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেখ সাহেব এই সম্মেলনে এমন

কয়েকটী প্রস্তাব আনেন—এবং তা গৃহীতও হয়,—যা সম্মেলনকে দরিদ্র প্রজার যথার্থ মুখপাত্র করে তোলে।

এই অধিবেশনের মূল প্রস্তাবে বলা হয় যে "জাতির নিকট এমন কোন দায়িত্বশীল সরকার গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে না যে সরকার কৃষককে তার পরিশ্রমের পূর্ণ মূল্য দেবে না; এবং সেইজন্য আজ ঘোষণার প্রয়োজন হয়েছে যে জমিতে শুধু তারই অধিকার থাকবে যে জমি চাষ করবে ও ফসল ফলাবে।" প্রজা সাধারণের আশু উপকার দাবী করে প্রস্তাবে দাবী করা হয়: (ক) ভূমি-আইনের আশু সংস্কার যার ফলে প্রজাদের ওপর গুরু ট্যাক্স ভার কমবে। (খ) অল্প জমি সম্পন্ন প্রজাদের ট্যাক্স নিম্নতম হারে ধার্য্য করা। আর একটী প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে প্রজা সাধারণের ওপর যে গুরু ঋণ-ভার রয়েছে তা থেকে কৃষকের মুক্তির পথ বের করতেই হবে। এবং যে ক্ষেত্রে শুধু সুদ যা দেওয়া হয়েছে তা যদি মূল পাওনা টাকার সমান হয়ে থাকে তবে ঋণ শোধ হয়েছে বলে স্বীকার করে নিতে হবে। সম্মেলন আর একটী প্রস্তাবে প্রজা সাধারণকে জানায় যে "যখন জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এরূপ ঋণ থেকে কৃষককে মুক্তি দেবার জন্য বিশেষ আইন করা হবে।" এ-থেকেই বোঝা যায় যেহেতু সেখ সাহেবের নেতৃত্বে কাশ্মীরের দরিদ্র প্রজা-সাধারণ জাতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মুক্তির সন্ধান পেয়েছে, কাজেই সম্মেলনের প্রত্যেকটী দাবীর সঙ্গে নিজেদের সংগ্রামী আওয়াজ তারা মিলিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাঁধল তখন জাতীয় সম্মেলন যে প্রস্তাব যুদ্ধ সম্পর্কে গ্রহণ করে তা মোটামুটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রস্তাবেরই অনুরূপ। কিন্তু সেখ সাহেব জাতীয়

সম্মেলনের দৃষ্টি তাঁর মূল দাবী (National Demand)—অর্থাৎ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী—(৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) থেকে অন্য কিছুতেই নিবদ্ধ করেন নি। সেখ সাহেব—জাতীয় সম্মেলনের মূল দাবীর উত্তর কাশ্মীর সরকার কী দেন তাই লক্ষ্য করছিলেন এবং জনমতকে দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

মহারাজা কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করেই ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষকে যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। এবং তাঁর অতিরিক্ত ব্রিটীশ ভক্তির জন্য কাশ্মীরের মহারাজকে যুদ্ধের সময় "রাজকীয় যুদ্ধ সভায়" (১৯৪৪) লণ্ডনে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হয়, এবং তিনি সানন্দে তা'তে যোগদান করেন। বিলাতের বৃটিশ কর্ত্তপক্ষ কাশ্মীরের মহারাজাকে আদর করে "Shield of the Empire" "সাম্রাজ্যের রক্ষা-আবরণ" বলে অভিহিত করতেন।

কাশ্মীরের যে সৈন্য-বাহিনী আছে তার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার (১৯৪৪ সালের হিসাব--Statesman Year Book--1945)। এবং তাতে কাশ্মীরী-দের কোন স্থান নেই। তাতে আছে ডোগরা, গুর্খা, ক্যাংগরা রাজপুত এবং পাঞ্জাবী জাঠ শিখ। অর্থাৎ রাজ্যের সৈন্য-বাহিনী ছিল একটি সাম্প্রদায়িক সৈন্য-বাহিনী এবং তা'তে কাশ্মীরীদের (হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেযে) কোন স্থানই ছিল না। ১৯৩৯ সালে এই সৈন্য-বাহিনীর জন্য খরচা হতো প্রায় ৪৭৷৷০ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যয় বেড়ে হয় ৯০ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া মহারাজার তত্ত্বাবধানে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা হয় যুদ্ধ তহবিলে "চাঁদা" হিসাবে; এবং প্রায় ৫০ হাজার লোক দিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে মহারাজা যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন। দিল্লীর "কাশ্মীর প্রাসাদ" যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত দপ্তর বসবার জন্য ছেড়ে দেন।

মহারাজা বড়লাট বাহাদুরের কাছে যুদ্ধ তহবিলে ৫০,০০০ পাউণ্ড চাঁদা পাঠিয়ে বৃটিশ শক্তির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। * কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রজাদের ওপর যখন নেমে আসতে থাকে খাদ্যাভাবের কালো ছায়া ও অপদার্থ রাজ-কর্ম্মচারীদের অত্যাচার, (যার আস্বাদ বাংলা দেশ যুদ্ধের সময় মর্মান্তিক দুঃখের মধ্য দিয়ে পেয়েছে)—তখন কিন্তু মহারাজার প্রজাদের জন্য অর্থব্যয়ের বা প্রীতির বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কাজেই ১৯৪২ সালে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ ধারণ করল, সেখ সাহেব জাতীয় সম্মেলনকে তখনই সে পথে নিয়ে গেলেন না। কিন্তু ভারতময় সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা-সমিতি করে প্রতিবাদ জানাতে বিরত হ'লেন না। 'কারণ তাঁর কাছে তখন ক্ষুধাতুর দেশবাসী চায় তাঁর সাহায্য, তাঁর নেতৃত্ব। তা' ছাড়া সম্মেলনের মূল দাবীরও কোন উত্তর সরকার তখনো দেয় নাই। কাজেই তখনই সহসা ভারতের আন্দোলনের অনুগামী কোন আন্দোলন তিনি আরম্ভ করলেন না। যুদ্ধের সময় কাশ্মীরের অবস্থার কথা বলতে যেয়ে সেখ সাহেব "নিউ কাশ্মীর" বা নয়া কাশ্মীর পুস্তিকার মুখবন্ধে বলেছিলেন—

"কাশ্মীরের সমস্যার সাথে, ভারতবর্ষ ও তথা সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার যে মূল কেন্দ্র,—তার যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং দেশপ্রেমিক কর্ম্মী হিসাবে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'লো আমাদের দেশবাসীদের এখানে অনাহারের হাত হ'তে রক্ষা করা, এবং ভারতবর্ষের তথা সমগ্র পৃথিবীর ফ্যাসী-বিরোধী শক্তিকে সহযোগীতা দ্বারা শক্তিশালী করা। সেই উদ্দেশ্যেই জাতীয় সম্মেলনের সমগ্র শক্তিকে আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। এবং ফুড কমিটীর মারফৎ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ জনসাধারণের

* Times of India Year Book (1947) pages—232-33.

মধ্যে যথাযথ ভাবে বিতরণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এই ভাবেই যখন জনসাধারণের সম্মুখে অনাহারের করাল ছায়া নেমে আসে তখন জনসাধারণের পাশে জাতীয় সম্মেলনই দাঁড়িয়েছে এবং অকর্ম্মণ্য আমলা-তান্ত্রিক শাসন যন্ত্রের বাধা সত্ত্বেও জনগণকে আমরা অনাহার ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হই।"

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে গভীর দেশপ্রেম ও জনগণের দুর্দ্দশার অনুভূতিই সেখ সাহেবকে এই নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে, আর তাঁর সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রীতিই তাঁকে ফ্যাসিস্ত শক্তিদের বিরুদ্ধেও পূর্ব্বাপর উদ্বুদ্ধ করে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিগত মহাযুদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে সেখ আবদুল্লার কোনো সময়ে মনে সন্দেহ জন্মে নাই, তিনি বুঝেছিলেন ফ্যাসিস্ত শক্তিদের পরাজয় না ঘটলে পৃথিবীতে সকল দেশেই জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা লোপ পাবে। তাই, ফ্যাসিস্তরা যুদ্ধে জিতবে, আর তাদের সাহায্যে ভারতবর্ষ বা কাশ্মীরের জন-সাধারণ স্বাধীন হবে এ-কথা তিনি কল্পনাও করেনি; আর মহাযুদ্ধের সময়ে ঐরকম কোনো সুযোগে একটা "শর্ট এণ্ড সুইফ্‌ট্‌ ষ্ট্রাগল্‌" করে ফাঁকি দিয়ে ক্ষমতা দখল করা যাবে, এ ভুলও তাঁর হয়নি। তাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে নেতারা তাঁর আদর্শস্থানীয় সেখ আবদুল্লা যুদ্ধ ব্যাপারে তাদের অনুগামী হলেন না, বরং দৃঢ়তর ফ্যাসিস্ত বিরোধিতার, জন-সেবার ও গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় দিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্যকারী ও শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের মহারাজার "যুদ্ধ-প্রীতি"র সঙ্গে এই গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধও মৌলিক—একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একজনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর জন-শক্তির মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে স্বদেশের জন-শক্তির মুক্তি

আন্দোলনকে অচ্ছেছ্য করে বোঝা ও তাই জনগণের সত্যিকারের উন্নতি ও মঙ্গল; আর একজনের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে তুষ্ট করে জনগণের ওপর নিজের শোষণের সিংহাসনকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যর্থ প্রয়াস।

এইসব রাজা-মহারাজাদের মুখেই দেশপ্রেমের বাক্য-বন্যার বাঁধ সুযোগ সুবিধামতই কিন্তু ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়! ১৯৪২ সালে যখন ক্রিপস্-মিশন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে দৌত্য করবার জন্য ভারতবর্ষে আসে তখন কাশ্মীরের মহারাজা স্যার হরি সিং হঠাৎ দেশভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তখন বলেছিলেন যে রাজন্যবর্গের পক্ষে আজ দেশ-প্রীতি দেখানো তাদের কর্ত্তব্য; এবং তাদের রাজ্যের অধিবাসীদের যে তারা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মত সম-মর্য্যাদা সম্পন্ন দেখতে চায় তা-ও বলা তাদের পক্ষে আজ প্রয়োজন। কিন্তু ক্রিপস্-মিশন যখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো তখন কিন্তু এই রাজন্যবর্গের আর সেই দেশপ্রেমের বন্যা দেখা যায়নি।

কাশ্মীরের মহারাজার এই কথা সেখ সাহেব কথার মূল্যেই ব্যবহার করলেন। এবং জনসাধারণের কাছে তিনি এই কথাই ব্যক্ত করতে লাগলেন যে মহারাজা যদি সত্যিই তাঁর কথা রক্ষা করতে চান তবে তাঁর পক্ষে জাতীয় সম্মেলনের মূল দাবী (National Demand) মেনে নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। মহারাজা কিন্তু জনমতকে আরও কিছুকালের জন্য বিভ্রান্ত করবার জন্য ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই তারিখে এক অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত ক'রে ঘোষণা জারি করলেন; এবং এই কমিশনের ওপর ষ্টেটের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত ২৮ দফায় বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়ে মহারাজা নিজের নামে এক আদেশ জারি করেন। এই কমিশনে ১৮জন সদস্যের

মধ্যে মাত্র দুইজন জাতীয় সম্মেলনের সদস্য। আর বাকি সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়েমী স্বার্থবাদী জায়গীরদারের দল ও পেন্সনভোগী ঘুঘু রাজকর্ম্মচারী। কমিশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত না হয়ে মহারাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হলেন। তিনি হলেন কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি। সহ-সভাপতিও হলেন মহারাজার পেটোয়া এক মেজর জেনারেল।

সেখ সাহেব তাঁর সহকর্মীদের ১৮—১৯শে আগষ্ট (১৯৪৩) এক সভায় আহ্বান করলেন, এবং পরে জাতীয় সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটীরও সভায় এ-বিষয়ে আলোচনা করলেন। তদানিন্তন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার * মহাশয় সম্মেলনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শাসনকার্য্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য কমিশনের সদস্যদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। মহারাজার উপরোক্ত বাগাড়ম্বর এবং প্রধান মন্ত্রীর এরূপ আশ্বাসকে যাচাই করবার জন্য এবং সহযোগীতার মধ্য দিয়ে যদি সত্যই শাসন যন্ত্রের সংস্কার সাধন করা যায়, সে বিষয়েও পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় সম্মেলন তাদের দু'জন সদস্যকে (গোলাম মহুম্মদ সাদিখ ও মির্জ্জা আফজল বেগ) কমিশনের সঙ্গে কাজ করতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন কমিশনের কাজ সুরু হোলো তখন দেখা গেল যে গভর্ণমেণ্ট কমিশনের ওপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করছেন না। প্রথমতঃ কমিশনের জন্য কোন নিদিষ্ট স্থানের বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করবার জন্য কোন ব্যবস্থাই সরকার করলেন না। তা' ছাড়া কমিশনের নিকট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সমস্ত মেমোরাণ্ডাম বা স্মারকলিপি দাখিল করা হয়, সেগুলিকে যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদির বিচার

* বর্ত্তমানে ভারত ডমিনিয়নের অন্যতম মন্ত্রী

করবার জন্য সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সময় চাইলে তাও প্রত্যাখ্যান করা হয়। সর্ব্বোপরি সরকার জানান যে কমিশন সৈন্য-বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনাই করতে পারবে না। ইত্যাদি। কমিশনে—জাতীয় সম্মেলনের সদস্যদ্বয়—এ-সমস্ত সরকারী বাধার কথা, জাতীয় সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটী ও সভাপতি সেখ মহম্মদ আবদুল্লার নিকট জানালেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীরে নূতন প্রধান মন্ত্রী আসলেন। তিনি হ'লেন ভারত সরকারের ঝুনো আই, সি, এস্ স্যার বি, এন্, রাও (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪)। * তিনি এসেই ঘোষণা করলেন যে তিনি কাশ্মীরে একটী "আদর্শ রাজ্য" (Model State) তৈরী করতে চান। কিন্তু কমিশনের কাজের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তা'তে তাদের আর কোন সন্দেহ রইল না যে এ-সব আশ্বাস বাক্য ফাঁকা ও মূল্যহীন। এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই এসব বাক্যজাল বিস্তার করা হচ্ছে।

সেখ সাহেব এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করবার জন্য ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৪) জাতীয় সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটীর এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করলেন। সভায় মহম্মদ সাদিখ এবং মহম্মদ বেগও উপস্থিত থেকে তাদের কমিশনের কার্য্য সংক্রান্ত সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেন। তাদের সমস্ত বক্তব্য শুনে কমিটী প্রতিনিধি দু'জনকে কমিশন থেকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। কমিটী আরও সাব্যস্ত করেন যে কমিশনের কাছে পেশ করবার জন্য যে স্মারক পত্র (মেমোরেণ্ডাম) জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুত করেছিল তা' কমিশনের কাছে দাখিল না করে সরাসরি মহারাজার নিকটই সম্মেলনের, কাশ্মীরের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র সুচিন্তিত মতামত হিসাবে, পেশ করা হবে। এই-

* ইনি বর্ত্তমানে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্র-দূত।

ভাবেই সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার নীতি, সরকারের অদূরদর্শিতার ফলেই ব্যর্থ হলো।

কাশ্মীর সরকারের জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে অসহযোগের প্রমাণ, এই সময়ে আরও পাওয়া গেল। এই বৎসর কাশ্মীর সরকার মন্ত্রী-সভায় জাতীয় সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায়, জাতীয় সম্মেলন সহযোগীতার নীতি অনুযায়ী মহম্মদ বেগকে মন্ত্রী সভায় সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। কিন্তু মহম্মদ বেগ কিছুদিন (১৮ মাস) কাজ করবার পরই দেখতে পেলেন যে সরকার তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে রাজি নন বরং তাঁর কাজে নানা উপায়ে বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। তখন তিনি সম্মেলনের অনুমতি অনুসারে এই সরকারী নীতির প্রতিবাদে (মার্চ্চ, ১৯৪৬) পদত্যাগ করেন। কাশ্মীর সরকারের ফাঁকা সহযোগীতার মুখোস এমনিভাবেই খুলে যায়।

নয়া কাশ্মীর

সম্মেলনের মূল বক্তব্য বা স্মারক পত্র যা' মহারাজার নিকট সরাসরি পেশ করা হবে তাকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দেবার জন্য সভাপতি সেখ আবদুল্লার ওপর সম্মেলন ভার দেয়। সেখ সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরের যে চিত্র তাদের কল্পনায় এতদিন ছিল, তাকে পরিপূর্ণভাবে এবার তাঁরা ভাষায় রূপায়িত করলেন।

শতাব্দীর অপমান মাথায় করে যে কাশ্মীর রাজা-মহারাজার গোলাম বলে পরিচিত হয়েছিল—তার মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করলেন সেখ আবদুল্লা এই স্মারকলিপির মধ্য দিয়ে। এই স্মারক লিপিই "নিউ কাশ্মীর" বা "নয়া কাশ্মীর" বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এবং এই পরিকল্পনাকেই কাশ্মীরের মুক্তির সনদ বলে অভিহিত করা হয়। আজ "নয়া কাশ্মীর"—এই দুটী কথার পেছনে রয়েছে দেশপ্রেমিক মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ কাশ্মীর-

বাসীর সামন্তরাজের বন্ধন হতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু-পণ প্রতিজ্ঞা।

"নয়া কাশ্মীর" শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে বলা হয়েছে : "আমরা—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য নামে পরিচিত জম্মু, কাশ্মীর, লাদাক এবং সীমান্ত অঞ্চলে পুঞ্চ ও চিনানির অধিবাসিগণ—সকল রকম অসাম্য দূর করে আমাদের রাজ্যকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্য করে তুলবার জন্য আমাদের নিজদিগকে ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে চিরকালের নিমিত্ত নির্য্যাতন ও দারিদ্র্য, অধঃপতন ও কুসংস্কার, মধ্যযুগীয় অন্ধকার ও অজ্ঞতা হ'তে মুক্ত করে, স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও শ্রমের সাহায্যে প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধির অধিকারী করে প্রাচ্যের জনগণের ও বিশ্বের শ্রমিকদের ঐতিহাসিক জাগরণে অংশ গ্রহণের জন্য এবং আমাদের দেশকে একটী উজ্জ্বল রত্নে পরিণত করবার জন্য আমাদের রাজ্যে এই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করছি।"

শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারায় জনগণের বিবেকের ও ধর্ম্ম উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকার করে লওয়া হয়েছে। ধর্ম্ম, বা সম্প্রদায়গত সমস্ত পক্ষপাতিত্ব দূর করে, ধর্ম্ম বিদ্বেষ প্রচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ স্বয়ং শাসিত রাজ্যে জনগণের বক্তৃতা, সংবাদ পত্র ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে এবং যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে এক আইন সভা ও এক দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক রাজ্যে মাইনরিটীর জন্য আসন সংরক্ষণ করে তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে; এবং এক পরিকল্পিত—অর্থনীতি এবং নাগরিকদের কাজ, বিশ্রাম, নিরাপত্তা, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে কাশ্মীরকে একটী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য এক সুপরিকল্পিত (Planned) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব, এই পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলেছেন "কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি হতেই প্রকৃত স্বাধীনতার জন্ম হতে পারে। ...অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত অর্থনীতিকেই আমরা প্রগতির মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছি। সুপরিকল্পিত অর্থনীতি ছাড়া রাজ্যের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দ্বিতীয় উপায় নাই।"

এই আদের্শকে সম্মুখে রেখে কাশ্মীর রাজ্যকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলবার জন্য রাজ্যের উৎপাদন, বণ্টন অত্যাবশকীয় কার্য্যাদি (যথা জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ নির্ম্মাণ, সমাজ-বীমা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ইত্যাদি), স্ত্রী জাতির মর্য্যাদা এবং রাজ্যের মুদ্রা ও অর্থনীতি সমস্ত বিষয়গুলিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং মূলভিত্তিরূপে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, লঙল যার জমি তার, বড় বড় পুঁজিপতিদিগকে উচ্ছেদ, সমস্ত মূল শিল্পে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন বা জাতীয় করণের স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং কৃষককে ঋণভার থেকে মুক্তি দেবার জন্য বিশেষ ধারা পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। মোট কথা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পূণর্গঠনের নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এত সব পরিকল্পনা সত্ত্বেও কিন্তু শাসনতন্ত্রে মহারাজাকেই রাজ্যের সার্ব্বভৌম শাসন কর্ত্তারূপে স্বীকার করা হয়েছে। এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁর বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ নিজেদের আপোষকামী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। জনসাধারণ কিন্তু একে সামন্ত প্রথার হাত থেকে পূর্ণ মুক্তির সনদরূপেই গ্রহণ করেছে।

১৯৪৪ সাল কাশ্মীরের ইতিহাসে আরও একটী কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। কাশ্মীরে জাতীয় সম্মেলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মিঃ জিন্নার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি এই সময় কাশ্মীরে এসে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের অজুহাতে যথারীতি মহারাজার অতিথি হলেন। জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তাঁকে এক সাধারণ সভায় অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে সেখ সাহেব বলেন যে, "কাশ্মীরী জাতি তাঁর মতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যেহেতু তিনি ভারতের একজন বিশিষ্ট নেতা সেইজন্য কাশ্মীরীদের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি যে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমানের কথা চিন্তা করে তিনি যেন ঐক্যের চেষ্টা করেন।" মিঃ জিন্না উত্তরে বলেন—"সকল ধর্ম্মের জনতার মিলন এই অভ্যর্থনা সভায় দেখে আমি খুবই সুখী হয়েছি।"

ঠিক এক ঘণ্টা পরে অপর একটী সাম্প্রদায়িক সভায় তিনি ঘোষণা করেন—"মুসলমানের এক খোদা, এক কলমা এবং এক কার্য্যস্থল। কাশ্মীরের সমস্ত মুসলমান যেন একমাত্র মুসলিম কনফারেন্সেই যোগ দেয়।" সেখ সাহেব এই বক্তৃতার কথা শুনে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"আমার দীর্ঘ ১৩ বৎসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে কাশ্মীরের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান একমাত্র হিন্দু-মুসলিম-শিখের মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আসতে পারে।"

কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁর ভেদ নীতি ও ধর্ম্মের উন্মাদনা দ্বারা কাশ্মীরের রাজনীতিকেও কলুষিত করবার জন্য কয়েক দিন পরেই সভাপতিত্ব করেন মৃতপ্রায় অপর একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভায়। এই সভাটী হয়েছিল বারমূলা সহরে। এখানে মিঃ জিন্না সেখ আবদুল্লা এবং জাতীয় সম্মেলনকে কুৎসিৎ ভাষায় হীনভাবে আক্রমণ করেন। মিঃ জিন্না কাশ্মীরের সংগ্রামী জনতার ভদ্রতাকে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার

সমর্থন বলে ভেবেই এই দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু "নয়া কাশ্মীরে"র জনতা তাদের প্রিয় নেতা ও সম্মেলনের এই অপমানকে সহ্য করতে রাজি হলো না। বরমুলার সেই সভায়ই মিঃ জিন্নার বক্তৃতার প্রতিবাদ এত প্রবল আকার ধারণ করে যে মিঃ জিন্নাকে তাঁর বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই সভা থেকে পুলিসের সাহায্যে সরে পড়তে হয়। সেদিন এই বিক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব করেছিলেন বরমুলার শহীদ মকবুল শেরোয়ানী। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস যে মকবুল শেরোয়ানী এই বারমুলাতেই ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানী ও পাঠান হানাদারদের হাতে বর্ব্বরভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, কিন্তু তথাপি হানাদারদের পাশবিক অত্যাচারে মুখেও স্বীকার করতে রাজি হন নি যে,—কাশ্মীর এই হানাদারদের নিকট পরাজয় স্বীকার করবে, সেখ আবদুল্লার ও জাতীয় সম্মেলনের পরাজয় হবে। শহীদ শেরোয়ানীর তাজা রক্তে বরমুলার পথ রঞ্জিত হ'লো কিন্তু তথাপি শেরোয়ানীর শেষ নিঃশ্বাসের সাথে শুধু একই কথা উচ্চারিত হয়েছে— "সেখ আবদুল্লা জিন্দাবাদ, ন্যাশনাল কনফারেন্স জিন্দাবাদ।"

১৯৪৪ সাল কাশ্মীরের ইতিহাসে সত্যিই চির স্মরণীয়, কারণ জঙ্গী কাশ্মীরের পদধ্বনি এই বৎসরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জঙ্গী কাশ্মীরের জনতার প্রতিধ্বনি হিসাবেই যেন মকবুল শেরোয়ানী মিঃ জিন্নার সভায় বিদ্রোহের কণ্ঠে স্পষ্টভাবেই বলেছিল যে তারা কি সামন্ত রাজের অত্যাচার, কি সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা প্রচার, কোন কিছুকেই বরদাস্ত করবে না।

মিঃ জিন্নার এই ব্যবহারে শেখ সাহেব খুবই ক্ষুব্ধ হন। এবং মিঃ জিন্না যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখানেও ছড়াতে চান তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীরে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তাতে দরিদ্র প্রজা মাত্রেরই পূর্ণ সম্মতি ও সহানুভূতি

রয়েছে। এবং তারা মিঃ জিন্নার ক্ষুদ্র পরিসরের রাজনীতিকে ছাড়িয়ে কাশ্মীরে নূতন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য এগিয়ে চলেছে। কাজেই কাশ্মীরবাসীর নিকট বা তাদের নেতা শেখ আবদুল্লার নিকট মিঃ জিন্নার বক্তৃতা পুরানো ও প্রতিক্রিয়াপন্থী। মিঃ জিন্নার এই সাম্প্রদায়িক বিষ-পূর্ণ বাগাড়ম্বরের উত্তর দিতে গিয়ে শেখ সাহেব এই ঘটনার কয়েক দিন পর একটি সভায় বলেছিলেন ঃ—

"লক্ষ লক্ষ মিঃ জিন্না কাশ্মীরে আসলেও কাশ্মীরের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবে না বা তার কোন পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হবেন না। আমি চাই যে কাশ্মীরের রাজনীতিতে বাইরের কোন কেউ যেন হস্তক্ষেপ না করেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার তা অভিপ্রেত নয়। তিনি বৃটিশ ভারতে যে রাজনীতি চালাচ্ছেন এখানেও তিনি তা চালু করতে চান।"

রাজ্যের মধ্যে যে সামান্য সংখ্যক সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল এই বিষ ছড়ানোর উদ্যোগ গোপনে করছিলেন, সেই মুসলিম কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন— "আমি মুসলিম কনফারেন্সের নেতাকে বলেছিলাম যে তিনি যদি মিল্লাতের আধিকাংশের মত মেনে চলতে রাজী থাকেন অথবা কাশ্মীরের মুসলিম জনতার মতামত গ্রহণের জন্য ভোট গ্রহণে রাজী থাকেন; এবং তার ফলাফল মেনে চলতে স্বীকার করেন তবে তিনি এগিয়ে আসুন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে অমত করেন।"—(মডার্ন রিভিয়ু; জুলাই, ১৯৪৪)

জনগণের প্রতি এই বিশ্বাসের বলেই শেখ সাহেব জিন্নাকে তখন পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

—::০::—

আট

নূতন দিনের পদধ্বনি

১৯৪৫ সাল—পৃথিবীর ইতিহাসে* একটা অবিস্মরণীয় বৎসর। কারণ সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কারী ফ্যাসিষ্ট শক্তি সমূহের চূড়ান্ত পরাজয় এই বৎসরেই আরম্ভ হয় ইতালি ও জার্মানীর ফ্যাসিষ্ট দলের আত্মসমর্পণের দ্বারা এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে। এই বৎসরেই এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে জেগে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী জনতা। চীন, ইন্দোনেশিয়া বর্মা, ইন্দোচায়না, ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এমন কি খাস ইংলণ্ডেও জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বের ও শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এই সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক নূতন পৃথিবীর আগমনী স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যে চার্চ্চিল তারস্বরে চীৎকার করে বলেছিল—" shall never be the first Prime Minister to preside over the liquidation of British Empire"—তাকে বিতাড়িত হ'তে হয় ইংলণ্ডের নেতৃত্ব থেকে, নূতন নির্ব্বাচনের ফলে। যুদ্ধান্তের পৃথিবীর সীমান্ত রেখা রঙ্গীন হ'য়ে ওঠে নূতন গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

এই পটভূমিকায় ১৯৪৫ সালের ভারতবর্ষ কী রূপ নিয়ে আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে? একদিকে ব্রিটীশ শক্তি ও ইংরেজ-পদলেহী

বিশ্বাসঘাতকের দল যারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলে লাট কাউন্সিলে বসে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধের সময় অত্যাচারের বন্যায় ভারতবর্ষকে ডুবিয়ে দিয়েছে, যারা ভারতবর্ষের ১৬০০শত কোটী টাকা মূল্যের পণ্য ইংরেজকে বিনামূল্যে দিয়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে শত সহস্র ভারতবাসীকে দুর্ভিক্ষে না খাইয়ে মেরেছে, যারা ভারতবর্ষের নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর পুলিশ ও মিলিটারীর জুলুম নীরবে দেখে তারিফ করেছে নির্লজ্জের মত, যারা মেদিনীপুরে, চট্টগ্রামে, অস্থি-চিমুরে মাতৃ-জাতির ওপর পুলিশ ও সৈন্যদলের চরম অপমান নির্ব্বিবাদে ঘটতে দিয়েছে—যারা কাইয়ূরের বীর শহীদদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছেড়েছে, যারা বাংলায় ৫০লক্ষ নর-নারীর মৃত্যুর সময় ইংরেজের দেওয়া লাট কাউন্সিলে বসে হাজার হাজার টাকা মাইনে গুনেছে,—তারা-ই ভারতবর্ষের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত জাঁদরেল ইংরেজ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে তখনো চেপে বসে আছে। আর অন্যদিকে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর-নারীর জীবনে নেমে এলো অভাব অনটনের মৃত্যু বিভীষিকা। কিন্তু তা' সত্বেও তাদের কার্য্যের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বিভিন্নভাবে তারা প্রকাশ করলো। এবং তারই চরম আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় ক্রমে বোম্বাইয়ের গৌরবান্বিত নৌ-বিদ্রোহে, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোরে বিমান-বাহিনীর ধর্ম্মঘটে, কলকাতার আজাদ-হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ জনতার মৃত্যুহীন অভিযানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জনতার এই ঐক্যের পটভূমিকায় আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের কি চরম অনৈক্যই না প্রকাশ পায় এই বৎসর যা' শেষ পর্য্যন্ত জনতার এই বিপ্লবী ঐক্যকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় পর্য্যবসিত হয়ে ইংরেজের উদ্দেশ্যকেই সফল করে তোলে।

চতুর ব্রিটিশ শক্তি যখন বুঝতে পারলো যে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে যে বিপ্লবী শক্তির অভ্যুত্থান হবে তাকে অত্যাচারের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হবে না তখন তারা নূতন পথে, নূতন চালে চলতে আরম্ভ করল। যে ইংরেজ শক্তি ১৯৪২ সালে ক্রিপস্-দৌত্যের ব্যর্থতার পর ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই—তারাই স্বেচ্ছায় ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে লর্ড ওয়াভেলের মারফৎ নূতন প্রস্তাব পাঠালেন যা শেষ পর্য্যন্ত "সিমলা প্রহসনে" পরিণত হ'য়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের অনৈক্যকে জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত ক'রে জনতার ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করলো। সিমলা কনফারেন্সে ব্রিটীশ শক্তির নিকট আমাদের কংগ্রেস ও লীগ নেতারা কোন ঐক্যবদ্ধ দাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন না। পরস্পর পরস্পারের বিরুদ্ধে পাল্টা দাবী নিয়ে ব্রিটীশ ভাইস্‌রয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রিটিশ ভাইস্‌রয়ও (লর্ড ওয়াভেল) এই অনৈক্যের পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে সম্মেলনকে তাঁর সুযোগমত ব্যর্থ বলে ঘোষণা করলেন এবং ভণ্ডামির মুখোস পড়ে ঘোষণা করলেন—"সিমলা কনফারেন্সের ব্যর্থতার দায়িত্ব আমরাই।" এই অনৈক্যে সুযোগ নিয়ে ভারত সরকার সানফ্রান্সিস্‌কো কনফারেন্সেও পাঠালেন তাদের দুটী তাঁবেদার [স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ও রামস্বামী মুদালিয়র]। কিন্তু কনফারেন্সে দাড়িয়ে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ মলোটোভ প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ক'রে ঘোষণা করলেন—"এখানে আমাদের সম্মুখে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি খাড়া করা হয়েছে। ভারতবর্ষ আজও স্বাধীন নয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে স্বাধীন ভারতের কণ্ঠ শোনা যাবে এমন দিন সমাগত।" আর সমস্ত পরাধীন জাতির পক্ষ নিয়ে ঘোষণা করলেন—"আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে হলে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য যত সত্বর পরাধীন জাতি সমূহ

স্বাধীনতা লাভ করে।”

মহাযুদ্ধ পুরানো দিনের কত না সংস্কার, নীতি ও পথকে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন দিনের আলো এনে দিল মানুষের সভ্যতার দুয়ারে কিন্তু আমাদের নেতারা তাঁদের সেই পুরানো নীতি থেকে কিছুতেই নিজদের মুক্ত ক’রে নিয়ে জনসাধারণকে কোন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। পৃথিবী যেখানে এগিয়ে চলল আমরা পরে রইলুম পেছনের টানে! সেই পুরানো বাদানুবাদের রাজ্যে, আর সুযোগ করে দিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আমাদের ওপর নেতৃত্ব করবার! যার ফল শেষ পর্য্যন্ত হলো মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ।

পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় শেখ আবদুল্লা কিন্তু নূতন দাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের কাছে। ১৯৪৫ সালের মে দিবসের এক বিরাট শ্রমিক সভায় সভাপতিত্ব করবার সময় তিনি বলেনঃ—“ভারতের দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ, যাদের দ্বিগুণ পরাধীনতার হাত হ’তে মুক্তি বৃহত্তর ভারতের মুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তারা জাতীয় নেতা ও জনসাধারনের নিকট আবেদন প্রসঙ্গে বলতে চায় যে, আমাদের নেতৃবর্গ বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হোন এবং ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের এমন চিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করুন যেখানে প্রত্যেকটী জাতি ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনতা বুঝতে পারে সে তাদের স্বার্থ ও অধিকার এই রাষ্ট্রে অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেই পথেই সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারনের ভয় ও ভীতি দূর হ’তে পারে এবং সাম্রাজ্যবাদকে বিদূরীত করা যেতে পারে। কাশ্মীরের ভাগ্য নির্দ্ধারন আমরা কাশ্মীরী জনসাধারনই করবো।”

পেশোয়ারে এপ্রিল মাসের ২১-২৩ তারিখ পর্য্যন্ত যে রাজনৈতিক

সম্মেলন হয় তাতে শেখ সাহেব যোগদান করেন। এবং তিনি জাতীয়তা-বাদী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন যে তাঁদের আজ আত্ম সমালোচনা করা উচিত যে কেন তাদের দলে নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ও বিদ্বান নেতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে চলে যাচ্ছে। তিনি ঘোষণা করেন যে মিঃ জিন্নার পাকিস্তান পরিকল্পনায় তিনি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর পক্ষে। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক ও ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। তিনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান কর্ম্মী ও নেতাদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা এই পথে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের পথ দেখুন

এই বৎসর আগষ্ট মাসে সোপ্‌রে নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সেখ সাহেব এবারকার সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান করতে আসেন কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্ত-গান্ধী আব্দুল গফুর খাঁন ও বেলুচিস্থানের জাতীয়বাদী নেতা আবদুল সামাদ খাঁন। সম্মেলনের প্রারম্ভে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ পাঞ্জাব সরকার সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁকে কাশ্মীর যাবার পথে আট্টোকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করে বসে। অবশ্য পরে বিক্ষুব্ধ জনমতের চাপে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম কনফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষ নিখিল জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের জনপ্রিয়তাকে সহ্য করতে না পেরে ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে ১লা আগষ্ট সম্মেলনের কর্মীদের ও উদ্যোক্তাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে। এবং হাঙ্গামার ফলে একজন সম্মেলনের কর্ম্মী মারাও যান। শুধু তাই নয় যখন সীমান্ত গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রভৃতিকে নিয়ে নৌকাযোগে

শ্রীনগরের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা যের করা হয় তখন শোভাযাত্রার ওপর ইট পাথর ছুড়ে গুণ্ডারা আক্রমণ চালিয়ে আমন্ত্রিত নেতাদের অপমান করে। এই প্রসঙ্গে সেইদিন কাশ্মীরের পুলিশের আচরণও অনেকটা সন্দেহ জনক। কারণ আক্রমণকারীদের মধ্যেই পুলিশকে দেখা যায় এবং তাদের সামনেই গুণ্ডার দল নির্ব্বিবাদে আক্রমণ চালিয়ে সরে পরে। এই অভিযোগ সীমান্ত গান্ধী নিজেই করেছেন। *

পুলিশের উপরোক্ত আচরণ থেকে মনে হয়, তাদের এই কাজ শাসন চক্রের পরিকল্পনা প্রসুত। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তখন কুখ্যাত রামচন্দ্র কাক। তাঁর জাতীয় সম্মেলনের প্রতি বিদ্বেষ আজ আর কাহারো অবিদিত নেই। জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে মুসলিম কনফারেন্সের গণ্ডগোল তার অভিপ্রেতই। বরং "ন্যাশনাল কনফারেন্স" জনপ্রিয়, ও জনতার দাবী নিয়ে লড়াই করে বলে এই কাশ্মিরী হিন্দু মন্ত্রী মিঃ জিন্নার অনুগত সাম্প্রদায়িকতাবাদী "মুসলিম কনফারেন্সকে" নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক বুঝেছিলেন, আর তাই এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পুলিশের সাহায্যে এই স্বাধীনতাকামী নেতাদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছিলেন। ডোগ্‌রা রাজ ও তার মন্ত্রীদের এই "মুসলিম কনফারেন্স" ও জিন্নাহ-নীতির সহিত বন্ধুত্ব নূতন নয়। এই সময় থেকে তাঁদের লক্ষ্য ছিল—কাশ্মীরের রাজনৈতিক আন্দোলন আত্মকলহের চোরাবালিতে আটকে আপনি যাতে মরে, আর তাতে কাশ্মীরের স্বৈরতন্ত্রের প্রধান শত্রু গণ-আন্দোলন যাতে বিনষ্ট হয়।

এই সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনতার উৎসাহ, উদ্দীপনাকে ব্যর্থ করতে পারলো না। মুসলিম কনফারেন্সের নেতাদের মনোবৃত্তি যখন এত হীন ভাবে কলুষিত, তখন সেখ আবদুল্লার

* অমৃত বাজার পত্রিকার রিপোর্ট—৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫

মনে যে চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা বড় তা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধান্তের পৃথিবীতে যখন দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের দল তাদের মুক্তির জন্য জেগে উঠেছে, তখনো ভারতবর্ষের দুটী প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের নিজেদের মধ্যে কোন মীমাংসায় আসতে পারলো না। এবং তার ফলে ভারতের স্বাধীনতা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সুবিধা হচ্ছে। সেখ সাহেব তাঁর সভাপতির অভিভাষণে কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন করে বলেন যে ভারতের চল্লিশ কোটী নর-নারীর মঙ্গল ও মুক্তির কথা স্মরণ করে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মত-বিভেদকে মিটিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার দাবী করুন। কারণ এই ঐক্য অচল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের ওপর চরম আঘাত হানবার শক্তি দেবে। তিনি পাকিস্থান দাবীকে অযৌক্তিক বলেন কিন্তু কংগ্রেসকেও অনুরোধ করেন যে, ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে তাদের আজ ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বর্ণের জনসাধারণের মন হ'তে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ভয় ও ভীতির ভাব যাতে দূর হয় তা করা দরকার। তিনি কংগ্রেসকে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে আবেদন জানান। *

---

* "We have to suggest to the Indian National Congress that the time has come for promoting a positive approach and declaring the principle of self-determination of nationalities as an intrinsic part of the Congress and its programme. That would constitute the most concrete guarantee from the Congress to all the peoples of India, who would thus look towards Independence as true freedom, without the fear of dominations by the majority. Such a declaration alone can be a real bridge between Hiudus and Muslims." (Presidential address by Shiekh Abdullah at Sopore Couference.)

বলা বাহুল্য এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বীর যোদ্ধার নিবেদন কেউ সার্থক করতে অগ্রসর হল না—না কংগ্রেস না লীগ।

জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে "নয়া কাশ্মীরে"র ভিত্তিতে কাশ্মীরের পুনর্গঠনের এবং সরকারী হস্তক্ষেপের বাইরে স্বাধীনভাবে নূতন নির্ব্বাচনের দাবী ব্যতীত যে প্রস্তাব সম্মেলনে সর্ব্বাপেক্ষা আলোচনার সৃষ্টি করেছিল তা হ'চ্ছে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব, যা'তে ভারতবর্ষের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে স্বীকার করা হয়েছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বের পক্ষে এটা কৃতিত্বের কথা বটে।

জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের আলোচনা এবং সেখ সাহেবের আবেদন, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সেখ সাহেব মৌলানা আজাদকে আবেদন প্রসঙ্গে তাঁর অভিভাষণে জিজ্ঞাসা করেন যে কংগ্রেসের বিপুল ত্যাগ ও গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কেন আজ মুসলমানগণ মাত্র আংশিক পরিমানে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন? মৌলানা সাহেব এই আবেদনে এত মুগ্ধ হন যে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে ভারতের বর্ত্তমান এই সঙ্কটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য যাতে বর্ত্তমানের রাজনৈতিক মত-বিরোধের অবসান হয় এবং পূর্ণ জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে।

ইহার কিছুদিন পর তিনি যে প্ল্যান ঘোষণা করেন তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে মেনে নেন। মৌলানা আজাদ আরও বলেন যে—"The Congress is convinced that the free Indian State can only be based on the willing co-operation of its federating units and its principal communities

and cannot be founded on compulsion......the federating units should have the largest conceivable amount of freedom to function as they will, subject only to certain essential bonds for their common welfare."

মৌলানা আজাদের এই ঘোষণা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে খুবই আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিশেষ ক'রে মুসলিম মহলে। মৌলানা আজাদের এই ঘোষণার কি প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের ওপর হয় তা তারা লক্ষ্য করতে থাকে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভা ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) পুণাতে বসে এবং তাতে স্থির হয় যে কংগ্রেস ভারতীয় ইউনিয়নের কোন অংশের, ইউনিয়ন থেকে বাইরে থাকবার অধিকার মেনে নিতে রাজি নয়। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে নূতন আপোষের সূত্র পাওয়া গিয়েছিল, ওয়ার্কিং কমিটীর উক্ত প্রস্তাবে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক গগনে কংগ্রেস-লীগের বিরোধের মেঘ আবার ঘনায়িত হতে থাকে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই বিরোধকে আরও গভীর করবার জন্য কেন্দ্রে নূতন নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করেন, এবং লর্ড ওয়েভেল আবার বিলাতে চলে যান সলা পরামর্শ করবার জন্য।

যখন ইন্দোনেশীয়া, ইন্দোচায়না, ব্রহ্মদেশ, সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পর্য্যুদস্ত করে তুলছিল, ভারতবর্ষে তখন এই নূতন নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ করে জমে ওঠে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আবার মাতব্বরি করবার সুযোগ পায়!

কিন্তু ভারতের জনতার কাছে পৌছে গেছে নূতন দিনের বিপ্লবী আহ্বান। তারা যুদ্ধাবসানের মধ্যে দিয়ে পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের চরম মুহূর্তের ইংগিত। তাই তারা জানিয়ে দিল দেশব্যাপী ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে

শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা। তারা লক্ষ্ণৌ, লাহোর ও কলকাতার পথে পথে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চালালো মৃত্যুহীন অভিযান। ত্রিবাঙ্কুরে ভারতে ব্রিটিশের "পঞ্চম বাহিনী" স্বৈরতন্ত্রের শতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষমাহীন ক্রোধ প্রজা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রূপ নিল; হিংসা-অহিংসার চুল চেঁড়া বিচারকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে সংগ্রামী ভারতের আপোষহীন ক্রোধ ফেটে পড়ল বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে; যেন ভারতের অগণিত জনতা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল "ব্রিটিশ আপোষ নয় এই মুহূর্ত্তেই ভারত ছাড়।" ভারতে ব্রিটিশ শক্তি তার উত্তর দিল—কলকাতা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই-এর রাস্তায় নিরস্ত্র জনতার ওপর বর্ব্বর হিংস্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে। নেতারা বললেন ছাত্রবৃন্দ হটকারী, বিদ্রোহী জনতাকে তাঁরা কেউ কেউ "গুণ্ডা" বলে আখ্যা দিলেন; আর দিল্লীর নূতন আমন্ত্রণের আশায়, বিক্ষুব্ধ জনতাকে শুধু আশ্বাস দিয়ে তাদের অগ্নিময়ী রূপকে শান্ত করতে চেষ্টার ত্রুটী করলেন না।

যুদ্ধোত্তর ভারতের বিপ্লবী জনতার আহ্বান নেতাদের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে—রক্তের অক্ষরে বিপ্লবের স্বাক্ষর রেখে গেল। নেতাদের মধ্যে যখন মত-বিভেদ, অনৈক্য, চরম পরমুখাপেক্ষীতা, জনতার মধ্যে তখন সংগ্রামী ঐক্য যার পরিচয় তারা দিয়েছে যুদ্ধোত্তর ভারতে ধর্ম্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনের অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের ভেতর দিয়ে এবং নৌ-বিদ্রোহের সময় ব্রিটীশকে মুখোমুখী যুদ্ধে আহ্বান ক'রে। তাদের রক্তে ভারতের রাজপথের ধূসর ধূলি লাল হয়ে গেল কিন্তু নেতাদের কাছে তবুও সংগ্রামী জনতার আহ্বান প্রত্যুত্তর পেলনা।

—::*::—

নয়

" ডোগরা রাজ কাশ্মীর ছাড়ো "

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট বৃটিশরাজ ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বালালো তা যদিও তখনই ইংরেজকে ভস্মীভূত করতে পারলো না, কিন্তু তাতে বোঝা গেল ভারতবর্ষের জনতা রাজনীতিক্ষেত্রে বিদ্রোহীরূপে অগ্রসর হতে চলেছে—দেশী নেতারা তাদের বাগ্ মানিয়ে না রাখ্লে বিপ্লব অতঃপর অনিবার্য্য। যুদ্ধের অত্যাচারে এ আগুন জ্বল্তেই থাকে। তারপর যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন যে বিপ্লবের ঝড় সমস্ত এশিয়া ও ইউরোপের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তা সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে দাবাগ্নীর রূপ দেয়। যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের ভারতবর্ষ যেন দুই শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানিকে এক বিরাট অগ্নুৎপাতের মধ্য দিয়ে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল। এই অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষের সম্মুখে সুচতুর বৃটিশ "রাজ—" "কৃতিত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ" ক'রে আপোষের পথ নেয়। এই গৌরব ভারতবর্ষের জনসাধারণের গৌরব। কিন্তু ভারতবর্ষের অগৌরবের কথা এই যে আমাদের দুটী প্রধান রাজনৈতিক দলের অনৈক্যের ছিদ্রপথে ইংরেজ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করবার সুযোগ পায় ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধকে এক আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় পরিণত ক'রে জনতার বিপ্লবী ঐক্যকে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। এটা আমাদের নেতাদের অগৌরবের কথা।

১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে "ক্যাবিনেট মিশন" এসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় (২৩ মার্চ্চ—১৯৪৬) এবং প্রায় ২।৩ মাস ধরে বিভিন্ন

দলের নেতা ও মুখপাত্রদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ভারতের দলগুলির পক্ষ থেকে কোন ঐক্যবদ্ধ দাবী পেশ করা সম্ভব হয় না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দু'টী প্রধান দল পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যান। গোপনে দেশীয় রাজাদের পক্ষ থেকে এক স্মারকপত্র ক্যাবিনেট মিশনের কাছে পেশ করা হয়। * এতে রাজন্যবর্গ দাবী করেন যে, বৃটিশ ভারতের যে পরিবর্তন হবে তাকে তাঁরা স্বীকার করে নেবেন ও নূতন ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁরা বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দাবী করেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে বংশ পরম্পরা রাজতন্ত্র প্রথার কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে না; এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের থাকবে। কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বহির্বিভাগ, যাতায়াত প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে রাজি আছেন। তাঁরা বিশেষ জোরের সঙ্গে দাবী করেন যে, কি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, কি নূতন ভারত গভর্ণমেণ্ট, কেহই দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বিষয়ে কোনরূপ কিছু বলতে পারবে না। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসারে শাসন ব্যবস্থা কী পরিমান পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে তা রাজন্যবর্গ-ই বিবেচনা করবেন। কিন্তু একথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন যে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় বলে তাঁরা মনে করেন না।

সেখ আবদুল্লার দৃষ্টি এই "গোপন দলিলে"র প্রতি আকৃষ্ট হ'লে তিনি বলেন যে "যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই হয়েছে।" সেখ সাহেব খুব সত্বর তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাবিনেট মিশনের নিকট এক

* People's Age, April 14. 1946.

জরুরী টেলিগ্রাম পাঠান। তাতে তিনি বলেন :—"ভারতবর্ষের বুক থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের স্বাধীনতার দাবী দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছে। কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্দ্ধারিত করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প।" তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এর সঙ্গে সঙ্গেই সেখ সাহেব মিশনের কাছে, ১৮৪৬ সালের অমৃতসর সন্ধি ও কাশ্মীরের ওপর ডোগরা রাজ্যের আধিপত্যের, অবসান দাবী করে এক বিস্তৃত স্মারকপত্র দাখিল করেন। তিনি দাবী করলেন "আমরা এই বিক্রয় দলিলের নৈতিক এবং রাজনৈতিক সততার পুনর্বিচার দাবী করছি। কারণ এই চুক্তির মধ্যে কাশ্মীরের জনসাধারণের কোন স্থান ছিল না। বরং ১৮৪৭ সাল থেকে এই চুক্তি তাঁদের দাসত্বের দলিল বলেই পরিচিত হয়ে এসেছে।"

তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবী করেন—"কাশ্মীরের আজ জাতীয় দাবী দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা নয়, আজ তাদের দাবী হলো স্বৈরাচারী ডোগরাজের শাসনের বোঝা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী।"

কিন্তু মন্ত্রী মিশন দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের যে প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন (All IndiaS tates Peoples Conference) তাদের কোন প্রতিনিধিকেও যেমন সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকলেন না, তেমনি সেখ সাহেবের এই টেলিগ্রামেরও কোন উত্তর দিলেন না। পণ্ডিত নেহরু তখন দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের সভাপতি এবং সেখ আবদুল্লা সহঃসভাপতি। পণ্ডিত নেহরু প্রজা-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মন্ত্রী মিশন সাক্ষাতের জন্য না ডাকায় দুঃখ প্রকাশ করলেও তিনি বা কংগ্রেস এর জন্য কোন দাবীই উত্থাপন করেন না।

মন্ত্রী মিশনের এই দু'মুখো নীতি সেখ সাহেবের মনে খুবই সন্দেহের সৃষ্টি করে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, "যদিও মন্ত্রী মিশনের

আগমনে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু এরূপ মিশন সম্পর্কে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সন্দেহ হয় যে বর্ত্তমানে সৌহার্দ্যের যে বন্যা বয়ে চলেছে তার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের ওপর তাদের আধিপত্যকে রক্ষা করবার জন্য, দেশের মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টীর মধ্যে যে গভীর অনৈক্য আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাড়ান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন যে, "সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের যে সম্ভাবনা সম্মুখে দেখা দিয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়াই একমাত্র পথ।" কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এই আবেদনও ব্যর্থ হয়! মিং জিন্নার দুই জাতি-তত্ত্বের বিষাক্ত আবহাওয়ায় ও বৃটিশের গোপন কুপল্যাণ্ড-প্ল্যানের ভারত বিভাগের ফাঁদে, ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের স্বাধীন ও প্রাণবন্ত বিকাশকে কেমনভাবে পদে পদে আটকে দেওয়া হয়েছে বাঙ্গালী জাতি আজ একথা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করেছে; এবং কাশ্মীরও করছে।

সেখ আবদুল্লার টেলিগ্রামের উত্তর ক্যাবিনেট মিশন দেবার কোন প্রয়োজনই মনে করলেন না। এদিকে কাশ্মীরের মহারাজও কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের যে মূল দাবী অর্থাৎ "নয়া কাশ্মীর" পরিকল্পন-মত কাশ্মীরের পুনর্গঠন, তারও কোন উত্তর দুই বৎসরের মধ্যে দিলেন না। এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক "অবাঞ্ছিত যোগাযোগ" হয়েছে। যদিও রাজন্যবর্গ দিল্লীতে নরেন্দ্র মণ্ডলের এক বৈঠকে, ভূপালের নবাবের মারফৎ এক ঘোষণা ক'রে (১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৬) আভ্যন্তরিণ শাসন যন্ত্রের

পরিবর্ত্তনের ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দানের মামুলি আশ্বাস দিলেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যে ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে, এদের রুদ্র মূর্ত্তি। আলোয়ার, যোধপুর, ত্রিবাঙ্কুর, ফরিদকোট, প্রভৃতি রাজ্যে প্রজা-আন্দোলনের কর্ম্মীদের ওপর গুলি ও লাঠি চালনা, বিনা বিচারে বন্দী, বহিষ্কারের আদেশ, মহিলা কর্ম্মীদের লাঞ্ছনা, জাতীয় পতাকার অবমাননা ইত্যাদি নির্ব্বিচারে চলতে থাকে। ফরিদকোটের নির্য্যাতন এত চরমে ওঠে যে, পণ্ডিত নেহরুও বলতে বাধ্য হন যে, "বর্ত্তমানের ঘটনাসমূহ অসহ্য। রাজ্যের গত কয়দিনের ঘটনাসমূহের ও রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে নির্য্যাতন করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত অবশ্যই করা হবে এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।" (ইউনাইটেড প্রেসের নিকট সিমলায় ১০ই মে তারিখের বিবৃতি)। পণ্ডিত নেহরু যখন পণ্ডিত দ্বারকানাথ কাচরুকে (দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের অন্যতম সম্পাদক) ফরিদ কোটে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের জন্য পাঠান তখন রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে রাজ্যে প্রবেশ করতেই দেন না। কর্ত্তৃপক্ষ এমনকি পণ্ডিত নেহরুকেও জানান যে, "তিনি যদি নিজেও ফরিদকোটে যান তবে তাঁর আগমনকে অভ্যর্থনা করা হবে না।" (যুগান্তর ১৩ই মে, ১৯৪৬)

যদিও সিমলায় মিশনের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় পণ্ডিত নেহরু ফরিদকোটে তখনই যেতে পারেন না, কিন্তু তিনি ঘোষণা করেন যে "ফরিদকোট" ও ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটী দেশীয় রাজ্য অধঃপতনের প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে। যদি এই সব রাজ্য তাদের কর্ম্মপদ্ধতির কোন উন্নতি করতে না পারে তবে তাদের ভেঙ্গে পুনর্গঠন করতে হবে; না হয়ত এদের বিলোপ করা হবে।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১২ই মে—৪৮)। পণ্ডিত নেহরু এই বিবৃতি

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত অন্যান্য বিবৃতি থেকে বেশ একটু "চরম পন্থী"। কারণ কি কংগ্রেস, কি, মুসলিম লীগ, এবং তার নেতারা—মিঃ জিন্না, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু কেহই দেশীয় রাজ্যের রাজাদের বিলোপ চান নাই। মুসলিম লীগের কথা বাদই দিলাম। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নীতিই এসম্পর্কে আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি প্রথমে ছিল নিরপেক্ষতা, তারপর রাজ্যের আন্দোলনে অপরোক্ষভাবে উৎসাহ দান; এবং ক্যাবিনেট মিশন আসবার আগে পর্য্যন্ত অপরোক্ষভাবে রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজন্যবর্গের অধীনে লোকায়ত সরকারের দাবীকে সমর্থন করা। এই পর্য্যন্ত এসেই কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্যের নীতি থেমে গেছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমানের অবৈজ্ঞানিকভাবে গঠিত দেশীয় রাজ্যের বিলোপ ও রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ (উদাহরণ স্বরূপ হয়দরাবাদ) চান না। দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের নেতৃত্বও কংগ্রেসের হাতে থাকায় সেখানেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের দাবী গৃহীত হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ ভারতে যে বিরাট মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বয়ে চলে তার ঢেউ দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এসে লাগে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে যদিও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের দায়িত্ব নিতে চাইলেন না কিন্তু আন্দোলনের প্রতি তাঁরা আর উদাসীন থাকতেও পারলেন না। ১৯৩৮ সালে হরিপুরায় যখন সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের তীব্রতা, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদিগকে তাঁদের সম্পূর্ণ "নিরপেক্ষতা"র নীতি পরিত্যাগ ক'রে

একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এইবার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে কংগ্রেস ঘোষণা করেন: "দেশীয় রাজ্যবাদে সমস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী করে, দেশীয় রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস সেইরূপ স্বাধীনতাই দাবী করে; এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই গণ্য করে।"

ব্রিটিশ-ভারতের জন্য কংগ্রেস কেবলমাত্র দায়িত্বশীল সরকার দাবী করেন নাই। বরং পূর্ণ স্বাধীনতাই তখন কংগ্রেসের দাবী ছিল। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের নীতি আরও ঘোরালো। কারণ দেশীয় রাজাদের রক্ষা করেই কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পরিবর্ত্তন দাবী করেছে। কাজেই ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশসমূহে ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে একইরূপ পরিবর্ত্তন কংগ্রেসের কাম্য, একথা কার্য্যতঃ ঠিক নয়।

ঐ প্রস্তাবে আরও ঘোষণা করা হয়:—"The congress, there fore, stands for full responsible government and the guarantee of civil liberty in the states and deplores the present backward conditions and utter lack of freedom and suppression of civil liberties in many of these states" অর্থাৎ—"কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার ও পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী করে। এবং দেশীয় রাজ্যের অনগ্রসর অবস্থা ও তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের নীতিতে দুঃখ প্রকাশ করে।" যদিও কংগ্রেস দায়িত্বশীল সরকার দাবী করে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনের দায়িত্ব থেকে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে নিজেকে পৃথক করে রাখে। এবিষয়ে প্রস্তাবে স্পষ্ট করে বলা হয়:—"Internal struggles of the pepole of

the states must not be undertaken in the name of the Congerss"—অর্থাৎ "রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আন্দোলন কখনো কংগ্রেসের নামে পরিচালনা করা চলবে না। এবং কার্য্যতঃ মাত্র "moral support and sympathy" নৈতিক সমর্থন এবং সহানুভূতির বেশী আর কিছু কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনে দেয় না। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ১৯৩৮-৩৯ সালে যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দেয় এবং যা রাজন্যবর্গ ব্রিটিশের সহায়তায় ঢেনকানলে, তালচেরে, ত্রিবাঙ্কুরে হায়দ্রাবাদে নির্ব্বিচারে গুলি চালিয়ে রক্তের বন্যার মধ্যে বর্ব্বরভাবে দমন করে, তা ত্রিপুরী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এবং এবার দেশীয় রাজ্য আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আভাষও পাওয়া যায়। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে এবার ঘোষণা করা হয়: "The great awakening that is taking place among the people may lead to a relaxion or a complete removal of the restraint which the Congress has imposed upon itself, thus resulting in the ever increasing identification of the Congress with the states." অর্থাৎ—"দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল জাগরণ আজ দেখা দিয়েছে তা হয়ত কংগ্রেসকে তার স্ব-আরোপিত নিরপেক্ষতার নীতিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য করতে পারে; এবং এইভাবে কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্য সমস্যায় অধিক পরিমাণে জড়িয়ে পড়তে হ'তে পারে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভিভাষণে কংগ্রেসকে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করে, ওয়ার্কিং কমিটীর তত্ত্বাবধানে

ন বিশেষ সাব-কমিটির তত্ত্বাবধানে আন্দোলন আবেদন জানান। * কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস হণ করেনি বা ওয়ার্কিং কমিটীর মারফৎ দেশীয় রাজ্যের লনকেও কোন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেয় নি। কাজেই দেশীয় কংগ্রেসের নীতি মাত্র দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে ভূতি ও সমর্থন" মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়েছে! কিন্তু যে বিপ্লবী জা সাধারণ দেশীয় রাজ্যের রাজাদের উচ্ছেদ ক'রে সমগ্র ভারতের সঙ্গে নিজেদের আন্দোলনকে এক করে দিতে চেয়েছে তাদের এই নীতির ফলে পৃথক করে রাখা হলো। ব্রিটিশ বিহীন (?) ভারতেও রাজন্যবর্গের স্থান কংগ্রেসের এই নীতির ফলেই সুগম হলো।

আশা করা গিয়েছিল যে, যুদ্ধের সময় এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজাদের, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতার

---

* "Today we find that the Paramount Power is in league with State authorities in most places. In such circumstances, should we of the Congress not draw closer to the people of the states? I have no doubt in my mind as to what our duty is to-day. Besides lifting the above ban, the work of guiding the popular movement in the States for civil liberty and responsible government should be conducted by the Working Committee on a comprehensive and systematic basis. The work so far done has been of a piecemeal nature, and there has hardly been any system or plan behind it. But the time has come when the working committee should assume this responsibility and discharge it in a comprehensive and systematic way and if necessary appoint a special Sub-Committee for the purpose." (Tripuri Congress. Presidential address, 1939.)

অপরাধে, হয়ত এদের উচ্ছেদ কংগ্রেস যুদ্ধান্তে নীতি হিসাবে দাবী করতে পারে, কিন্তু ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে উদয়পুরে দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সে আশাকে ধূলিসাৎ করে দেন। পণ্ডিত নেহরু বলেন: "Approach to the Princes should be a friendly one, and an invitation to them to join hands in the great task ahead"—অর্থাৎ "রাজন্যবর্গের প্রতি আমাদের বন্ধু-ব্যবহার করা উচিত; এবং আমাদের সম্মুখের বিরাট কাজে সাহায্য করার জন্য তাদের আহ্বান করা উচিত!"

এই বক্তব্যই তিনি পুনরায় জ্ঞাপন করেন যখন ফরিদকোটে চলতে থাকে প্রজা আন্দোলনের ওপর স্বৈরাচারী দেশীয় রাজার অকথ্য অত্যাচার। পণ্ডিত নেহরু যদিও ফরিদকোটের রাজাকে একদিকে সতর্ক করেন কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করতে ভোলেন নাই যে—"We have said that we mean no ill to the rulers as such and so far as we are concerned they may continue as constitutional heads"—অর্থাৎ "আমরা বলেইছি যে রাজন্যবর্গের প্রতি আমরা কোন অসদ্ভাব পোষণ করি না; এবং আমাদের মতে তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে থাকতে পারবেন!" পণ্ডিত নেহরু ফরিদকোট রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকের দম্ভকে চূর্ণ করে ফরিদকোট রাজ্যে প্রবেশ করে ২৭শে মে (১৯৪৬) যে সভা করেন তাতে তিনি প্রজা সাধারণের সমস্ত আশাকে ধূলিসাৎ করে ঘোষণা করেন—"We do not seek to abolish princely order. What we do want is responsible government" (ষ্টেট্‌সম্যান ২৮শে মে-৪৮)। অর্থাৎ "আমরা রাজন্য প্রথার বিলোপ চাই না। আমরা মাত্র দায়িত্বশীল সরকার চাই। পণ্ডিত নেহরু

যে ভাবে ক্রিপকোট রাজ্যে প্রবেশ করেন তা প্রত্যেক প্রজার প্রাণেই আশার সঞ্চার করেছিল—কিন্তু তাঁর বক্তৃতা কি তাদের মনের ভাষাকে ব্যক্ত করে নাই ?

বিদ্রোহী আব্দুল্লা

দেশীয় রাজ্যের দশ কোটি জনসাধারণের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েই ক্যাবিনেট মিশন চালালো তাদের গোপন বৈঠক। তাঁরা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের প্রতিনিধিকে ডাকলেন না। আপতঃদৃষ্টিতে মনে হলো দেশীয় রাজ্যে যে বিক্ষোভের আগুন ১৯৩৮ সাল থেকে জ্বলছিল অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তা বুঝি নিভে গেল নেতাদের দুমুখো বাক্য বন্যায়। এক দিকে নেতারা প্রজাদের বলেছন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য, আবার অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্রকে অভয় দিচ্ছেন যে তাদের তাঁরা রক্ষা করবেন। তাই মনে হ'লো বিক্ষুব্ধ ভারতের সেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তি বুঝি নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল শীঘ্রই এমন এক প্রবল জোয়ার এলো যা এই সম্ভাবনাকে বিপ্লবের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে প্রমাণ করল যে বিপ্লবী শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। বিপ্লবী শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্য মামুলী নেতৃত্বকে সরিয়ে, তার স্থানে উপযুক্ত নেতৃত্ব জনসাধারণই সৃষ্টি করে।

"কুইট কাশ্মীর"

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাড়ালেন শেখ আবদুল্লা; দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দাবীকে ক্যাবিনেট মিশন প্রত্যাখ্যান ক'রে যে অপমান প্রজা-শক্তিকে করল, তার উত্তর দিলেন সেখ আবদুল্লা; স্বাধীনতা যুদ্ধে শত সহস্র প্রজার মৃত আত্মার ক্ষমাহীন সংগ্রামের আকুতিকে নূতন সংগ্রামের বন্যায় রূপ দিলেন তিনি। এই আবদুল্লা "নূতন কাশ্মীরে"র আবদুল্লা নন যিনি মহারাজার অধীনেই

স্বাধীন (?) "নয়া কাশ্মীরে"র পরিকল্পনা করেছিলেন ; এ আবদুল্লা সম্পূর্ণ বিপ্লবী আবদুল্লা। তাঁর আহ্বান হলো ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যে স্বৈরতন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদের আহ্বান। অগ্নিগর্ভ প্রজাশক্তিকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাচ্চা স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করে প্রজা আন্দোলনে বিপ্লবের সূচনা করলেন। উদ্বেলিত প্রজা-সমুদ্রের গর্জ্জন অতি শীঘ্রই শোনা গেল— ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজের সৃষ্ট পঞ্চম বাহিনীকেও ভারত থেকে বিদায় নিতে হবে। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-শক্তির অন্তরের ভাষা প্রকাশিত হলো সেখ আবদুল্লার আহ্বানের মধ্য দিয়ে, পণ্ডিত নেহরুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নয়। কারণ স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র কখনই আপোষ চায় নাই, চাইতে পারেও না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে সেখ সাহেব ক্যাবিনেট মিশনের কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে কাশ্মীর রাজ্যে দেশীয় রাজার শোষণ ও কাশ্মীরীদের অকথ্য দারিদ্রের কথা ব্যক্ত করে এক স্মারক পত্র দাখিল করেন। এই স্মারক পত্রে তিনি ১৮৪৬ সালের অমৃতসর সন্ধির মূল নীতির বিরোধিতা করেন এবং কাশ্মীরী প্রজাসাধারণের পক্ষ থেকে চুক্তিকে অস্বীকার করে দাবী করলেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ পোষিত এই সব সামন্ত রাজাদেরও দেশীয় রাজ্য থেকে বিদায় নিতে হবে। সহজ কথায় তিনি কাশ্মীরী প্রজা সাধারণের সম্পূর্ণ মুক্তির দাবী করলেন। ডোগরা রাজকে কাশ্মীরের ওপর তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করবার জন্য ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন "ডোগরা রাজ কাশ্মীর ছাড়", "কুইট কাশ্মীর।"

সেখ আবদুল্লা ১৫ই মে তারিখে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে "দেশীয় রাজ্য থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের দাবী, "ভারত ছাড়" দাবীরই যুক্তি সঙ্গত পরিণতি। যখন স্বাধীনতা আন্দোলন আজ দাবী করছে যে,

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হবে, যুক্তি সঙ্গত ভাবেই বলা চলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এইসব দালালের দলও দেশীয় রাজ্য থেকে বিদায় নেবে; এবং ক্ষমতা উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী জনসাধারণের করায়ত্ব হবে।"

তিনি আরও বলেন "ভারতবর্ষের সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তারই পরিপূর্ণ পরিণতি "ভারত ছাড়" দাবী। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যের অধিপতিবৃন্দ, ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ জনতার অধিকার হরণ করে আছেন; এবং ইহারা সর্ব্বদাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসেছেন।"

"কাশ্মীর ছাড়" (Quit Kashmir) দাবীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশীয় রাজ্যের রাজা ও নবাবের দল সমস্ত দেশীয় রাজ্য ত্যাগ করবে, "কাশ্মীর ছাড়" দাবীর এই একমাত্র অর্থ। এই দাবী হায়দরাবাদসহ সমস্ত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

পরিশেষে তিনি ঘোষণা করেন: "রুশ বিপ্লবের বন্যায় বলদর্পী জার ভেসে গিয়েছে, ফরাসী বিপ্লবের বন্যায় তেমনি ফ্রান্সের শাসক শ্রেণীর কার্য্যকালও অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তেমনি আজ সময় এসেছে অমৃতসরের চুক্তিনামাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিড়ে ফেলে দিয়ে "কাশ্মীর ত্যাগ কর" এই দাবী করবার। কাশ্মীর জাতির ওপর শাসন করবার ক্ষমতা (Sovereignty) মহারাজা হরি সিং-এর জন্মগত অধিকার নয়। "কাশ্মীর ছাড়" এই দাবীকে বিদ্রোহ বলবার কোন হেতু নাই। ইহা (কাশ্মীর প্রজাদের) মূল অধিকারের (right) কথা। কাশ্মীরী জাতি এই দাবীর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি এই প্রশ্নের ওপর রাজ্যে গণভোট দাবী করি। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬শে মে '৪৬)

শেখ আবদুল্লাকে ডোগরাজ বন্দী করবার আগে তিনি যে বক্তৃতা করেন তা লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক "ট্রিবিউন-"এ ২৬শে মে (১৯৪৬) প্রকাশিত হয়। সেই বক্তৃতার অনুবাদ এইরূপ :—

"ডোগরা রাজের অত্যাচারে আমাদের অন্তরাত্মা ক্ষত বিক্ষত। কাশ্মীরের জনসাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, কিন্তু আজ তাদের চেহারায় কালিমার ছাপ সকল সৌন্দর্য্যকে ঢেকে ফেলেছে। কাজেই আজ আমাদের কাজ করবার দিন এসেছে। এই দারিদ্র্যকে দূর করতে হলে দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে ; এবং এই "জেহাদে" আমাদিগকে যোদ্ধার নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এই সংগ্রামের আহ্বান শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের জন্য নয়—ইহা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ সংগ্রাম করেছে এবং তারই পরিণতি "ভারত ছাড়ো" দাবী। কারণ ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্ত্রবলের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করেছে।

"ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা, যারা এক চতুর্থাংশ ভারতবর্ষের ওপর চেপে বসে আছেন, তাঁরা সর্ব্বদাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই সামন্ত রাজারাও যে আজ দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তা এই "ভারত ছাড়ো" দাবীরই যুক্তি সঙ্গত পরিণতি। যখন সমস্ত ভারতবর্ষ আজ দাবী করছে যে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগ করতেই হবে, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার দেশীয় রাজাদের অবশ্যই দেশীয় রাজ্য ত্যাগ করে, ক্ষমতা সত্যিকারের উত্তরাধিকারী প্রজা সাধারণের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

"আমরা যখন 'কাশ্মীর ছাড়ো' দাবী করি তার মানে হলো ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় রাজ্য থেকে রাজা ও বাদসাহদের আমরা

অপসারণ কামনা করি। আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আমাদের এই দাবী হায়দরাবাদ সম্বন্ধেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। এবং আমাদের বিশ্বাস সেখানকার জনসাধারণও দাবী করবে 'নিজামশাহী হায়দরাবাদ ছাড়ো।'

"পণ্ডিত রামচন্দ্র কাকের ন্যায় যে সমস্ত হিন্দু কাশ্মীরে ডোগরা রাজের শাসন অক্ষুণ্ণ দেখতে চান, তাঁরা যেন কখনই ভুলে না যান যে কাশ্মীরের অধিবাসীকে—হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে কেনা গোলামের ন্যায়ই দেখা হয়। তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

"আজ আমার হাতে দাসত্বের প্রতীক এই হাতকরি। কিন্তু তাতে আমরা ভীত নই। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।.........দেশীয় রাজ্যের রাজাদের শাসন ক্ষমতা (Soveriegnty) জন্মগত অধিকার কখনই হতে পারে না। আজ কাশ্মীরের প্রত্যেকটী নরনারী—স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ,—সকলেই সমস্বরে দাবী তুলবে—"ডোগারা রাজ কাশ্মীর ছাড়ো"। (Kashmir on Trial "— বই থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ৭-৮)

অপর একটী জনসভায় তিনি বলেন:—আমি ইংরেজকে একটী প্রশ্ন করি যে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় (মহারাজা গুলাব সিং যে ৭৫ লক্ষ দিয়ে কাশ্মীর কিনেছিলেন তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা) কাশ্মীরকে ডোগরা রাজের নিকট যে বিক্রী করেছিল সেই বিষয়ে তারা কী করেছে? ইংরেজ ভারতবর্ষে "বানিয়া" সেজেই এখানে প্রবেশ করেছিল এবং কাশ্মীরী জনসাধারণকে তারা ভারতের অপর একজন "বানিয়ার" কাছে বিক্রী করেছিল।"

তিনি আরও বলেন: "এই বিক্রয়ের ব্যবস্থা ৪০ লক্ষ কাশ্মীরী নরনারীর অগোচরে ডোগরা রাজ ও ইংরেজদের মধ্যে হয়েছিল; এবং

প্রতিটি মানুষের দাম ধার্য্য হয়েছিল সাত পয়সা করে! আমাদের আজ এই অমৃতসর বিক্রয়-চুক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিবাদ জানবার দিন এসেছে।"*
(ষ্টেট্‌সম্যান ২৬শে মে '৪৬)

কাশ্মীর রাজ কিন্তু এই চুক্তির একটী অক্ষরও বদলাতে রাজী হলেন না। বরং তিনি গোপনে এই গণ-বিক্ষোভকে গুলী, ও লাঠির মুখে দমন করবার জন্য প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরে গোপনে প্রস্তুতি চালালেন। বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরবাসীর রক্তে মহারাজা ও তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী দলের হাত চিরদিনের মত কলঙ্কিত হয়ে কীভাবে রইল পরের অধ্যায়ে সেকথা জানা যাবে।

* উপরোক্ত বক্তৃতাগুলি সংবাদ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রথমে প্রচারিত হয় না। সেখ সাহেবের গ্রেপ্তারের পর লাহোর থেকে কাশ্মীর প্রচারক সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। শেষের বক্তৃতাটী ষ্টেটসম্যান পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত ২৫শে মের (১৯৪৬) সংবাদ থেকে উদ্ধৃত।

দশ

ডোগরা-রাজের দমননীতি

টেঁকো-মাথা দুষ্ট-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সৃষ্ট পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের চক্রান্ত ও মন্ত্রণাকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে বেছে নিয়ে মহারাজা মুক্তিকামী জাগ্রত কাশ্মীরের বিরুদ্ধে চালালেন তাঁর অত্যাচার, যেমন স্যার সি, পি, রামস্বামী ত্রিবাঙ্কুরে চালিয়েছিলেন। দমন নীতির প্রথম আঘাত পড়ল সেখ আবদুল্লার ওপর। কারণ সেখ আবদুল্লা ও জাতীয় সম্মেলনের অন্যান্য নেতাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রচণ্ড আঘাত হেনে, আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়াই শাসক সম্প্রদায়ের গোপন উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য কাশ্মীর সরকার পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুতও হ'তে ছিলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী একের পর এক বদল ক'রে (৪জন মন্ত্রী বদল করা হয়) আন্দোলনের ঠিক এগার মাস আগে রামচন্দ্র কাককে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হয়। রামচন্দ্র কাক আন্দোলনের সময় নিজেই এক বিবৃতিতে বলেছিলেন—"আমরা ১১ মাস ধ'রে প্রস্তুত হয়েছি এবং এখন আমরা মুখের ওপর জবাব দেবার জন্য তৈয়ার। আর আমরা ইতঃস্তত করবো না বা দুর্ব্বলতাও দেখাবো না। নৃশংসভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করবো এবং তার জন্য অনুতাপও করবো না।" (ষ্টেটস্‌ম্যান ২রা জুন '৪৬)

কাশ্মীরের মহারাজা "নয়া কাশ্মীরে"র দাবীর উত্তর দিলেন গুলির মুখে। যখন ভারতবর্ষে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন হচ্ছিল, তখনো কাশ্মীরের শাসক-সম্প্রদায় পঁচা, পুরানো দমন নীতি চালিয়ে জনসাধারণের দাবীকে স্তব্ধ

করে দিতে চাইল। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সেখ সাহেব বা জাতীয় সম্মেলন কোন আন্দোলন আরম্ভ করবার আগেই কাশ্মীর সরকারই রুদ্র মূর্ত্তি নিয়ে জাতীয় সম্মেলনকে খতম করে দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল ; যেমন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সালে পড়েছিল কংগ্রেসের ওপর। * পণ্ডিত নেহরুর জরুরী তার পেয়ে যখন শ্রীনগর থেকে দিল্লীতে রওনা হচ্ছিলেন তখন (২০শে মে, ১৯৪৬) শ্রীনগর থেকে প্রায় ১০০শত মাইল দূরে ঘরি নামক জায়গায় সেখ সাহেবকে কাশ্মীর সরকার গ্রেপ্তার করেন; এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে মিলিটারীর পাহারায় বাদামী বাগ ক্যাণ্টনম্যাণ্টে বন্দী করে আনা হয়। শ্রীনগর থেকে ৩০ মাইল দূরে, মির্জ্জা আফজল বেগকে (ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) অনন্তনাগে বন্দী করা হয়। এবং পর পর সেখ সাহেবের অন্যান্য সহকর্ম্মী সর্দার বুধা সিং, পণ্ডিত শংকরলাল সরুফ, সুলতান গঙ্গাধর প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সেখ সাহেবের অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী গোলাম মহীউদ্দিনকেও গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া জারি করা হয়। কিন্তু তিনি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন করতে সমর্থ হন। সম্মেলনের নেতাদের দু'দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় (২০-২২শে মে); এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগরে জাতীয় সম্মেলনের অফিস—মুজাহিদ মঞ্জিল—পুলিশ ও মিলিটারী দখল করে। শ্রীনগর সহরে ২৫জন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে সামরিক ও পুলিশ বাহিনী কাজ আরম্ভ করে। সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় মিঃ রিচার্ড পাওয়েল, (কাশ্মীরের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল) এবং মিঃ এইচ, এল্, স্কট্ (চীফ্ অব মিলিটারী ষ্টাফ্) এই দুইজনের ওপর। কার্য্যতঃ সমস্ত

* ২৭শে মে-র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীর উপত্যকাই পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে দেওয়া হয়; এবং কাশ্মীর রাজ্যে দমন নীতি পুরা মাত্রায় চালু করবার জন্য মধ্য-প্রাচ্য থেকেও সৈন্য আমদানী করা হয়।

জনতার অপূর্ব্ব প্রতিরোধ

সেখ আবদুল্লা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে কাশ্মীরের জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় এই বিক্ষোভের প্রকাশ হ'তে থাকে নানাপ্রকারে। শ্রীনগরে পূর্ণ হরতাল চলে দিনের পর দিন; এবং টহলদারী পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে উত্তেজিত জনতার সংঘর্ষ চলতে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে সঙ্গীনধারী সৈন্যদল এবং উত্তেজিত জনতা দেখলেই তাদের ওপর এরা আক্রমণ করতে থাকে। সৈন্যদল জাল দিয়ে ঘেরা মোটর লরীর মধ্য থেকে জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। শুধু তাই নয় বড় বড় রাস্তার মোড় পার হবার সময় সকলকেই সঙ্গীনের মুখে মহারাজার জয়ধ্বনি উচ্চারণ ও মাথার পাগড়ী খুলে রাস্তা সাফ ইত্যাদি চলতে থাকে ; এবং মন্দির ও মস্‌জিদ ঘিরে পুলিশ ও মিলিটারী মোতায়েন করা হয়। কোন কোন স্থানে জালিওয়ানাবাগের পুনরাবৃত্তি ক'রে নিরীহ পথিক জনসাধারণকে রাস্তার ওপর বুকে ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করা হয় তাদের ভয় দেখাবার জন্য। রাস্তায় কোন শোভাযাত্রা বা দলবদ্ধ জনতা বের হওয়ামাত্র পুলিশ লাঠি চালিয়ে তা' ছত্রভঙ্গ করে দেয়; এবং জনতা সামান্য প্রতিবাদ করলেই গুলি চালানো হয়। অনন্তনাগে (শ্রীনগর থেকে প্রায় ৩০ মাইল) মহিলাদের এক বিরাট শোভাযাত্রার ওপর লাঠি চালনা ও শেষ পর্য্যন্ত গুলি ছোড়া হয় (২৩শে মে)। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতাও রুখে পুলিশ বাহিনীর বাধাকে অতিক্রম করেই এগুতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত সৈন্য বাহিনী এসে গুলি চালিয়ে একজন মহিলা শোভাযাত্রীকে হত্যা এবং ৬ জনকে জখম

করে শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেয়। এই বর্ব্বর নৃশংসতার ফলে বিক্ষোভ ক্রমশঃ শ্রীনগর ও অনন্তনাগ ছাড়াও, বিজবেহারা, পানপারা, পত্তন, সোপর হাণ্ডোয়ারা, বান্দীপুরা, বারমূলা, জম্মু প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা জুড়েই চলতে থাকে পুলিশ ও মিলিটারীর চরম তাণ্ডব ও চণ্ড-নীতি।

এই পাশবিক অত্যাচারকে কিন্তু জাগ্রত কাশ্মীরের জনতা বিনা প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে মেনে নেয় নাই। ২২শে মে যখন সৈন্যদলের গুলিতে শ্রীনগরে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হলো এবং বেপরোয়া গ্রেপ্তার ও ধরপাকড় সমস্ত উপত্যকা জুড়ে চলতে থাকে (২২শে পর্য্যন্ত ২ দিনে প্রায় ১০০শত জন গ্রেপ্তার হয়) তখন জনতাও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। রাস্তায় পরিখা খনন ও ব্যারিকেড তৈরী করে আক্রমণকারী সৈন্যদলকে তারা বাধা দিতে থাকে; এবং কারফিউ, ও বাধা নিষেধ অমান্য করে সভা-সমিতি করতে থাকে। সর্ব্বোপরি নিরস্ত্র জনতার উপর লাঠি ও গুলিচালনার উত্তর আক্রান্ত জনতা ইট পাথর ছুড়ে দিতে থাকে। সৈন্যদলের গুলিতে একজন শ্রমিক নিহত হওয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে; এবং কর্ত্তৃপক্ষ কারখানাগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি শ্রীনগরের ঝাড়ুদার ও টাঙ্গাওয়ালা প্রভৃতি এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করে শ্রীনগরের যান-বাহন অচল করে দেয়। শ্রীনগর ও অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত প্রার্থনা সভা মন্দিরে বা মস্‌জিদে হতো, (বিশেষতঃ মস্‌জিদ প্রাঙ্গনে), প্রার্থনান্তে বিভিন্ন বক্তা সেখানে কাশ্মীরের শাসক-সম্প্রদায়ের এই দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বক্তৃতা এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে "কাশ্মীর ছাড়ো" ধ্বনি করতেন। শ্রীনগরে এমনি একটি সভায় কড়া পুলিশ ও মিলিটারীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গোলাম মহিউদ্দীন বক্তৃতা করে আবার

আত্মগোপন করে সরে পড়েন। ক্ষিপ্ত সরকার এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করতে থাকেন। গোলযোগ আরম্ভ হবার প্রথম পাঁচদিনেই সরকারী হিসাব মত ৩৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আহতের সংখ্যা অজ্ঞাত। বেসরকারী হিসাবে গোলযোগের প্রথম সপ্তাহেই মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৯০০ জন, পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা ৬১ জন (তন্মধ্যে শ্রীনগরেই ৩৩ জন)। এবং এই মৃতের মধ্যে ৩জন মহিলাও আছেন। মোট আহতের সংখ্যা ২০০শত জন। *

—কাশ্মীর সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রভাব ক্রমশঃ কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও বিস্তৃত হয়। জাতীয় সম্মেলনের প্রচার সম্পাদক শ্রীযুত শ্যামলালের বিবৃতি থেকে আরও জানা যায় যে রাজ্যের সমগ্র কাশ্মীরী পুলিশ বাহিনী তাদের দেশবাসীর ওপর লাঠি চালনা করতে অস্বীকার করায়, এদের নেতৃস্থানীয় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সমগ্র কাশ্মীরী পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। ২৭শে মে তারিখে সর্ব্ব-প্রথম জাতীয় সম্মেলনের নাম দিয়ে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্র শ্রীনগরে সহরময় বিলি করা হয়। তাতে বলা হয় যে জনতা যেন শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চালিয়ে যায়।

প্রতিবাদ আন্দোলন দ্বিতীয় সপ্তাহে এক নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমতঃ যখন ডোগরা সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াতে থাকে হঠাৎ শ্রীনগরের বিভিন্ন রাস্তায় তাদের একদিন (২৫শে মে) ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেল তারা

* জাতীয় সম্মেলনের প্রচার সচিব শ্রীযুত শ্যামলালের ২৮শে মে-র লাহোর থেকে প্রকাশিত বিবৃতি।

সহরময় মানুষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে না—তারা তাড়াচ্ছে কুকুর। কারণ সেদিন সহরের বিভিন্ন রাস্তায় একই সময় সাড়িবদ্ধ কুকুড়ের দল "কুইট্ কাশ্মীর" লেখা গলায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে! ডোগরা রাজের পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর পক্ষে এদৃশ্য অসহ্য। কুকুরের পেছনেই তারা ছুটতে লাগল সঙীন উঠিয়ে।

প্রতিবাদ আন্দোলনের তৃতীয় রূপ প্রকাশ পায় বিভিন্ন মহল্লায় একই সময় নৈশ ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে। ডোগরা রাজের শোষণ ক্লিষ্ট জনতার মনোবেদনার তপ্ত অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস একই সময়ে রাত্রির অন্ধকারে ডোগরা রাজের ওপর বর্ষিত হলো শ্রীনগরের বিভিন্ন মহল্লায়। অত্যাচারিত জনসাধারণ, একই সময়ে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বলে উঠল :—"ডোগরা রাজ কাশ্মীর ছাড়ো" নয়ত আমাদের এই তপ্ত অশ্রুতে পুড়ে ভস্মীভূত হও!

আন্দোলনের আরও একরূপ প্রকাশ হয় বে-আইনী ধ্বনি উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে শ্রীনগরের কয়েকটি মহল্লায় এই আইন প্রতিদিন সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণভাবে ভঙ্গ করা হতে থাকে।

প্রতিরোধ সংগ্রামের অপূর্ব্ব অধ্যায় রচিত হয় ২৯শে মে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, মহারাজার প্রাসাদ সন্নিকটে, মনোরম ডাল হ্রদে। অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের জন্য কাশ্মীরের ডালহ্রদ পৃথিবী বিখ্যাত। স্ফটীকের মত এর স্বচ্ছ জল, আর তার ওপর প্রস্ফুটিত শত শত রক্ত বর্ণের পদ্ম। এই হ্রদের বুকে শিকারা (ছোট ছোট কাশ্মীরী নৌকা) ভ্রমণ অতি মনোরম। এতকাল এই সৌন্দর্য্যই একে কাশ্মীরের ইতিহাসে গৌরব দান করেছে। কিন্তু আজ ডালহ্রদ এক নূতন গৌরব লাভ করে কাশ্মীরের জনগণ ও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে চিরদিনের মত একসূত্রে বাধা পড়ল। আজ থেকে ডালহ্রদ বিদেশীর দৃষ্টি শুধু তার

বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দিয়ে আকর্ষণ করবে না, তার আপন মর্য্যাদা দিয়েও আকর্ষণ করবে। ঘটনাটি হলো: ১৯শে মে রাত্রিতে শত শত সিকারা নিয়ে সার বেঁধে রাজ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল শঙ্কাহীন একদল কাশ্মীরী নর-নারী। হ্রদের পাশেই মহারাজার প্রাসাদ—সেখানে তিনি তখন সুখ নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু সেই প্রাসাদপুরীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে রাজ প্রাসাদের অতি সন্নিকটে সেই শোভাযাত্রাকারীর দল শিকারা হতে শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি করে উঠলো "আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ" "কাশ্মীর কো ছোড় দো"! রাজপ্রাসাদের প্রহরীর দল চীৎকার করে উঠতেই সামরিক সতর্কতার সংকেত ধ্বনি বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিকারা থেকে বেজে উঠল শত শত কণ্ঠে জাতীয় সম্মেলনের গান—কাশ্মীরের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু সঙ্গীতকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য গর্জে উঠল কাশ্মীররাজের বন্দুক! ডালহ্রদের জল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বীরের তাজা রক্তে রঙীন হয়ে উঠল। ডালহ্রদ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পুণ্য তীর্থে পরিণত হলো যেখানে কাশ্মীরবাসী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় চিরকাল মস্তক অবনত করবে।

শাসক শ্রেণী যতই নির্ম্মম হতে থাকে জনতার প্রতিবাদও ততই মৃত্যুভয় হীন হতে থাকে। একটী ঘটনা উল্লেখ করলেই সংগ্রামী কাশ্মীরের সত্যিকারের মূর্ত্তি আমাদের চোখে ধরা পড়বে। পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচারে যখন শ্রীনগরের জীবনযাত্রা অচল হয়ে উঠেছে, এবং যখন রাস্তায় বেড়োলেই গ্রেপ্তার ও প্রতিবাদ করলেই গুলিকরা হচ্ছিল তখন কাশ্মীরের রাজধানীর পথে এক বিচিত্র মিছিল বেড়োয়। কাশ্মীরের মুসলিম নারীসমাজ পর্দ্দা ছিড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দু নারীদের সঙ্গে মিলে এক প্রতিবাদ শোভাযাত্রা শ্রীনগরের পথে বের করে। এদের নেতৃত্ব করে সাধারণ শ্রমিক-সমাজের এক অসাধারণ রমণী। তাঁর নাম শ্রীমতী

জোনি। আমরা তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। পুলিশ শোভাযাত্রাকে বাধা দেয় এবং শ্রীমতী জোনিকে গ্রেপ্তার করবার তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি উত্তর করেন যে তার "মিস্ কুইট কাশ্মীর।" পুলিশ পুনঃ পুনঃ নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রতিবার ঐ একই উত্তর দেন। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন—"নিউ কাশ্মীর" (নয়া কাশ্মীর)। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তা করে নিয়ে যায় এবং শোভাযাত্রাকে যথারীতি লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শ্রীমতী জোনির একমাত্র পুত্র একটী শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের সময় শ্রীনগরের রাজপথে নিহত হয়। কাশ্মীর রাজের বর্ব্বর আক্রমণ, নারী, শিশু বৃদ্ধ কাহাকেও সম্মান করে নাই।

জনতার অপূর্ব্ব প্রতিরোধ এইভাবেই চলতে থাকে মাসের পর মাস, এবং পল্লী অঞ্চলেও এই আন্দোলনের ঢেউ লাগে। মিরপুর বাদগাঁও প্রভৃতি জেলায় শত সহস্র কৃষাণ দিনের পর দিন জাতীয় সম্মেলনের রক্ত পতাকার তলে সমবেত হয়ে "বে-আইনী" শোভাযাত্রা ও "কাশ্মীর ছাড়ো" ধ্বনিতে কাশ্মীরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে সরকারের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে থাকে। এবং ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে এই আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে চলতে থাকে। আর সরকারও দমননীতির রথ পুরোদমে চালিয়ে যান জনসাধারণের ওপর দিয়ে। সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের প্রজাদের টুঁটি টিপে প্রধানমন্ত্রী কাক আন্দোলনের নেতা শেখ আবদুল্লার জনপ্রিয়তাকে খর্ব্ব করতে চাইলেন। কিন্তু সেখ আবদুল্লা আর মুক্তিকামী কাশ্মীরী নর-নারী—হিন্দু-মুসলমান শিখ নির্ব্বিশেষে—তখন কিন্তু এক হয়ে গেছে। প্রজা-সাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে যে "কাশ্মীর

ছাড়ো” পথই ডোগরা রাজের অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তির একমাত্র রাস্তা। কাশ্মীরী নর-নারীর রক্তে কলুষিত যার হাত সেই রামচন্দ্র কাকের অত্যাচারই তাঁর নিজের মৃত্যুপণ হলো। সেখ আবদুল্লা মুক্তিকামী কাশ্মীরী নর-নারীর নিকট আরও প্রিয়তর নেতা হলেন। আর রামচন্দ্র কাক রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে রইলেন।

কাশ্মীরে বিদ্রোহ ও পণ্ডিত নেহরু

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুই সর্ব্বপ্রথম কাশ্মীর রাজ্যে অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করে অত্যাচারের বীভৎসতার প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২৬শে মে নয়া দিল্লী থেকে তিনি যে বিবৃতি দেন তা'তে তিনি বলেন যে, গণ-আন্দোলনকে দমন করতে কাশ্মীর সরকার সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে শ্রীনগর সহরকে তাঁরা এক মৃতের পুরী করে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকারী অনুমোদন ব্যতীত কোন সংবাদই বাইরে আসতে দেওয়া হয় নি; এবং যে সমস্ত সংবাদ বাইরে যেতে দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে "একদেশদর্শী ও বিশ্বাসের অযোগ্য"। তাঁর মতে, সরকারীভাবে যে মৃতের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়—আরও অনেক বেশী লোককে হত্যা ও আহত করা হয়েছে এবং অনেক আহতব্যক্তিকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। তিনি কাশ্মীর সরকারকে সতর্ক করে দেন যে, তাঁরা কি মনে করেন যে তাঁদের বন্দুকের ভয়েই সেখ আবদুল্লা ও জনসাধারণকে তিনি এই বিপদের মুখে ত্যাগ করবেন? নিশ্চয়ই না—। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেন যে, কাশ্মীরের নেতা ও জনসাধারণের এই দুর্য্যোগের দিনে তাদের পাশেই তিনি দাঁড়াবেন। কিন্তু কি মহারাজা আর কি তাঁর প্রধানমন্ত্রী (কাক) কেউ এই বিবৃতিতে ভয় পেলেন না। ২৮শে মে তারিখ সেখ সাহেবের

বিচারের ব্যবস্থা করবার জন্য সুযোগ চেয়ে যখন তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাছে তার পাঠান। তার উত্তরে তাঁকে জানানো হয় যে এবিষয়ে বিচার বিভাগ একমাত্র "অভিযুক্ত" ব্যক্তির কাছ থেকে দরখাস্ত পেলে বিবেচনা করবে। অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুকে এড়িয়ে যাওয়া হলো। পণ্ডিত নেহরু আবার ১৫ই জুন মহারাজাকে তারযোগে এই বিচার পরিত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করেন এবং নিজে শ্রীনগরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার উত্তরে কাশ্মীরের মহারাজা জানান যে, তাঁর (পণ্ডিতজীর) আগমন অবাঞ্ছিত ও তাতে সমস্যা আরও বাড়বে। এমন কি যখন তিনি ১৯শে জুন শ্রীনগর অভিমুখে দেওয়ান চমনলাল, মিঃ আসফ আলি, মিঃ বলদেব সহায় ও মিঃ মোহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে যাত্রা করেন তখন পণ্ডিত নেহরুকে সৈন্য দিয়ে বাধা দেওয়া হয় এবং শ্রীনগরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিতজীকে ডোমেল (শ্রীনগর থেকে ১৪০ মাইল) নামক স্থানে বন্দী করেন।

গ্রেপ্তারের বিবরণে প্রকাশ যে, প্রথম তাঁকে কোহালা নামক জায়গায় (পাঞ্জাব-কাশ্মীর সীমান্তে) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাধা দেওয়া হয়। তখন পণ্ডিত নেহরু জানান যে, তাঁকে গ্রেপ্তার না করা পর্য্যন্ত তিনি ফিরে যাবেন না—তিনি কখনই ফিরে যেতে পারেন না।

শ্রীনগরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দার পণ্ডিতজীর নিকট তখন কাশ্মীর সরকারের আদেশ জারী করেন। পণ্ডিত নেহরু তাকে বলেন: "আমি তোমাদের সরকারকে মানি না এবং তাদের আদেশও মানবো না। আমি এরূপ আদেশকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করি এবং এখন একে লাথি মারবো। এরূপ আদেশ যদি স্বয়ং বড়লাটের নিকট থেকেও আসে তা-ও আমি মানবো না। জীবনের গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি এরূপ আদেশ অমান্য করে এসেছি। আজও আমি

তাই করবো। কেউ কখনো আমার গতি রোধ করতে সাহস পায়নি। আমি শ্রীনগরে যে-কোনরূপে প্রবেশ করবোই। আমি কিছুতেই পিছু হটবো না। যে সরকার এই আদেশ জারি করেছে আমি তাকে মানি না, এবং তার আদেশ মানতেও আমি বাধ্য নই।" *

বেশীদূর তাঁকে অগ্রসর হ'তে দেওয়া হয় না। কোহালায় তাঁকে বন্দী করে প্রথমে ডোমেল ও পরে উরীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দু'দিন বন্দী রাখা হয়।

কাশ্মীর সরকারের ধৃষ্টতার মুখে পণ্ডিতজীর এই দৃপ্ত উক্তি সমগ্র ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মনে হলো আবার বুঝি ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালের আগুন জলবে—ব্রিটিশ শাসক ও তারই সৃষ্ট ভারতের পঞ্চম বাহিনী দেশীয় রাজাদের পুড়ে ছাই খাঁক্ করে দেবার জন্য। তার স্পষ্ট সম্ভাবনা প্রকাশ পেল কাশ্মীর হতে আরম্ভ করে কন্যাকুমারীকা, পেশোয়ার হতে আরম্ভ করে আসাম পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহরুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গণ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই সহরে আবার ছাত্র-শ্রমিক হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এলো। মনে হ'লো কাশ্মীরের সংগ্রাম থেকে বুঝি সমস্ত ভারতবর্ষে "ভারত ছাড়" সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হবে ব্রিটিশ দালালদের তাড়াবার জন্য।

যদিও পণ্ডিত নেহরু বললেন যে তিনি এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সময় কাশ্মীরের জননায়ক ও জনসাধারণের পক্ষেই দাঁড়াবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করলেন না এবং তার ফলে কাশ্মীর সরকারের পক্ষে আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করবার আরও সুযোগ হলো। ২১শে জুন কাশ্মীর সরকারের যে প্রেস-নোট শ্রীনগর থেকে বের হয় তাতে স্পষ্টভাবেই বলা হলো—"বর্ত্তমান

* ২১শে জুন অমৃতবাজার পত্রিকায় বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদ।

আন্দোলনের জন্য সেখ আবদুল্লাকে তিনি (পণ্ডিত নেহরু) তাঁর কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অভিযুক্ত করলেও এবং আন্দোলনকে "চালে ভুল" (Tactical blunder) আখ্যা দিলেও, এখন বলতে সুরু করেছেন যে, সেখ আবদুল্লার মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কাশ্মীরে শান্তি আসতে পারে না" (ষ্টেট্সম্যান—২৩শে জুন ১৯৪৬)। অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর কথা উল্লেখ করেই সরকার পক্ষ ইঙ্গিতে বলতে চাইল যে সেখ আবদুল্লাকে বন্দী করে এই "ভুল" আন্দোলন দমন করলেই কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসবে। আসলে পণ্ডিত নেহরু আপোষে সেখ আবদুল্লার মুক্তির জন্যই যে কাশ্মীরে যাচ্ছিলেন সেকথা তিনি মহারাজাকে তাঁর ১৬ই জুনের পত্রেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং একজন চাইলেন কাশ্মীর রাজের সঙ্গে আপোষ করে শান্তি আনতে, আর একজন চাইলেন গণ-আন্দোলনকে দমন করে শান্তি আনতে। সেখ আবদুল্লার "কাশ্মীর ছাড়ো" নীতি অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য থেকে রাজা-মহারাজাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ উভয়ের মধ্যে কেউ মেনে নিতে চাইলেন না। পণ্ডিত নেহরু ১৬ই তারিখে যে পত্র মহারাজাকে লেখেন তাতে স্পষ্ট করেই তিনি বলেছিলেন যে, সেখ আবদুল্লা মুক্ত হবা-মাত্র আমরা পরামর্শ করবার সুযোগ পাব এবং যে পথে যোগ্য সমাধানে পৌছান যায় তা খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা করবো। *

পণ্ডিতজী দিল্লীতে দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের জেনারেল কাউন্সিলের এক বৈঠকে ৮ই জুন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, কাশ্মীরের ঘটনা সত্ত্বেও তাঁদের নীতির—অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজার অধীনে

* As soon as he released we can confer together and endeavour to devise means which would lead to a proper settlement"—Patrika, 24-6-48

শুধু দায়িত্বশীল সরকারের বেশী কিছু দাবী না করা—কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; যদিও এই নীতি পরিবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট জনমত দেখা দিয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

সর্দ্দার প্যাটেল কাশ্মীরের ঘটনাকে লক্ষ্য করে আরও স্পষ্টভাবে বললেন যে, রাজ্যের জনসাধারণ যেন বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলনে এখন নিজেদের জড়িত না করে। এবং কেবলমাত্র দায়িত্বশীল সরকারের দাবী তুলেই ক্ষান্ত হয়। তিনি ঐ সভায় আরও স্পষ্ট করে বলেন যে দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা কংগ্রেসের ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেন। কারণ কংগ্রেসের জয় হলে তাঁদেরও মুক্তি হবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। [অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা ৯ই জুন—১৯৪৬]

নেতারা ঘোরালো কথা বললেও পণ্ডিতজীর শ্রীনগর অভিযানকে স্বৈরাচারী দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে জনতার শেষ সংগ্রাম মনে করে যখন সমস্ত ভারতবর্ষের জনসাধারণ ধ্বনি উঠালো—'চলো চলো কাশ্মীর চলো' তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লীতে আপোষ-আলোচনার জন্য বড়লাটের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতে বসেছেন। কাজেই পণ্ডিত নেহরুর কাশ্মীর অভিযানকে তাঁরা খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখলেন না। মৌলানা আজাদের মারফৎ ফোনযোগে কাশ্মীর রাজের বন্দী পণ্ডিত নেহরুর কাছে "আদেশ" পাঠানো হলো—দিল্লীতে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু দাবী করলেন যে কাশ্মীরে তাঁকে আবার ফিরে আসতে দেওয়া হবে এই সর্ত্ত স্বীকার করলেই তিনি দিল্লীতে ফিরে আসবেন। মৌলানা আজাদ বললেন, তাই হবে। পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে ভাল ছেলের মত ফিরে আসলেন ২৩শে জুন তারিখে।

১৯শে জুন থেকে ২৩শে জুনের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে যে বিরাট

গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা কাশ্মীরকে উপলক্ষ্য করে দেশীয় রাজদের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিল, কংগ্রেসের আপোষকামী নেতৃত্বের আওতায় দেশীয় রাজন্যবর্গ তা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। পণ্ডিত নেহরুকে কাশ্মীর থেকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসতে হলো। না হলো সেখ আবদুল্লার মুক্তি, না হলো কাশ্মীরে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা। বরং উদ্ধত কণ্ঠে কাশ্মীরের মহারাজা ১৫ই জুলাই তারিখ এক বিশেষ দরবার করে ঘোষণা করলেন যে রাজ্যের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে বাইরের কোন হস্তক্ষেপই তিনি মানবেন না; এবং যদি কেউ তাঁর "সুন্দর" কাশ্মীরে শান্ত শিষ্টভাবে আইন ও শৃঙ্খলা মেনে আসতে চায় তবেই তাকে আসতে দেওয়া হবে, নচেৎ নয়।

এই পরাজয় ভাবপ্রবণ পণ্ডিত নেহরুকে যে কতখানি মনঃপীড়া দিয়েছিল তা বেগম আবদুল্লাকে লিখিত পণ্ডিতজীর একখানি চিঠি থেকেই বোঝা যাবে। আমরা চিঠিখানা অনুবাদ করে দিলাম:—

"আমাদের চক্ষের সম্মুখে এক বিরাট আলোড়ন ভারতবর্ষের ভাগ্যকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করছে। অনেক কিছু ঘটেছে বা ঘটছে যা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু তা সত্বেও আমার মনে কোন দ্বিধা নাই যে ভারতবর্ষের ন্যায় কাশ্মীরেও জনমতেরই পরিনামে জয় হবে; এবং সেখ সাহেবের আদর্শেরও অনেকাংশে জয় হবে।

"গত কয়েক বৎসর ধরে কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ হওয়ার ফলে আমি কাশ্মীরের জনগণের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি এবং কাশ্মীরের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমার অন্তরের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছে। এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা আমার সঙ্গে কাশ্মীরবাসীদের এই নিবিড় যোগসূত্রকে আজ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে। তাদের উন্নতির কথা ও মঙ্গলের চিন্তা আমার মনে বিশেষ স্থান

অধিকার করে থাকবে। আমি জেনে খুবই দুঃখিত হলাম যে কাশ্মীরের রাজশক্তি সর্ব্বশক্তি নিয়ে এখনো দমননীতি প্রয়োগ করে চলেছেন; এবং কিছুদিন'হলো তাঁরা নির্মমভাবে পাইকারী জরিমানা আদায় করে চলেছেন।

"আমাদের পক্ষে সেখ সাহেবের সাহায্য ও পরামর্শ যখন সর্ববিষয়েই খুবই প্রয়োজন ঠিক তখনই সেখ সাহেব কারান্তরালে থাকবেন—এটা আমাকে খুবই দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও যে চিন্তা আমাকে পীড়া দিচ্ছে তা হ'লো এই যে আমি তাঁকে ও কাশ্মীরের জনসাধারণকে কোন কার্য্যকরী (effective) সাহায্য করতে পারি নাই। সকলেই আজ এক চরম নির্য্যাতন যন্ত্রের হাতে দুঃখ ভোগ করছেন। কিন্তু কোন সময়েই সেখ সাহেবের সাহস ও ত্যাগের বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয়ের লেশ মাত্রও সঞ্চার হয় নাই।" *

শেখ আবদুল্লার বিচার

পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের আবেদন-নিবেদনকে অগ্রাহ্য করে কাশ্মীর সরকার সেখ আবদুল্লার মুক্তি না দিয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিচারের আয়োজন করলেন। শ্রীনগরের সেসন জজ লালা বরকত রায়-এর এজলাসে ৩০শে জুলাই (১৯৪৬) বিচার সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। পণ্ডিত নেহরুর ইচ্ছামত মিঃ আসফ আলি (বর্ত্তমানে উড়িষ্যার গভর্ণর) সেখ আবদুল্লার পক্ষ সমর্থন করতে যান; এবং সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ, বিখ্যাত সাংবাদিক ও কমিউনিষ্ট নেতা মিঃ রজনী পাম দত্ত সেখ সাহেবের বিচারের সময় শ্রীনগরে যান। মৌলানা আজাদের পত্র পেয়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক—সর্দার প্যাটেল, মহাত্মা গান্ধী ও ভূপালের নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (৩-৪ঠা জুলাই) এবং সম্ভবত

* পিপলস্ এজ—২২শে জুন ১৯৪৭

আলোচনার মধ্য দিয়ে আপোষের স্বর্ণ-সূত্র আবিষ্কার হবার পর পণ্ডিত নেহরুকে কাশ্মীরে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়। ২৫শে জুলাই যখন বিচার পুনরায় আরম্ভ হয় তখন তিনি সদলবলে বিচার সভায় উপস্থিত হন। বিলাতের বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "ডেইলী ওয়ার্কারে" মিঃ পামি দত্ত কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে—"যদিও সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে আদালতের আধ মাইল পর্য্যন্ত এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছিল, তথাপি জনমত, এমনকি প্রহরী ও পুলিসের সমর্থনও যে সেখ আবদুল্লার পক্ষে তা প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের মধ্যে সেখ আবদুল্লাই মুকুটহীন রাজা।" সরকার পক্ষ থেকে সেখ সাহেবকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, এবং পুলিশ, গোয়েন্দা, মিলিটারী প্রভৃতির পক্ষ থেকে প্রায় ৩০জন সাক্ষী সেখ আবদুল্লা ও জাতীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয়।

রামচন্দ্র কাক জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দেবার জন্য এক দালাল হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও সেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য ব্যবস্থা করেন।

সরকার পক্ষের মুল অভিযোগ ব্যাখ্যা করে প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম আত্মীয় পণ্ডিত মধুসূদন কাক বলেন যে—সেখ আবদুল্লা ১০০ শত বৎসরের পুরাতন অমৃতসর চুক্তিকে অস্বীকার করে মহারাজ স্যার হরি সিং-কে উচ্ছেদ করবার জন্যই জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি শুধু চুক্তিকে অস্বীকার করতেই বলেন নাই, মহারাজাকে কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ করবার জন্যও বিদ্রোহের ধ্বনি তুলেছিলেন।

পণ্ডিত মধুসূদন কাক নজীর উল্লেখ ক'রে বলেন যে, কাশ্মীরের ওপর মহারাজার অধিকার অতিশয় ন্যায্য এবং ক্ষমতা (Sovereignty)

রাজ্য খরিদ করেও অধিকার করা যায়। তাঁর মতে মহারাজ গুলাব সিং শুধুমাত্র কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ নর-নারীকে খরিদই করেছিলেন না, তিনি কাশ্মীরের তদানীন্তন গভর্ণরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেও কাশ্মীরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, সেখ আবদুল্লা তাঁর "নয়া কাশ্মীরের" পরিকল্পনা মত আজ আর মহারাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার নিয়েই মাত্র সন্তুষ্ট নন। তিনি এখন তাঁর নূতন পরিকল্পনায় (যা তিনি ক্যাবিনেট মিশনের নিকট পেশ করেছিলেন) কাশ্মীরে চিরদিনের মত ডোগরা রাজের অবসান দাবী করেন; এবং তাঁর এই দাবী রাজ্যের আইন অনুযায়ী (রণবীর পেনাল কোড—১২৪-এ ধারা) রাজদ্রোহেরই নামান্তর।

মানুষের মত বাঁচবার দাবী মাত্র

অভিযোগের উত্তরে আদালতে সেখ সাহেব এক হাজার শব্দের একটি বিবৃতি দাখিল করেন। তাতে তিনি বলেন যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলে মনে করেন; এবং বলেন "আমি যা বলেছি বা লিখেছি,—তার মধ্য দিয়ে আমি এই সত্যকেই রূপ দিতে চেয়েছি যে সমাজ যেন শুধুমাত্র মানবিক অধিকার ও দায়িত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়।"

তিনদিন পর যখন তিনি পুনরায় বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হন (৩রা আগষ্ট ১৯৪৬) তখন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন:—"জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের মূল দাবী সম্পর্কে আমি যা বলেছি ও লিখেছি তা আমি গর্ব্বের সঙ্গে স্বীকার করছি। রাজদ্রোহের অভিযোগে আমার আজকের বিচারকে অমি শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত বিচার বলে মনে করি না। ইহা তার চেয়েও অনেক বেশী। কার্য্যতঃ এই বিচার দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত জনসাধারণকেই আজ বিচার করা হচ্ছে।"

ভারতবর্ষে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অবসানের যে ব্যবস্থা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন:—"ক্ষমতা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাচীন সনদ, সন্ধি ইত্যাদিরও অবসান হবে; এবং ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের আর না থাকায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে নূতন সম্পর্কের সূচনা হবে। ক্যাবিনেট মিশনের পরিষ্কার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যতঃ অমৃতসর চুক্তির অবসানের দাবীরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। 'কাশ্মীর ছাড়ো' ধ্বনি ইহারই প্রতীক এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজ যে শাসন যন্ত্রের অবসান হচ্ছে—এখানেও সেই প্রকৃতির সরকারের অবসানের দাবীর প্রতীক এই ধ্বনি। এই ধ্বনির মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের স্থান নেই।"

এই বিচারের যবনিকাপাত হয় ১০ই সেপ্টেম্বর। সেখ আবদুল্লাকে তিন দফায় তিন বৎসর হিসাবে ৯ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁকে ১৫ শত টাকা জরিমানাও করা হয়। কাশ্মীর রাজের দম্ভ অতি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই বিচারের মধ্য দিয়ে, নেতাদের অনুরোধ, গরম গরম বিবৃতি ও হুম্‌কিকে উপেক্ষা করে।

প্রিয় নেতার এই কারাদণ্ডের উত্তর দিল কাশ্মীরবাসী শ্রীনগর হরতাল করে, বে-আইনী ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং আন্দোলনের তীর্থস্থল খান্‌কা মহল্লায় আইন অমান্য করে সভা করে, এবং প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে ডোগরা রাজকে তারা কাশ্মীর ছাড়া করবেই। কাশ্মীর রাজের পুলিশ সৈন্য আবার সদলবলে পথে পথে সাজ সাজ রব করে বেরিয়ে পড়ে। গ্রেপ্তার, পুলিশ ও মিলিটারীর নির্য্যাতন আবার নূতন পর্য্যায়ে চলতে আরম্ভ করে। নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের অস্থায়ী সভাপতি বক্‌সী গোলাম মহম্মদ এক বিবৃতিতে রুদ্ধবাক্‌ কাশ্মীরবাসীর মর্ম্মবাণী ঘোষণা করলেন—"সেখ সাহেবের এই কারাদণ্ড সমস্ত কাশ্মীরবাসীর

প্রতি এক চ্যালেঞ্জ, তা তারা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করবে।”

পণ্ডিত নেহরু কিন্তু এই সংগ্রামী কাশ্মীরবাসীকে উপদেশ দিলেন সেখ সাহেবের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কাশ্মীর রাজ্যেরই উর্দ্ধতন বিচারালয়ে আপীল করতে।
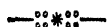
এগার

চক্রান্তের ইতিহাস

কাশ্মীরের মুক্তির জন্য যে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন জাতীয় সম্মেলনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল, কাশ্মীবের মহারাজ, তাঁর ব্রিটিশ পরামর্শদাতা ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতার প্রচার চালিয়ে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা বহু দিন আগে থেকেই করছিলেন। ১৯৩০ সালের গণ-আন্দোলনের সময়ও কাশ্মীর মহারাজার শাসক গোষ্ঠীর উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও ডোগরা রাজপুত কর্ম্মচারীর দল আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যেতে কীভাবে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজের "Inside Kashmir" পুস্তকের "Those memorable wecks" অধ্যায় থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। শুধু তাই নয় কর্ত্তৃপক্ষ সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে তদানীন্তন "মুসলিম কন্‌ফারেন্সে"র মধ্যে ভাঙ্গন ধরবার জন্য মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহ নামে এক স্বার্থান্ধ ধর্ম্মনেতাকে নিয়োগ করলেন, এবং প্রজা-শক্তির বিরুদ্ধে নেমকহারামীর জন্য তাকে বিশেষ জায়গীর দেওয়া হল। বর্ত্তমানে কাশ্মীরে এইরূপ জায়গীরদারের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার।

১৯৪৬ সালে যখন "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন আরম্ভ হয় তখনও এই পুরণো অস্ত্রই কাশ্মীর রাজ-সরকার দমন নীতির সঙ্গে প্রয়োগ করলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর ২৬ মে-র বিবৃতিতে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে—"A dangerous feature of the situation is the deliberate attempt to foment communal troublc." অর্থাৎ অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক পরিস্থিতি হলো যে, ইচ্ছা করে প্রজা

আন্দোলনের মধ্যে কাশ্মীর সরকারের সাম্প্রদায়িক কলহের উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭শে মে, ১৯৪৭)। কিন্তু এ-চেষ্টা কাশ্মীরের মহারাজা ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী কাক ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস থেকেই করে আসছেন। কোলাপুরের অধ্যাপক এন, এস ফাডকের লেখা "Birth-Pangs of New Kashmir" নামের পুস্তিকা (১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত) থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পুঞ্চের কতকগুলি এলাকায় বিক্ষোভ প্রথম দেখা দেয়; এবং এই বিক্ষোভের মূল কারণ ছিল জনসাধারণের বেকারী ও খাদ্য দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য। অধ্যাপক ফাডকে লিখেছেন যে, পুঞ্চের বাগ ও পালন্দ্রি এলাকায় প্রায় ৮০ হাজার কাশ্মীরী মুসলমান ২য় মহাযুদ্ধে বিভিন্ন কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধান্তে এরা সবাই বেকার হয়ে পড়েন, আর তাদের বেকারীর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও ঐ এলাকায় অসম্ভব রকমে বেড়ে যায়। এই বেকারীর দল যুদ্ধের যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা দিয়ে কোন রকমে কিছু দিন চালিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়লে ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে যখন সরকার তাদের ওপর নূতন করে নানা প্রকার ট্যাক্স বসাতে সুরু করলেন তখনই বিক্ষোভ স্পষ্টভাবে দানা বেঁধে ওঠে। কাশ্মীর সরকার যখন নূতন কর বসাতে লাগলেন তখন এতদঞ্চলে এক টাকায় তিন পোয়া গম বাজারে পাওয়া যেত। কিন্তু পুঞ্চের অপর পার্শে পশ্চিম পাকিস্থানে (মারি এলাকায়) এক টাকায় চার সের গম তখন বিক্রি হচ্ছিল। সামন্তরাজ-বিরোধী ক্ষুধিত জনগণ সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে সর্দ্দার কমল খাঁ (বর্ত্তমান "আজাদ কাশ্মীর" সরকারের প্রেসিডেন্ট সর্দ্দার ইব্রাহিমের কাকা) নামে এক ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে বিদ্রোহ করে এক "আজাদ" সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। কাশ্মীর সরকার প্রচণ্ড

হাতে এই "বিদ্রোহ"কে দমন করে সর্দ্দার কমল খাঁকে রাউলপিণ্ডিতে গ্রেপ্তার করে ত্রিশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।*

স্বয়ং সেখ আবতুল্লা এই পুঞ্চ বিদ্রোহ সম্বন্ধে বলেছেন : "কাশ্মীর রাজ-দরবারের অধীনে পুঞ্চ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। স্থানীয় শাসন কর্ত্তা ও কাশ্মীরের রাজ-দরবারের শাসনে ও শোষণে জর্জ্জরিত পুঞ্চের অধিবাসীরা তাদের অভাব-অভিযোগের অবসান দাবী করে এক গণ-আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। কাশ্মীর রাজ-দরবার এই গণ-আন্দোলনকে দমন করবার জন্য তার সাম্প্রদায়িক ডোগরা সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে; এবং তার ফলে পুঞ্চে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক দেখা দেয়।" (পিপলস্ এজ—২রা নভেম্বর ১৯৪৭)

এই বৎসরই দশহরা দিবসে বিদ্রোহের ফুলকি দেখে মহারাজা এক হুকুম জারি করেন যে, যার হাতে যত অস্ত্র শস্ত্র আছে তা সরকারের কাছে অবিলম্বে জমা দিতে হবে। এই আদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্যের বাইরে থেকে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের লোকদের কোন বিশেষ কাজের জন্য আনা হয়েছিল, তাদের হাতে এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র তুলে দেওয়া। কিন্তু জাতীয় সম্মেলন এর বিরোধিতা করে ঘোষণা করলেন যে, অস্ত্র-শস্ত্র যেন একমাত্র জাতীয় সম্মেলনের হাতেই অর্পণ করা হয়, এবং অধিকাংশ লোক জাতীয় সম্মেলনের কথামত কাজও করে। যদিও মহারাজার চাল ব্যর্থ হলো কিন্তু তাঁর ডোগরা সৈন্য বাহিনী যে অনেক রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জম্মুতে প্রতিশোধ মূলকভাবে মুসলমান হত্যা করেছিল একথা আজ সর্ব্বজন বিদিত। পরে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদামপুর, বিরিসী ও চেনানী

* সেখ আবতুল্লা শাসন ভার গ্রহণ করবার পর এঁকে মুক্তি দিয়েছেন।

অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। *

মহারাজার প্ররোচনায় এই সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের কথা মহাত্মা গান্ধীর কাছে পৌঁছবার পর তিনি তীব্রভাবে মহারাজার নিন্দা করেছিলেন এবং দোষীদের শাস্তির জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের কথাও বলেছিলেন।

পাকিস্থান থেকে জিন্না-পন্থীদের জাতীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচারের পথ এই ভাবেই মহারাজা ও তাঁর শাসক সম্প্রদায় ইচ্ছা করেই সুগম করে দেন। বাস্তবিক পক্ষে তাদের এই কাজ পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ও ষড়যন্ত্রকারী ব্রিটিশের উদ্দেশ্যকেই সফল করে।

"কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনের সময় প্রধান মন্ত্রী কাক হিন্দু ছাত্র ফেডারেশন নামে একটী ভূয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্রীজেন্দ্রনাথ নামে একজন দালাল দিয়ে সেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ান। তিনি বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের কর্মীরা ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজাকে সরিয়ে সেখ সাহেব মহারাজা হবেন এবং কাশ্মীরের উত্তরাধিকারীকে খড়ের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে! (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৩১-৭-৪৭)। কিন্তু এই আন্দোলনের সময় ছাত্র সম্প্রদায়ের যে গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে তা এই কুচক্রীর দল চেপে যান। তারা আরও চেপে যান যে, কাশ্মীর সরকার একমাত্র কাশ্মীর উপত্যকারই ছাত্রদের উপর ১৮০০০৲ টাকা জারিমানা করে তা আদায়ের জন্য অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। এমন কি কোন স্থলে যে এক একজন ছাত্রকে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়েছে—এই সত্যকেও এরা স্বীকার করেন না! (ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার বিবৃতি—অমৃত-বাজার পত্রিকা—২৩-৯-৪৭)।

পণ্ডিত নেহরু যখন আন্দোলনের সময় শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করেন

---

* Birth Pangs of New Kashmir, Pp. 11—12.

তখন রামচন্দ্র কাক কাশ্মীরী পণ্ডিতদের একদল দালালকে পণ্ডিতজীর পথরোধ করতে পাঠান। 'সনাতন ধর্ম ইয়ং মেনস এসোসিয়েশনের' নামে একটা দালাল প্রতিষ্ঠানকে খাড়া ক'রে তাদের দিয়ে গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মহারাজার প্রতি আনুগত্য জানিয়ে বিভিন্ন দরখাস্ত পণ্ডিতজীর কাছে পেশ করানো হয়। (ষ্টেট্সম্যান—২২-৬-৪৭)

পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে কোহালার উপকণ্ঠে যখন এরূপ একদল দালাল সাক্ষাৎ করে তাঁকে হিন্দু মহারাজার বিরুদ্ধে কিছু না বলতে ও সেখ সাহেবের আন্দোলনকে সমর্থন না করতে অনুরোধ করে তখন পণ্ডিতজী উত্তর দিয়েছিলেন—"বর্ত্তমান মহারাজার ন্যায় স্বৈরাচারী শাসকের আমলে এরূপ শত শত আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়তে বাধ্য।" (অমৃত বাজার পত্রিকা—২২-৬-৪৭)*

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও এ-সময়ে নিশ্চেষ্ট ছিল না। মিঃ জিন্না ও তাঁর অনুচর দলের নিকট জাতীয় সম্মেলন ছিল চক্ষুশূল। কাশ্মীরের ভেতরে মিঃ জিন্নার অনুচর ছিল "মুষ্টিমেয় মুসলিম কন্ফারেন্সের" উগ্র

* হিন্দু-মহাসভাপন্থীদের জঘন্য মনোবৃত্তি আরও প্রকাশ পায় নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য হিন্দু সভার সভাপতি শ্রীআনন্দ প্রিয় পণ্ডিত ও সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা কাশ্মীরের মহারাজার নিকট যে টেলিগ্রাম পাঠান তার মধ্য দিয়ে। এই টেলিগ্রামে তাঁরা বলেন "দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ছল করে হিন্দু শাসনের অবসানের জন্য মুসলমানেরা কাশ্মীরে যে দুরভিসন্ধিমূলক আন্দোলন চালাচ্ছে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। একান্ত সাম্প্রদায়িক এই পাকিস্তানী আন্দোলনকে কিছুতেই প্রজা আন্দোলন বলা চলে না। কাশ্মীর চিরদিন হিন্দু অধিপতির অধীনেই থাকুক।" (ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ প্রচারিত ২৫শে মে '৪৭-এর সংবাদ)

সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল। এরা ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা তো করেই নাই বরং "কুইট্ কাশ্মীর" আন্দোলনের সময় ডোগরা রাজের অত্যাচারের প্রতিবাদে কনফারেন্স যখন আইন-সভার নির্বাচন "বয়কট" করে, তখন প্রজা-শত্রু রামচন্দ্র কাকের সহায়তায় এরা নির্বাচনে সানন্দে যোগদান করে। যদিও ৬,৮৭,৪১৯ ভোটারের মধ্যে মাত্র ১,৮২৮ জন ভোট দেয়, তথাপি সেই সুযোগেই সর্দার ইব্রাহিম (বর্ত্তমানে "আজাদ কাশ্মীরের" নেতা) নির্বাচিত হন। কাশ্মীর সরকার ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের বিরোধিতা করার জন্য তাঁকে পাবলিক প্রসিকিউটারের পদে উন্নীত করেন। কাশ্মীরের শাসক চক্র এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্যই এই চক্রান্ত করেছিলেন।

"লাল জুজু"র জিগীর

এই আন্দোলনকে কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র বলে চালাবার ফন্দীও চলতে থাকে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন মহল থেকে। একটি অতি উৎসাহী ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দিল্লী থেকে ১২ই জুন (১৯৪৭) সংবাদ প্রচার করে যে এই বিদ্রোহ "রুশ প্ররোচিত" এবং একে কঠোর ভাবে দমন করবার কাজে কাশ্মীর সরকার নাকি দিল্লী ও লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলের সমর্থন পেয়েছেন। লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক "প্রতাপ" এক সংবাদ প্রচার করে যে কাশ্মীর সীমান্তে রুশ সৈন্য সমাবেশ করা হয়ে গেছে। এই রিপোর্টের প্রমাণ হিসাবে ভারত সরকারের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্মচারীর কথা উল্লেখ করা হয়। (১২ই জুন তারিখের ইউনাইটেড্ প্রেসের খবর) পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক আরও সুর চড়িয়ে চীৎকার সুরু করেন যে—"রাশিয়ার মুসলমান মোল্লারা শ্রীনগরের মসজিদে এসে নামাজ পড়তে সুরু করেছে।"

বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ রজনীপাম দত্ত যখন কাশ্মীরের গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সমস্ত সোভিয়েট-বিরোধী সংবাদ আধা সরকারীভাবে প্রচার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কি কোন প্রমাণ তাঁদের হাতে আছে ?

তিনি উত্তরে বলেন—না। *

ন্যাশনাল কনফারেন্সের অন্যতম নেতা বক্সী গোলাম মহম্মদ "Kashmir Through Many Eyes" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এই সব ষড় যন্ত্রের উত্তর দেন। তিনি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী পত্রিকার সংবাদ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে কাশ্মীরের মূল আন্দোলন থেকে জনমতকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার জন্য, এবং মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য পুরোপুরিভাবে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করবার কাজে পাবার জন্যই এই মিথ্যার অবতারণা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের একজন ফেরারী নেতার সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি যখন লাহোরে ২২শে জুন (১৯৪৭) সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি স্পষ্ট করেই বলেন যে—"আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সোভিয়েটকে তার এক নম্বর শত্রু মনে করে। সেই কারণেই এই অঞ্চলে নিজ আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য এবং সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবার জন্যই এই সব চাল।"

সোভিয়েটের কথা উল্লেখ করে তিনি দৃঢ় ভাষায় বলেন—"আমরা নিশ্চয়ই সোভিয়েটের কথা আমাদের বক্তৃতায় উল্লেখ করে থাকি। আমরা নিশ্চয়ই জনসাধারণকে বলে থাকি যে আমাদের পামির মালভূমির অপর পারেই এমন একটি দেশ আছে যেখানে জনসাধারণ মাত্র বিশ বৎসর পূর্বে

* লণ্ডনের ডেইলী ওয়ার্কার পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ সংবাদ দাতার ডেসপ্যাচ্ থেকে ইউনাইটেড প্রেসের ২৯শে জুলাই (১৯৪৭) এর সংবাদ।

আমাদের স্থায়ই অনুন্নত ছিল। কিন্তু আজ তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ও উন্নত নাগরিক, আর আমরা আজও মধ্যযুগের সামন্ত রাজেরই গোলাম। একে যদি আপনারা সোভিয়েট প্রভাব বলেন তবে আমরা নিরুপায়। কিন্তু কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েট চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করার একমাত্র অর্থ হলো, যারা আজ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রগতিশীল কাজের মধ্যে লাল জুজুর চেহারা দেখেন, তাদেরই স্বরে স্বর মেলানো।"

সর্বশেষে তিনি বলেন যে "যদিও কাশ্মীরের জনগণ শিক্ষায় পেছনে পড়ে আছে, কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে বিচার করলে ব্রিটিশ ভারতের অনেক প্রদেশকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গিয়েছি।"

সেখ সাহেব নিজেও গত ১০ই জানুয়ারী (১৯৪৮) এক প্রেস কনফারেন্সে এই ষড় যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—"কাশ্মীরের জাতীয় শক্তিকে দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে যেহেতু সেখ আবদুল্লা মুসলমান সুতরাং তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ব্রিটিশ বেতার ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে সেখ আবদুল্লা কমিউনিষ্ট, এবং সোভিয়েট কাশ্মীর-কে দখল করে ভারতবর্ষ আক্রমন করবে—ইত্যাদি। প্রকৃত ঘটনা এই যে কাশ্মীর কমিউনিস্টও নয়, সাম্প্রদায়িকতাবাদীও নয়—সে ভারতের সাহায্যে ও ভারতের ঐক্যে বিশ্বাসী।"

সেখ আবদুল্লা যে কমিউনিষ্ট নহেন একথা সবাই জানে। তিনি নিজেই একে "হাস্যকর" বলেছেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলন ভারতবর্ষের লীগ ও কংগ্রেসের আন্দোলনের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যে নূতন পথে চলেছিল তার মধ্যে যে সোভিয়েটের আদর্শের প্রভাব অনেকাংশে ছিল তাকি অস্বীকার করা যায়? "নিউ কাশ্মীর" বা "নয়া কাশ্মীর" পুস্তিকার মুখবন্ধে তিনি নিজেই লিখেছিলেন—"আমাদের যুগে সোভিয়েট রাশিয়া কেবল তত্ত্বের দিক হতেই নয় বাস্তব ক্ষেত্রেও তার জনগণের

দৈনন্দিন জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নতির ভেতর দিয়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গর্ভেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা জন্মলাভ করতে পারে। সোভিয়েট দেশের যে চিত্র আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সত্যই উৎসাহজনক—বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে, জাতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও যে অপূর্ব সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা একটি মহান রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে—তাতে এই কথায়ই নিঃসংশয়ে প্রমানিত হয়েছে যে একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্যের উপরই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এইরূপ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কল্পনাই কাশ্মীরের ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের দৃষ্টির সম্মুখেও রয়েছে।"

এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি লিখেছিলেন যে—"সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং নিম্নশ্রেণীর ওপর তাদের অত্যাচার সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হয় নাই বলেই আদর্শও বাস্তবে রূপান্তরিত হয় নাই। স্বাধীনতা এবং শ্রেণীস্বার্থ যেন একই দাড়িপাল্লার দুটী পাল্লা—একদিকে শ্রেণীস্বার্থ ওজনে যতই কম হতে থাকবে অপর পাল্লায় স্বাধীনতার ওজন ততই বাড়তে থাকবে।"

কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের সম্মুখে দেশী শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের গণতন্ত্র বিরোধী নগ্নরূপ প্রকাশ পেতে থাকে তাদের উপরোক্ত অত্যাচার ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে; এবং তারা এই মুক্তি আন্দোলনকে কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের অজুহাত দিয়ে পিষে মারবার জন্য যে সকল রকম চেষ্টা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

আপোষ নয় আঘাত

১৯৪৭ সালের মে মাসে তদানিন্তন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনি সস্ত্রীক কাশ্মীরে যান। প্রায় একবৎসর আগে মীরাট কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, যেহেতু প্রজারা এখনো দেশীয় রাজ্যের

শাসকদের "ভক্তি শ্রদ্ধা" করে থাকে সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক শাসক হয়ে তাঁরা রাজত্ব করতে পারেন। কাশ্মীরের শাসন কর্তা সম্বন্ধে কিছুদিন পরে তিনি স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেন যে "কাশ্মীরের শাসন কর্তার বিরুদ্ধে আমরা নই" (ফ্রী প্রেস জার্নাল—২৩-৬-৪৭) শুধু তাই নয় "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনকেও তিনি অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনকে দমন করবার জন্য রামচন্দ্র কাক জনসাধারণের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন তার জন্য নাকি তাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি তাঁর কর্ত্তব্য কাজ করেছিলেন মাত্র! কাশ্মীরে কয়েকদিন অবস্থান ও বক্তৃতাদি থেকে তাঁর এই আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য যে কি তা রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পরে। কাশ্মীরের মহারাজও তাঁর আগমনের কারণ বেশ অনুমান করেই শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনির মারফৎ কংগ্রেসের জন্য কয়েক হাজার টাকার চেক দান করেন। কাশ্মীরে কৃপালনিজীর ঐরূপ বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনা সংবাদ-পত্র মহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বোম্বাইর ফ্রীপ্রেস জার্নাল, খোলাখুলি ভাবেই এবিষয়ে মত প্রকাশ করে বলে যে তাঁর এইসব মন্তব্য আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই অসম্মান জনক। এই পত্রিকাটি আরও বলে যে ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে এই জন্য যে সে ভারতে শাসনের নামে কুশাসন করেছে। কাশ্মীরের মহারাজাকেও ঠিক সেই কারণেই কাশ্মীর ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আজ যদি মহারাজা ও তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে সব দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তবে এইসব অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য দায়ী কে? (২৬শে মে তারিখের সম্পাদকীয়-১৯৪৭)

শেখ আবদুল্লা তখন কারান্তরালে। তিনি এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে কাশ্মীরের মুক্তিকামী জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক কর্মপন্থার নির্দেশ

দেন। তিনি কারান্তরাল থেকে ঘোষণা করেন—"আমাদের শেষ পর্য্যন্ত লড়তে হবে। আমি পূর্বে যা বলেছিলাম এখনো তাই বলছি, তা এই যে মহারাজা হরি সিং-এর আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবার কোন নৈতিক অধিকার নেই এবং আমরা যখন যেভাবে সম্ভব তখনই তাঁর এই অধিকারের বিরুদ্ধতা করবো। ভারতবর্ষ হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতা আপনা আপনিই জনগণের হাতে এসে পড়বে। কাশ্মীরের মহারাজাকে এই জনগণের সঙ্গেই বোঝা-পড়া করতে হবে। আমরা যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে না পারি তবে চিরদিনের মত ধ্বংস হয়ে যাবো।"

তিনি আরও বলেন "মহারাজা কর্তৃক জনসাধারণের দাবী স্বীকার ক'রে নেবার ভিত্তিতেই নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভব—অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ হয় তিনি মেনে নিন অথবা জনগণের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করুন। একদিকে জনসাধারণ, অন্যদিকে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক—তাঁকে এই দু'পক্ষের একটীকে বেছে নিতে হবে।"

সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি ঘোষণা করেন—"প্রতিক্রিয়ার এবং বর্বরতার এই দুর্গের ওপরে শেষ এবং চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হোন, এবং বিশ্বাস রাখুন যে শেষ পর্য্যন্ত আমরাই জয়ী হবো।"

কাশ্মীরের গণআন্দোলনের অন্যতম নেতা গোলাম মহিউদ্দীন আলিগড়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি এই সময় লিখেছিলেন তাতেও তিনি এই প্রতিজ্ঞার কথাই ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেছিলেন—"আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমরা এগিয়ে যাবো। আমাদের জনসাধারণ ও সংগঠনের ওপর আছে বিপুল আস্থা। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন কাশ্মীর—এই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মদানের বেদীমূলে আমাদের যাত্রা থেমে থাকবে না।"

তিনি আরও বলেন যে—"আমাদের এই সংগ্রাম ভারতবর্ষের কাছে দৃষ্টান্ত রেখে যাবে। নূতন কাশ্মীরের পথে আমরা চলেছি, একমাত্র "নূতন কাশ্মীরে" গিয়েই আমরা থামবো।"

গান্ধীজীর নির্দেশ

ভারতের তথা কাশ্মীরের এই সংকটময় মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরে এসে ঘোষণা করলেন যে তিনি সংগ্রামী জনতার পক্ষে। ১৯৪৬ সালে "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনের সময় তিনি কাশ্মীরে যেতে পারেন নি, ১৯৪৭ সালের ১লা আগষ্ট তিনি কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হলেন। কাশ্মীরের জনগণ যে অভ্যর্থনা গান্ধীজীকে দেয় তা অপূর্ব। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে কোহালা থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত, ১৪০ মাইল পথ কাশ্মীরী জনতা রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে "ডোগরা রাজ কাশ্মীর ছাড়ো" ও "বাবা আবদুল্লা জিন্দাবাদ"—এই সংগ্রামী ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করে। গান্ধীজীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজা গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। জাতীয় সম্মেলনের গাড়ীতে এসে তিনি বেগম আবদুল্লা ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের অতিথি বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। এই ভাবেই তিনি আসলেন শ্রীনগরে মহারাজার ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করে।

প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলেন যে লোকে মিথ্যাই তাঁর নামে দুর্ণাম ও অত্যাচারের কথা রটনা করছে! তিনি নাকি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই এই সব কাজ করেছিলেন!

গান্ধীজী ধীর স্থির ভাবে উত্তর দিলেন যে তাঁর কথা তিনি অবিশ্বাস করেন না; কিন্তু দল, শ্রেণী, ও মত নির্বিশেষে সকল নর-নারীই বলছে যে "আপনি অসৎ প্রকৃতির লোক। আপনি এদের মতামত আপনার স্বপক্ষে আনুন। তারা যদি বলে যে আপনি ভাল লোক তাহ'লে আপনি আ

বললেও আমি বিশ্বাস করবো যে আপনি সৎপ্রকৃতির লোক ”

কাক উত্তরে বলেন—“আমি এদের শুভেচ্ছা পাবার জন্য যথেষ্ট করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মত বদলায় নাই। আমি আর কি করতে পারি!”

“তাহলে আপনার কার্য পদ্ধতি ও ব্যবহার রীতির পরিবর্ত্তন করুন। জনসাধারণের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন এবং রাজ্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে গণভোট নিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করুন।”—গান্ধীজী বললেন।

প্রশ্নের কোন সদুত্তর না দিতে পেরে প্রধান মন্ত্রী নীরবে অপরাধীর ন্যায় স্থান ত্যাগ করেন।

পরদিন অর্থাৎ ২রা আগষ্ট রামচন্দ্র কাক মহারাজার সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ করবার প্রস্তাব নিয়ে আবার উপস্থিত হ'লে গান্ধীজী বললেন যে তিনি এখানে রাজা-মহারাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন নি। তিনি এখানে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও বেগম আবদুল্লার অতিথি এবং নির্য্যাতিত জনসাধারণকে দেখতেই এসেছেন। তবে যদি মহারাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তিনি সাক্ষাৎ করতে রাজী আছেন।

রাজপ্রাসাদে মহারাজা গান্ধীজীকে খাবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি উত্তর করেন—

“আপনার ওপর আপনার সমস্ত প্রজা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা আপনাকে গ্রহণ না করছে, ততদিন পর্যন্ত আমি আপনার দেওয়া কোন কিছু গ্রহণ করতে পারবো না। আগে আপনার প্রজাদের মনোমালিন্য দূর করুন।”

তখন মহারাজা সেখ সাহেব ও তার আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলতে আরম্ভ করলে গান্ধীজী প্রশ্ন করেন: “আপনার রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা কত?”

মহারাজা—“দশ হাজার।”

গান্ধীজী—“কতজন এর মধ্যে কাশ্মীরী?”

মহারাজা—"প্রায় একজনও নাই।"

গান্ধীজী—"তা-হ'লে সেখ সাহেব যা বলেন তা ঠিকই। আপনি বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে আপনার প্রজা সাধারণের ওপর শাসন করে থাকেন। কারণ আপনি আপনার প্রজা সাধারণকে ভয় পান।"

প্রকাশ যে মহারাজা "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনকে বিকৃত করে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে বলতে সুরু করলে গান্ধীজী বলেন "যদি আপনার প্রজাবৃন্দ আপনাকে চায় তবে আমি বলি না যে আপনি কাশ্মীর ত্যাগ করুন।"

অমৃতসর চুক্তির কথা মহারাজা উল্লেখ করতেই গান্ধীজী উত্তর করেন—"তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল এবং আপনার পূর্ব্ব পুরুষ গুলাব সিংহের মধ্যে ইহা একটী চুক্তি মাত্র! ১৫ই আগষ্টের পর এর আর কোন মূল্যই থাকবে না।"

মহারাজা প্রমাদ গণলেন। গান্ধীজীর এই আগমন গণআন্দোলনকে আরও এক কদম এগিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু গান্ধীজীই কেবল কাশ্মীরের গণআন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করেন নি, কাশ্মীরের গণআন্দোলনও গান্ধীজীকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করবার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঐক্যের শক্তিকে ডাক দিয়ে যিনি একদিন বলেছিলেন—ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করবার আগে তাঁকে যেন আগে দ্বিখণ্ডিত করা হয়—তাঁরই সম্মুখে ভারতবর্ষ যখন হতে চলল্ দ্বিখণ্ডিত তখন সেই খণ্ডিত ভারতবর্ষের সম্ভাবনার সম্মুখে তিনি সংগ্রামী কাশ্মীরের এই ঐক্যবদ্ধ মূর্তি দেখতে পেয়ে দিল্লীতে ফিরে এসেই ঘোষণা করেন—"কাশ্মীরের অধিবাসীদের মনে সেখ সাহেব স্বদেশ প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছেন। কাশ্মীরীদের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি; এবং আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি তারা একই জাতি। কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমান্ জন-সাধারণের মধ্যে আমি কোন্ তফাৎ দেখতে পাই নি। আমি অতিশয়

নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে কাশ্মীরীদের ইচ্ছাই কাশ্মীরের একমাত্র আইন হওয়া উচিত।"

গান্ধীজীর আগমনে কাশ্মীরের গণআন্দোলনে এল নূতন জোয়ার। মহারাজা আন্দোলনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য ১১ই আগষ্ট তার কুখ্যাত প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাককে বরখাস্ত করে জনপ্রিয় হবার চাল চাললেন। নিজের শাসন ও শোষণের কাঠামোকে বজায় রাখবার জন্য প্রজা-আন্দোলন দমনের কাজে যে রামচন্দ্র কাককে ১৯৪৬ সালে "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনের সময় কাজে লাগিয়েছিলেন, আজকের নূতন পট-ভূমিকায় তাঁকেই আবার কাজে লাগালেন নিজের গদী বজায় রাখবার জন্য।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েও পূর্ণ স্বাধীনতার পথে আরও এক কদম এগোলো। দেশময় জনতার মর্মভেদী হাসিকান্না ও সাম্প্রদায়িক প্রেতের তাণ্ডবের মধ্যে কাশ্মীরের গণআন্দোলনের সৈনিক সজাগ প্রহরীর ন্যায় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—সাম্রাজ্যবাদ খবরদার, ডোগরারাজ খবরদার, কাশ্মীরের মাটি থেকে তফাৎ থাকো। এই নূতন কাশ্মীরের জনসাধারণের সম্মুখে মহারাজা মচকালেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর সেখ আবদুল্লা ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেরারী নেতাদের বিরুদ্ধে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল তাও উঠিয়ে নেওয়া হলো। কাশ্মীরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠ্‌লো—"ডোগরা রাজ মুর্দ্দাবাদ" "ন্যাশনাল কনফারেন্স জিন্দাবাদ" "সেখ আবদুল্লা জিন্দাবাদ।"

কাশ্মীরে জাতীয়তার এই জয় মহারাজা ছাড়া আর একজনের মনেও কাঁটার মত রিঁধ্‌লো। তিনি হলেন—মিঃ জিন্না। তিনি এতে বিব্রত হয়ে অভিযোগ করে মহারাজাকে এক পত্র লেখেন।

—::*::—

বার

চক্রান্তের আর এক দিক

"দুশমন আগয়া"—অর্থাৎ শত্রু এসে গেছে !!

কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গম স্থল ডোমেলের ডাক-বাংলায় কাশ্মীর রাজ-সরকারের উচ্চপদস্থ এক নিদ্রিত রাজ কর্মচারীর সুখ-নিদ্রা, ১৯৪৬ সালের ২২শে অক্টোবরের ভোর বেলায় প্রাণ ভয়ে ভীত ভৃত্যের চীৎকারে ভেঙে যায়।

কে এই শত্রু ? কোথা থেকে তারা আসছে ? তবে কি পাকিস্তানই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে; অথবা ইংরেজ আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে পলাশীর প্রান্তরে যেমন শান্তির নাম করে অতর্কিতে মীর মদন ও মোহন-লালের ফৌজকে আক্রমণ করে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, তেমনি স্বাধীনতা দেবার নাম ক'রে ভারতবর্ষকে আবার কবলিত করবার জন্য অতর্কিতে আক্রমণ করেছে ? কোন সিদ্ধান্ত করবার আগেই বাইরে এসেই তিনি দেখতে পেলেন সামান্য দূরে গ্রামখানি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, মানুষ প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ পালাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু আক্রমণকারী বিরাট জনস্রোতের মধ্যে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। হরি সিং-এর প্রভুত্বের প্রতীক ডোগরা গ্যারিসনটী আক্রান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হচ্ছে !

*　　*　　*　　*

তার দু'দিন পরের কথা। মর্তের অমরাবতী কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমান-শিখ জনসাধারণ ডোগরা রাজের কারাগার হ'তে ষোল মাস পরে সদ্যমুক্ত সেখ আবদুল্লার ডাকে পবিত্র ঈদ ও দশহারা উৎসব পালন

করছে। মহারাজা অবশ্য সাধারণ কাশ্মীরীদের সংস্পর্শে আসেন না। তাই কিছু সংখ্যক মো-সাহেবের দলকে আমন্ত্রণ ক'রে জাক-জমক সহকারে শ্রীনগরের প্রশস্ত চাঁদমারী বিলাস উদ্যানে দরবার বসিয়েছেন মহারাজা স্যার হরি সিং গৌর। সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকময় হয়ে উঠল এই রাজ-সভা। আর অল্পক্ষণ সময়ের মধ্যেই মহারাজা প্রাসাদ থেকে এসে "বাণী" দেবেন তার দীন-দরিদ্র প্রজাদের উদ্দেশ্যে—যাদের তিনিই শোষণ করছেন। কিন্তু হঠাৎ কী হলো, সভার সমস্ত জাক জমক ম্লান করে দিয়ে শ্রীনগরের বৈদ্যুতিক আলো নিভে গেল। শ্রীনগরে যেন নেমে এলো দুর্যোগের কালো রাত্রি।

* * * *

সেই রাত্রির অন্ধকারে শ্রীনগরে ভেঙ্গে পড়ল মহারাজার শাসনের ঠাট্। ডোগরা ও ব্রিটীশ বাহিনীর সহায়তায় যে মহারাজা কাশ্মীরের নর-নারীকে করে এসেছেন শাসন অর্থাৎ ব্রিটীশের খবরদারী, সেই মহারাজা কাশ্মীরবাসির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে জনসাধারণকে শত্রুর মুখে ফেলে রেখে কাপুরুষের মত সেই রাত্রেই শ্রীনগর ত্যাগ করে জম্মুতে পালিয়ে যান; যাবার সময় ডোগরা সৈন্যের পাহারাধীনে ৩০০ শত মোটর লরীতে করে রাজপ্রাসাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে তিনি ভোলেন নি। এদিকে মহারাজার মূল্যবান সম্পত্তি পাহাড়া দেবার জন্য যখন ডোগরা বাহিনীকে নিয়োগ করা হ'লো তখন শ্রীনগরে শাসন ব্যবস্থার কোন অস্তিত্বই নাই। শুধু তাই নয় শত্রুর গুপ্তচর রাস্তায় মিথ্যা আতঙ্কজনক প্রচার চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে আতঙ্ক ও শত্রুর বিভীষিকা। শতাব্দীর অভিশাপ বহন করে কাশ্মীর আবার তবেকি সেই বর্বরতার যুগে চলে পড়বে? তার মুক্তি আন্দোলনের কি এমনিভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটবে?

এর উত্তর দিয়েছিল জাগ্রত কাশ্মীরের শত সহস্র সাধারণ মানুষ, যারা ডোগরা রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে গৌরব অর্জ্জন করেছে। সেই তিমিরাচ্ছন্ন বিভীষিকাময়ী রাত্রির সঙ্কটময় মুহূর্তে পলায়নপর মহারাজার শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা ক'রে দেশ রক্ষা করবার জন্য পথে নেমে এল অটুট মনোবল নিয়ে কাশ্মীরের জাতীয় রক্ষী বাহিনী। "হাম্‌লাদার খবরদার হাম কাশ্মীরী হ্যায় তৈয়ার" এই ছিল তাদের রণধ্বনি।

ভারত বিভাগের সুযোগে

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ইংরেজ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতবাসীদের নিকট ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও বিনিময়ে ভারতবর্ষময় সাম্প্রদায়িকতার আগুন জালিয়ে অমাদের ষাট বৎসরের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়ে দেশকে ভাগ করে দিতে সমর্থ হয়, এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের আদর্শকে আঘাত করে দুটি নূতন রাষ্ট্রের ওপর সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলিকে পুরোপুরি উস্কানি দিয়ে দুটী রাষ্ট্রকেই করে তোলে পরস্পরের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন। তাতে ইন্ধন জোগাবার জন্য সামরিক ও অসামরিক ইংরেজ কর্মচারী রয়ে যায় পঞ্চম বাহিনীর কাজ করবার জন্য। ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায় দেশীয় রাজ্যগুলি ও পাকিস্তান। ভারতের অভ্যন্তরেও এদের ষড়যন্ত্র চলে।

১৫ই আগষ্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমস্ত চুক্তি ও সনদের অবসান হলেও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো না। মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা অনুসারে দেশীয় নৃপতিবর্গকে দুটী ডোমিনিয়নের মধ্যে যে কোন একটীর সঙ্গে নূতন সম্পর্কের জন্য সুবিধা বুঝে চুক্তি করবার ইঙ্গিত দেওয়া হলো। ফলে রাজন্যবর্গ তাদের সিংহাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবার সুবিধা আদায় করবার

জন্য ডমিনিয়ন সরকারদ্বয়ের সঙ্গে দর কশাকশি ও ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করলেন। এমন কি এদের মধ্যে প্রধান দেশীয় রাজ্যগুলি "স্বাধীন" হবার দুঃস্বপ্নও দেখতে লাগলেন। এদের মধ্যে হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর ও রাজপুতনার রাজন্যবর্গ প্রধান। হায়দরাবাদে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীলদের পরামর্শ দেবার জন্য রইল ঝানু ইংরেজ কর্মচারী স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন, ত্রিবাঙ্কুরে স্যার রামস্বামী আয়ার আর কাশ্মীরে রইলেন কুখ্যাত রামচন্দ্র কাক, ও তাঁর ইউরোপীয়ান স্ত্রী, কাশ্মীরের চীফ-অব-মিলিটারী ষ্টাফ্ কর্ণেল স্কট, (ব্রিটিশ) ও পুলিশ-প্রধান মিঃ পাওয়েল (ব্রিটিশ) কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের সময়ই এদের স্বরূপ আমরা দেখেছি। তা ছাড়া কাকের পর কাশ্মীরের যিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম ইংরেজভক্ত বিচারপতি মেহের চাঁদ মহাজন। তিনি শাসন ভার গ্রহন করেই ঘোষণা করলেন "কংগ্রেসের আওতায় স্বায়ত্ত শাসনের নমুনা দেখে আমি নিরাশ হয়েছি। কাশ্মীরে এরূপ আমি কিছুতেই হতে দেব না। কাশ্মীরীরা এখনও স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত হয় নি।"

১৫ই আগষ্টের ভারত বিভাগের পর পাঞ্জাব যখন জ্বলছে কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। প্রথমতঃ কাশ্মীর মুসলমান প্রধান রাজ্য, দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছে তাকে, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় ধ্বংস করে ফেলতে পারলেই "দুই জাতি" থিওরীর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হবে ও সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটানো যাবে।

কাশ্মীরের শাসকচক্রের দৃষ্টিও ভারতবর্ষের চেয়ে পাকিস্তানের ওপরেই নিবদ্ধ হলো, কারণ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নার কাছ থেকে রাজন্যবর্গ পেলেন তাদের রাজ্যের অবাধ শোষণের ও শাসনের "স্বাধীনতা"র

আশ্বাস। কাজেই কাশ্মীরের রামচন্দ্র কাক ও তার ন্যায় অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলপন্থীরা দেখলেন যে পাকিস্তানে কাশ্মীরকে নিতে পারলে সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে যে আন্দোলন জেগে উঠেছে তাকে ধ্বংস করা যাবে ও মহারাজার আওতায় তাদের অবাধ শাসন ও শোষণ নির্বিবাদে চলবে। মিঃ জিন্না এই শক্তিকেই উস্কানি দিয়ে বললেন যে কাশ্মীর প্রমুখ দেশীয় রাজ্যগুলি ইংরেজ চলে যাবার পর "স্বাধীন" হবে। ("ডন" পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮-ই জুনের বিবৃতি)। সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসও দিলেন যে রাজ্যের অভ্যন্তরে গণ-আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন।

সেখ আবদুল্লা ও জাতীয় সম্মেলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কারান্তরাল থেকে বার হবার আগেই কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তানের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি সই করে ফেললেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই চুক্তিতেই আবদ্ধ হতে তিনি ও তার মন্ত্রনাদাতারা টাল বাহানা করতে থাকেন। তাঁরা জিদ করেন যে একমাত্র তাদের নিজেদের সর্তেই ভারতবর্ষের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন।

ন্যাশনাল কনফারেন্সের হাতে শাসন ভার তুলে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যের শাসন সংস্কারের কোন কথাই মহারাজা বা তার প্রধান মন্ত্রী কানে তুললেন না।

সেখ আবদুল্লা মুক্তির পর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে আসলেন দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর বৈঠকে যোগ দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু ও গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য। কারণ চারদিকের উত্তেজনাকর অবস্থা দেখে তিনি মুক্তির অব্যবহিত পরেই ঘোষণা করেছিলেন যে—কাশ্মীরের পক্ষে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ৪০ লক্ষ নরনারীর, ডোগরারাজের অত্যাচারী শাসনের হাত থেকে মুক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা গোলাম হয়ে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন ডোমি-

নিয়নে যোগ দেবে তা কি করে বলতে পারে ? একমাত্র স্বাধীন ভাবেই তারা এ কথা ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করতে পারে। তিনি উভয় ডমিনিয়নের কাছে এ বিষয়ে সহায়তা করবার জন্য আবেদন করলেন।

ভারত ডমিনিয়নের নেতারা ইতি মধ্যেই ঘোষণা করলেন যে দেশীয় রাজ্যের ডমিনিয়নে যোগদানের ব্যাপারে জনগণের গণতান্ত্রিক মতামতই চূড়ান্ত।

সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রদায়িকতাবাদী চক্রান্ত

ধর্মের উন্মাদনা যাদের আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি তাদের পক্ষে এই বিষয়ে গণতান্ত্রিক আলোচনার অবকাশ কোথায় ? কাজেই পাকিস্তানের লীগের উগ্রপন্থী নেতারা কাশ্মীরকে জোর করেই পাকিস্তানে নেবার পথ প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। প্রথমত কাশ্মীরে অর্থনৈতিক অবরোধ করে তার অত্যাবশ্যকীয় গম, পেট্রল, লবণ, কাপড় ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানে আটক করা হয়; দ্বিতীয়ত ভারত বিভাগের পর থেকে জম্মু সীমান্ত ধরে পাকিস্তানের এলাকা থেকে অতর্কিতে হানা দিয়ে, নরহত্যা ও লুণ্ঠন চলতে থাকে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রায় ১০০টী এরূপ ছোট খাট আক্রমণ হয়। ঠিক এর সঙ্গেই চলে পাকিস্তান বেতার ও পত্রিকা মারফৎ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা।

পেশোয়ারে এই সময়ে গোপন চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য। সীমান্তের উপজাতীয় দলের কয়েকজন কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক নেতার সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী আবদুল কোয়ায়ুম খাঁর হয় গোপন সলা-পরামর্শ। কাশ্মীরের প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধান সামরিক কর্মচারী কর্নেল স্কট, ও মিঃ পাওয়েল আগে থেকেই কাশ্মীরের মানচিত্র ইত্যাদি নিয়ে পাকিস্তানে যেয়ে আস্তানা করে বসেছিলেন। এ ছাড়াও ভোপালের রৌশনদীন নামে একজন লীগ নেতার সহায়তায়

ইংলণ্ডে বসে পূর্বাহ্নেই চেশায়ারের নরম্যান এফ্ কিংহ্যাম নামের একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার কাশ্মীরের পথ ঘাট ইত্যাদির নক্সা তৈরী করে রেখেছিলেন বোধ হয় আক্রমণের প্ল্যান যাতে নিখুঁত হয় তার জন্য।

মিঃ মেহেরচাঁদ মহাজনের ১৪ই নভেম্বরের (১৯৪৭) এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে কাশ্মীরে লীগের মত অনুসারে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয় প্রথমে লণ্ডনে। এই প্ল্যান পরে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছু আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এবং এই প্ল্যানটী নাকি এমন নিঁখুত ভাবে করা হয়েছিল যে, কাশ্মীর অভিযান আরম্ভ হলে—আক্রমণকারী পক্ষের নেতারা কে কোন স্থানে বসবাস করবেন তার তালিকা পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গোপন দলিল কাশ্মীর সরকারের একজন মুসলমান কর্মচারীর নিকট পূর্বাহ্নে ধরা পড়ে (ষ্টেট্সম্যান-১৭-১১-৪৭)। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ আরম্ভ হবার মুখেই যখন ষড়যন্ত্রের কথা শ্রীনগরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাক সপরিবারে বিমানযোগে লণ্ডনে পালিয়ে যাবার সময়ে বিমানঘাঁটিতে গ্রেপ্তার হন। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কর্মচারীকে বরখাস্ত ও নজরবন্দী করা হয়।

জম্মু সীমান্তে যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে গজনীর লাল মীর নামে একজন আফগান ধরা পড়েন। তাঁর জবানবন্দী হতে জানা যায় যে, ওয়াজিরীস্থানের একজন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার কাশ্মীরে "কাফের"দের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য প্রচার কার্য চালান ও "সৈন্য" সংগ্রহের কাজে উপজাতি মালিকদের সঙ্গে কাজ করেন। মান্‌কি শরিফের পীর, সোয়াতের ওয়ালী, উনাউ-এর পীর, চিত্রলের ও পুঞ্চের শাসনকর্তা—ক্রমে ক্রমে সকলেই এই অভিযানের চক্রান্তে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সব ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে,

সীমান্তের গভর্নর ক্যানিংহাম ভারতবর্ষে তাঁর বন্ধু ভারতের প্রধান সেনা-পতি রব লকহার্টের কাছে এক গোপন পত্রে এই আক্রমণের উদ্যোগের কথা নাকি জানান। রব লকহার্ট এই পত্রখানি ভারত সরকারের হাতে না দিয়ে নষ্ট করে ফেলে বিলাত চলে যান। এখানে বলা যেতে পারে যে এই লকহার্টই সীমান্তে গণভোটের সময় গভর্নর ছিলেন, এবং তাঁর লীগ প্রীতির খ্যাতি আছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে বোম্বাই-এর 'ব্লিংস' পত্রিকার ৩১শে জুলাই-এর (১৯৪৮) একটি সংবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বলা হয়, "মিঃ ক্যানিংহাম হানাদারদের সীমান্ত প্রদেশে কাশ্মীর আক্রমণ করবার জন্য হানাদার সমা-বেশের সাহায্য করেছিলেন, মিঃ মুদি (পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর) তাদেরই সাহায্যের জন্য ব্যস্ত, পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রেসী, চিফ অব মিলিটারী ষ্টাফ্ জেঃ ম্যাকে কাশ্মীর-পাঞ্জাব সীমান্ত ঘুরে আক্রমণের উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আর ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের মারফত হানাদারদের কার্যের প্রচার চালান ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার।"

হানাদার বাহিনীর জন্য কীভাবে সৈন্য সংগ্রহ চলতে থাকে সে সম্বন্ধে লাল মীর স্বীকারোক্তিতে বলেন যে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য রাজা জহীর শাহ আফগানিস্থানের অধি-বাসীদের ভারতবর্ষে না যাবার জন্য এক আদেশ জারি করা সত্ত্বেও কয়েকজন ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার ও উপজাতীয় নেতা কাশ্মীরে মুসলমানদের ওপর "কাফেরদে"র অত্যাচারের বিভিন্ন বিবরণ দিয়ে তাদের উত্তেজিত করেন। এইরূপ ভাবে তাদের দলেই প্রায় একহাজার লোক সংগ্রহ হয়। তারপর পাকিস্তানের লীগ নেতাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ করে দেবার জন্য পশ্চিম পাঞ্জাবের খোসাবে নিয়ে আসা হয়। এখানে উনাউ ও অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলের পীর, এদের "ইসলামের নামে" কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করবার জন্য আবেদন করেন।

সীমান্ত প্রদেশের ওয়াজিরীস্থানে কীভাবে এদের সুসজ্জিত করা হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার কনেষ্টবুলারী'র অফিসারেরা উপস্থিত থেকে, এখানে অস্ত্র-শস্ত্র বিলি করেন; এবং তাদের গোলাবারুদ খাদ্য ও যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থা করেন ওয়াজিরাবাদ ক্যাম্পের পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের অফিসারেরা।

বারমুলায় ধৃত বন্দীদের জবানবন্দীতেও স্বীকারোক্তি আছে যে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী আবদুল কোয়ায়ুম খাঁ লোক সংগ্রহ করেন এই বলে যে, কাফেরদের হাত থেকে কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্য এরূপ জেহাদের প্রয়োজন আছে। আরও প্রকাশ যে তাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি দেওয়া হয় রাউলপিণ্ডিতে, এবং তারপর মোটর লরীতে ভর্তি করে শ্রীনগরের পথে এইসব "সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী" পাঠানো হতে থাকে দলে দলে। এদের মধ্যে আফ্রিদী, ওয়াজিরী ও মাসুদ ইত্যাদি উপজাতি শ্রেণীই প্রধান।

মার্কিন সার্জেণ্ট

এইসব প্রস্তুতির সাথে সাথে "আজাদ কাশ্মীর" সরকারও তার অন্য সৈন্য বাহিনী গড়বারও ব্যবস্থা চলতে থাকে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরুদ্ধ পক্ষ মুসলিম কনফারেন্সের নেতারাই এতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন কাশ্মীর থেকে পালিয়ে গিয়ে। এদের মধ্যে গোলাম আব্বাস ও সর্দার ইব্রাহিমের নামই প্রধান। এই "আজাদ" বাহিনী সংগঠনের ভার গ্রহণ করে রাসেল হেট নামে একজন যুদ্ধ ফেরৎ আমেরিকান সার্জেণ্ট। যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে ইনি একটি আমেরিকান সার্ভে কোম্পানী কর্তৃক আফগানিস্থানে নিযুক্ত হন, এবং তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে "আজাদ কাশ্মীর" বাহিনীর সভাপতির আহ্বানে মাসে ৮০০ শত ডলার

মাহিনার এক চুক্তিতে হানাদার সৈন্য বাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পাঁচ মাস কাজ করবার পর যখন দেশ-বিদেশে এই কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হয়ে পরে তখন এক অজুহাত দেখিয়ে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। অবশ্য ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সফল হয়ে যায়। বর্তমানে এই মার্কিন পুঙ্গব পশ্চিম জার্মানীতে ফ্রাঙ্কফোর্টের মিলিটারী হেড কোয়াটারে সার্জেণ্টের কাজ পেয়েছেন। "আজাদ কাশ্মীর" সরকারের নেতা সর্দার ইব্রাহিম করাচীতে ১২ই জানুয়ারী তারিখ ১৯৪৮, এ, পির নিকট ঘোষণা করেছিলেন যে, তাদের সঙ্গে এই "যুদ্ধে" ইংরেজরাই সহায়তা করছে না, আমেরিকানও আছে।

ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী ব্রিটিশ অফিসারেরা দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়ে মনের বাসনা পুরণের সুযোগই খুঁজতে লাগলেন। আক্রমণ পুরোদমে সুরু হবার কিছুদিন পরেই প্রকাশ পায় যে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর একজন পদস্থ-ব্রিটিশ অফিসারও নাকি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন; তাঁরা এই বলে আফ্রিদী নেতাদের এবং আবদুল কোয়ায়ুম খাঁকে উস্কানি দেন যে, কাশ্মীর'ত এখন একরকম খালিই পড়ে আছে, তাঁরা এখন সেখানে "অভিযান" করে গেলেই রাজত্ব করতে পারেন (ন্যাশনাল হেরাল্ড—২৭-১১-৪৭)। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভারত বিভাগের পর একটি যুক্ত দেশ-রক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন জেঃ অকিনলেক। বোধহয় তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই কাশ্মীর আক্রমণ আরম্ভ হবার অল্প কিছুদিন পরেই এই যুক্ত দেশরক্ষা বিভাগ ভারতবর্ষের পক্ষ থেকেই চাপ দেওয়ার ফলেই ভেঙে দেওয়া হয়। সব প্ল্যান যখন প্রস্তুত তখন কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম-সীমান্তের সন্নিকটবর্তী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য চিত্রলের শাসনকর্তা পাকিস্তানে যোগ দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র সানন্দে ঘোষণা

করে—"কাশ্মীরে স্বাধীন রিপাবলিকের জন্ম হলো"।

সেখ আবদুল্লা চারিদিকের অবস্থা বিচার করে গোলাম মহম্মদ সাদিখকে লাহোরে পাঠালেন মুসলিম লীগ হাই-কমাণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করতে, যাতে পাঞ্জাবের উন্মত্ততা বন্ধ হলে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কাশ্মীরের অধিবাসীরা ডমিনিয়নে যোগদানের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পথে মত প্রকাশের সুযোগ পায়।

কাশ্মীর সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নার নিকট এই মর্মে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো—জম্মু-কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্ত ধরে পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট ইত্যাদি স্থান থেকে যে হানা দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করতে ও পাকিস্তানের পথে কাশ্মীরের জন্য প্রেরিত খাদ্য, বস্ত্র, পেট্রল, লবণ ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানে যা আটক রাখা হয়েছে তা অবিলম্বে পাঠিয়ে দিতে, পুঞ্চের মধ্যে যে হাজার হাজার হানাদার ঢুকেছে তাদের নিবৃত্ত করতে এবং কোহালার পথে রাউলপিণ্ডির যে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক জনতা কাশ্মীরের আশ্রয় প্রার্থীদের খুন করতে আরম্ভ করেছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে। তা-ছাড়া পাকিস্তানের বেতার মারফৎ উৎকট মিথ্যা প্রচার চালিয়ে কাশ্মীরের ওপর যে "জেহাদ" ঘোষণা করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে, পাকিস্তান স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন মর্যাদাই দিতে রাজী নয় বলে প্রমাণ হবে এবং এমতাবস্থায় কাশ্মীরের আত্মরক্ষার্থে এই "জেহাদ"র হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার সকল ব্যবস্থার জন্যই প্রস্তুত হতে হবে।

এর উত্তরে পাকিস্তান সরকার এক টেলিগ্রামের মারফৎ এসব অভি-যোগের কোন সদুত্তরই না দিয়ে হুঙ্কার দিলেন যে যদি কাশ্মীর তার পথ ও মত না বদলায় তবে তার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

স্টেট্‌সম্যানের প্রতিনিধি ১২ই অক্টোবর উনাউ-এর পীরের সঙ্গে পেশো-

য়ারে সাক্ষাৎ করে খবর প্রচার করে যে, ইসলামের জন্য ১ লক্ষ উপজাতি এখনই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

এই প্রস্তুতির বোমা ফাটলো মজাফ্ফরাবাদের পথে কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশ দ্বারে ডোমেলের ওপর ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর,—সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

২২শে তারিখ মজফ্ফরাবাদে প্রায় ২ হাজার উপজাতীয় হানাদার শেষ রাত্রে অতর্কিতে ঢুকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সহরময় আরম্ভ করে লুণ্ঠন ও হত্যার তাণ্ডব। প্রথমত হিন্দু কাশ্মীরীদের গৃহ হানা দিয়ে মেয়েদের হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় ও প্রকাশ্যেই নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। পুরুষদের বালক-বৃদ্ধ-নির্বিচারে হত্যা করে ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমর্থক ও কর্মীদের—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—নির্মমভাবে হত্যার কাহিনীও শোনা যায়। এই সব হানাদার-দের সঙ্গে স্থানীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও স্টেটের প্রায় ২।৩ শত মুসলিম সৈন্য যোগ দেয়। হানাদারের দল মেসিন গান, ব্রেন গান এবং দুর পাল্লার কামান ইত্যাদি অতি আধুনিক অস্ত্র মোটর যোগে সঙ্গে নিয়ে আসে। পরে ধৃত অস্ত্র শস্ত্রাদি ও পরিত্যক্ত রসদ ইত্যাদির শিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অস্ত্রাগার থেকেই এগুলি হানাদারদের দেওয়া হয়েছিল এবং এই সব অস্ত্রাদির যোগান দিয়েছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে।

সীমান্তের উপজাতীয় এলাকা থেকে দুই শ'-আড়াই শ' মাইল পথ উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঝড়ের বেগে সুসজ্জিত মোটর ট্রাকে দলে দলে মজফ্ফরাবাদে একদল প্রবেশ করে। আর একদল পঃ পাঞ্জাবের মারি ও রাউলপিণ্ডির থেকে কোহালার রাস্তা ধরে প্রবেশ করে বিক্ষুব্ধ পুঞ্চ অঞ্চলের মধ্যে। তৃতীয় দল পশ্চিম পাঞ্জাবের

শিয়ালকোটকে ঘাঁটি করে মীরপুর অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। পঃ পাঞ্জাব থেকে একই সঙ্গে জম্মু এলাকার কাথুয়া, ভিম্বর, মীরপুর, কোটালি, পুঞ্চ, মানসেরা ইত্যাদি অঞ্চলে আক্রমণ ক'রে স্টেটের ১৫০০ সৈন্যকে করে দেওয়া হয় ছত্রভঙ্গ। পুঞ্চের কতকাংশ দখল করে পালন্দ্রি এলাকায় "আজাদ কাশ্মীর" দলের প্রতিষ্ঠা করে তার নামেই আক্রমণ চলতে থাকে। কলকাতা ও দিল্লী থেকে ব্রিটিশের মুখপত্র স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা "আজাদ কাশ্মীর" দলের ঘোষণাপত্র ছাপিয়ে হানাদারদের প্রচারের বেশ সুযোগ করে দিতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় কলমে মন্তব্য করে যে কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দিলেই গোলযোগ মিটে যাবে (২৮শে সেপ্টেম্বর-১৯৪৭)।

আফ্রিদী, ওয়াজিরী ও মাসুদ শ্রেণীর উপজাতিরাই হানাদারদের দলের মধ্যে বেশী থাকলেও এদের সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্য এবং কাশ্মীর রাজের ডোগরা বাহিনীর দলত্যাগকারী বহু পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যও সহায়তা করে। তাছাড়া পাকিস্তানের মুসলিম ও ব্রিটিশ অফিসারগণ এই আক্রমণের পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলে প্রমাণ আছে—সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

হানাদারদের দল মজফ্‌ফরাবাদকে ধ্বংস করে বরাবর প্রায় দু'শো মাইল দূরে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে এগোতে থাকে। হাপিয়ান, চেনারি পার হয়ে উরিতে এসে দক্ষিণে কোটলি ও পুঞ্চের আক্রমণকারীদের সঙ্গে মিলে ২৬শে তারিখ শ্রীনগর থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে বারমুলা সহর দখল করে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পৈশাচিক উৎসব চালাতে থাকে ও গুলমার্গের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঢুকতে চেষ্টা করে।

ন্যাশনাল কনফারেন্সের "বাচাউ ফৌজ" শ্রীনগর-বারমুলা পথে সশস্ত্র প্রহরী বসিয়ে পাহারা দিতে থাকে। শ্রীনগরে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কের ভাব কাটিয়ে আনতে এরা সমর্থ হয়। ইতিমধ্যেই হানাদারের দল শ্রীনগর থেকে

পঞ্চাশ মাইল দূরে মাহোরার ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন ধ্বংস করে ফেলে। এই ধ্বংসের ব্যাপারেও ইংরেজের হাত ছিল বলে সন্দেহ হয়। শোনা যায় যে ২৭শে অক্টোবর রাত্রিতে একজন সাহেব মেষ-লোমের পোষাকে সমস্ত শরীর ঢেকে, স্যুটকেশের মধ্যে কি একটা জিনিষ নিয়ে এসে পাওয়ার হাউসের কাছে মাটীর নীচে ঢেকে রাখে। এটা দেখতে পেয়েই পাওয়ার হাউসের পাহারাদার খবর দেবার জন্য দৌড়িয়ে যেতেই বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় ("ইণ্ডিয়া" উইক্‌লিতে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ)। বারমুলায়-শ্রীনগর পথে বাধা পেয়ে হানাদারের দল পুঞ্চ, ঝানগর, নওসেরা অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে থাকে। কাশ্মীর এক বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

মহারাজা হরি সিং জম্মুতে পালিয়ে গিয়ে বিপদহীন দূরত্ব থেকে যখন নির্লজ্জের মত বলছিলেন, "লুণ্ঠনকারীদের মুখে আমার প্রজাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যতক্ষণ আমি কাশ্মীরের অধিপতি এবং যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ রাজ্য রক্ষার কাজেই আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব!" ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীরা তখন জান-কবুল করে লড়াই করে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাশ্মীর ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছে, আদর্শের দিক দিয়ে ও স্থানের গুরুত্বের দিক দিয়েও।

তের

নয়া কাশ্মীরের প্রতিরোধ

"এদেশ আমাদের, আমরাই তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করব" —সগর্বে কাঁধের বন্দুকটাকে দেখিয়ে উত্তর করল একটি তরুণ কাশ্মীরী মুসলিম যুবক।

"কিন্তু তোমরা কয়জন? হানাদারেরা শুনেছি হাজারে হাজারে আসছে। তারা ২২শে অক্টোবর তারিখ মজফ্ফরাবাদ সহরে ঢুকে যা কাণ্ড করেছে শুনছি, তাতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই কি ভাল নয়? আর তাছাড়া মহারাজা নিজেই যখন শ্রীনগর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন তখন আমরা আর কী করতে পারি, দেশরক্ষার দায়িত্ব ত তাঁরই"—উত্তর করল দ্বিতীয় যুবক।

"মহারাজা ত কাশ্মীরী নন, তাই এমন কাপুরুষের মত দেশকে শত্রুর হাতে ফেলে দিয়ে চলে যেতে তাঁর একটুও প্রাণে বাঁধেনি। কিন্তু ভাই এই দেশের মাটি, এই দেশের জলবায়ু তোমাকে-আমাকে মায়ের মতই মানুষ করেছে। আজ যদি আমরা চলে যাই তবে দেশ চির জন্মের মত পরের গোলাম হবে। কনফারেন্সের ঝাণ্ডার নীচে লড়াই করে তুমি-আমি কি একথা বলতে পারি?"—উত্তর করল প্রথম যুবক।

"কিন্তু শক্তি আমাদের কতটুকু?"—দ্বিতীয় যুবক প্রশ্ন করল।

"সত্যের জন্য যার হিম্মত আছে আর আছে সংগঠন, শক্তি তারই আছে।"—প্রথম যুবক বলল।

এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলো আর একজন সশস্ত্র যুবক। সে বলল, "আমাদের পীস ব্রিগেডে আজ চারদিনের মধ্যেই ১৫

হাজার নওজোয়ান যোগ দিয়েছে। আজ আমাদের বাচাউ ফৌজের শোভাযাত্রা বের হবে। তুমি তোমার ঘাঁটিতে ঠিকমত পাহারা দেবে।"

"কেন"—দ্বিতীয় যুবক বলল।

"গুপ্তচর ধরা পড়েছে। ডোগরা রিজার্ভ পুলিশের যে কয়জন লোক শ্রীনগরে আছে তাদের একজনকে মেরে এখানে দাঙ্গা বাধাবার সুযোগ খুঁজছে শত্রুর পঞ্চমবাহিনী। আমাদের কনফারেন্সের নওজোয়ানকেও তারা আক্রমণ করেছে এরা জিনা কাডাল ও রাজা কাডাল মহল্লায়। কিন্তু আমরাও গুলি চালিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। পাঞ্জাবের দাঙ্গা এখানে চলবেনা।"—তৃতীয় যুবক উত্তর করতেই দূর থেকে শোভাযাত্রার ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

"ইয়ে মুল্লুক হামারা হ্যায়, ইস্‌কে হেফাজত হাম করেঙ্গে"

"হামলাদার খবরদার, হাম কাশ্মীরী হ্যায় তৈয়ার"

"হিন্দু-মুসলিম দোনো ভাই—এক সাথ হোকে করেঙ্গে লড়াই,"

"মহারাজাকা রাজ খতম হুয়া, নয়া কাশ্মীরকে সুরজ উদয় হুয়া।"

"আরে ঐ দেখ কনফারেন্সের ঝাণ্ডা নিয়ে বাচ্চারা সব বেড়িয়েছে। আরে আরে দেখ দেখি ও মহল্লার শ্যামলালকে ওরা কাঁধে নিয়ে আসছে কেন?"—উৎসাহের সঙ্গে দ্বিতীয় যুবকটি প্রশ্ন করল। এমন সময় বাচ্চা ফৌজের ধ্বনি শুনে রাস্তায় আরও লোক বেরিয়ে ভীড় করে দাঁড়াল। ছেলেদের এই শোভাযাত্রা এগিয়ে আসতেই দেখা গেল বাচাউ ফৌজের বিরাট শোভাযাত্রা কনফারেন্সের লাঙ্গল মার্কা ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে আসছে।

শোভাযাত্রার একজন চোঙ্গা নিয়ে চীৎকার করে বলতে সুরু করল:

"ভাই সব দিল্লী থেকে শের-ই-কাশ্মীর সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছেন। শ্রীনগর থেকে মহারাজার শাসন খতম হয়েছে; এখন কনফারেন্সের নও-জোয়ানের দল শের-ই-কাশ্মীরের নেতৃত্বে এদেশের শাসন-কার্য চালাবে।

হানাদারেরা মজফ্‌ফরাবাদ দিয়ে ঢুকে বারমুলায় এসে খুন ও লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে। আমরা বক্সী সাহেবের নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞা নিয়েছি যে কাশ্মীরে আমরা শান্তি রক্ষা করব, শত্রুকে আমরাই বাধা দিয়ে দেখিয়ে দেব যে কাশ্মীর আর গোলামী ও জবরদস্তি মাথা পেতে নেবে না। এই দেখুন এই শ্যামলাল ভাই প্রাণভয়ে কাশ্মীর থেকে চলে যাবার জন্য বিমান ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন যে তিনি গরীব কাশ্মীরী পণ্ডিত; এখন এই পাঠান হানাদারদের আক্রমণের হাত থেকে কি তার মুসলমান ভাইরা তাকে রক্ষা করতে পারবে? পাঞ্জাবের আগুন যে এখানে জলবে না তার প্রমাণ কি?"

"তোমরা সব কি বললে"—দ্বিতীয় যুবক জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা বলেছি আমাদের নেতা শের-ই-কাশ্মীর গরীব হিন্দু-মুসলমান শিখ সকল কাশ্মীরীরই নেতা, আমাদের দেশ সকলেরই দেশ; আজকের বিপদ আমাদের সকলেরই বিপদ। পাঞ্জাবের নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা আমরা কোনদিন স্বীকার করি নাই। শ্যামলাল ভাইকে বলেছি যে জান কবুল আমরা সবাই লড়াই করবো। যদি মরি এক সঙ্গেই মরবো, আর যদি বাঁচি তবে হিন্দু-মুসলমান সবাই এক সঙ্গে বাঁচবো। তিনি আমাদের সঙ্গে ফিরে এসেছেন"— যুবকটি উত্তর করল।

"হিন্দু-মুসলিম ইত্তেহাদ জিন্দাবাদ"

"শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ"

"ন্যাশনাল কনফারেন্স জিন্দাবাদ" ধ্বনি উঠল শোভাযাত্রার মধ্য থেকে।

"কাশ্মীরে শান্তির জন্য আমরা জান কবুল লড়াই করবো।"

"কাশ্মীরের আজাদীর জন্য আমরা প্রাণ দেবো।"

"নয়া কাশ্মীর আমরা কায়েম করবো।"

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। দ্বিতীয় যুবকটি প্রথম যুবকটিকে বলল—

"চল ভাই আমিও বাচাউ ফৌজে নাম লেখাব।"

এই ঘটনা অলীক কাহিনী নয়, শত্রুর আক্রমণের মুখে কাশ্মীরের জাতীয় প্রতিরোধের বহু রিপোর্টের মধ্যে একটী মাত্র।

দুর্দিনের বন্ধু

"আমি যে আদর্শের জন্য এতদিন সংগ্রাম করেছি সেই আদর্শের ওপর আঘাত করতে যারা উদ্যত তাদের সম্মুখে আমি আজ কিছুতেই পিছু হট্‌বো না,"—এই কথা বললেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির:বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা প্রসঙ্গে, যারা পাঞ্জাবের দাঙ্গায় নবজাত ভারত সরকারের ওপর আঘাত হেনে ভারতে হিন্দু-রাজত্বের স্বপ্ন দেখে মেতে উঠেছে। দাঙ্গার তাণ্ডব ছড়িয়ে পরে দিল্লীতেও। এই উন্মত্ততায় মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি যেন কোথায় মিলিয়ে যায়। গান্ধীজীই এই অন্ধকারে আলোর বর্ত্তিকা নিয়ে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়ালেন তাঁর আপন ভঙ্গীমায়। *

পণ্ডিত নেহেরু যখন তাঁর এই অভিযানে গণ-সমর্থন লাভের আশায় ঘোষণা করলেন যে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন এই সংগ্রামে শুধু পুলিশ বা মিলিটারির সাহায্যে জয়লাভ সম্ভব নয়, তখন ভারতের প্রগতিশীল প্রত্যেকটি নরনারী তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ালো বীর সৈনিকের মত এবং কলকাতা ও বিভিন্ন স্থানে প্রাণ দিয়ে এই সংগ্রামের জয়ের পথ সুগম করে দিল। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রাণের মূল্যে এই সংগ্রামের কীভাবে যবনিকা পাত ঘটে সে মর্মান্তিক কাহিণী সর্বজনবিদিত।

---

* একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের দাবী মেনে নিয়ে ভারত-বিভাগকে স্বীকার করবার ফলেই ভারতবর্ষে এই সব হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল প্রচার ও কাজের সুবিধা পায়।

গান্ধী-নেহেরুর নেতৃত্বে এই অভিযান পাকিস্তানের কোন কোন নেতার মৌখিক উচ্চ প্রশংসা লাভ করলেও কাশ্মীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ও গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির বিপরীত লক্ষণই প্রকাশ পেল।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীর উপত্যকায় হানাদারদের দল বারমুলায় হত্যা ও লুণ্ঠনের পৈশাচিক উৎসব যখন চালাচ্ছে কাশ্মীরের মহারাজা বাধ্য হয়েই তখন সাহায্য চেয়ে পাঠালেন ভারত ডমিনিয়নের নবজাত সরকারের কাছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এই বিপদের মুখে কাশ্মীরের জনগণের প্রতিনিধি সেখ সাহেব বিপদের গুরুত্ব বুঝেই পণ্ডিত নেহরুর কাছে ছুটে এলেন দিল্লীতে "দস্যু"-দলের এই আক্রমণের হাত থেকে কাশ্মীরের জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য সাহায্যের আবেদন নিয়ে।

এই সাহায্যের আবেদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব হলো কাশ্মীরের মুক্তিকামী জনতার পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর বিশ্বাস। সেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের জনগণের পক্ষ থেকেই সাহায্য চাইলেন। মহারাজা পালিয়ে এসে রইলেন জম্মুতে। যে পণ্ডিত নেহরুকে অপমান করতে কিছুদিন আগেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি তাঁর কাছে আসবেন এখন কোন মুখে? তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী এলেন দিল্লীতে মহারাজার চিঠি নিয়ে।

সীমান্তে গণভোটের সময় আপন সহকর্মী ও আদর্শের বিরুদ্ধে আঘাত যেমন ভাবে ভারতের নেতৃবৃন্দকে নীরব দর্শকের ন্যায় যন্ত্রণার সঙ্গে সহ্য করতে হয়েছিল এবার পরিবর্তিত অবস্থায় আর তাঁরা সে ভুল করলেন না। বিপদের দিনে কাশ্মীরের পাশে তাঁরা দাঁড়ালেন সমস্ত শক্তি নিয়ে। ২৪শে অক্টোবর তারিখ সাহায্যের আবেদন ও ভারত ডমিনিয়নে যোগদান পত্রের স্বাক্ষরিত দলিল মহারাজার কাছ থেকে পেয়ে নবভারতের

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সরকারীভাবে ২৫শে অক্টোবর সিদ্ধান্ত করলেন যে ভারতবর্ষ কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ও সামরিক সাহায্যদানের আবেদন এই বিশেষ অবস্থায় গ্রহণ করলেন এই সর্ত্তে যে, ভারতবর্ষের নবজাত রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাশ্মীরের ভারত ডমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন কাশ্মীরের মাটি থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করবার পর শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে জনগণের ইচ্ছানুসারেই নির্দ্ধারিত হবে। মহারাজাও এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন যে, এই গুরুতর পরিস্থিতিতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার তাঁর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠন করবেন, এবং সেখ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করবার দায়িত্ব দেবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে দায়িত্বশীল সরকারের দাবী মেনে নিতে তখন পর্যন্ত তিনি অস্বীকারই করলেন। অবশ্য তাঁর এই চালাকি খুব বেশীদিন চলে নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই দাবীর কাছে মাথা কী ভাবে নত করতে হয় সে বিবরণ আমরা পরে বলব।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার অবিলম্বে কাশ্মীরে সৈন্য-সামন্ত স্থল ও বিমান পথে পাঠাবার জন্য ব্যবস্থার হুকুম দিলেন। ২৭শে অক্টোবরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিমান যোগে ভারতীয় সৈন্য প্রায় ৪ শত মাইল দূরে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল কাশ্মীরের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে। বেলা ৯টায় শ্রীনগরে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বিমান ঘাঁটিতে নামল ভারতীয় সৈন্যবাহী বিমান। শ্রীনগরে যদিও মহারাজার শাসনের ঠাঁট তখন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্সের বাচাউ ফৌজের পরিচালনায় তখন দেশপ্রেমের দুর্বার প্রতিরোধের শক্তি অকস্মাৎ আক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে শ্রীনগরের শৃঙ্খলা রক্ষার ও প্রতি-আক্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা করে কাজে লেগে গেছে।

দিল্লী থেকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করে শ্রীনগরে আসবার সময় সেখ

সাহেব এই প্রসঙ্গে এক মর্মস্পর্শী বিবৃতিতে বলেন "দেশরক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁরা আমাদের নিরাশ করেছেন। কাজেই কাশ্মীরের জনগণের ওপরই দেশরক্ষার দায়িত্ব আজ এসে পড়েছে।...... "আমি আমার জনগণের পক্ষ থেকেই ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে এই নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার দাবীই জানাতে এসেছিলাম।" তিনি জনগণের নেতার যোগ্য ভাষায়ই শপথ নিলেন এই বলে, "আমি আমাদের মাতৃভূমির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেশপ্রেমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বদেশ-রক্ষার যুদ্ধে যে কোন বিপদ আসুক না কেন তা বরণ করতে চললাম। আমি আমার দেশবাসীর অন্তরের কথা জানি এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে।"

তিনি ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের স্বাধীনতাপ্রিয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে আবেদন করে বললেন যে, কাশ্মীরবাসীর এই চরম দুর্দিনে যেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের দূত হানাদারদের এই আক্রমণকে তাঁরা সকলে একবাক্যে নিন্দা করেন।

মহাত্মা গান্ধী ভারত সরকারের এই সাহায্য দানের সিদ্ধান্তকে এবং সেখ সাহেবের এই দেশাত্মবোধকে অকুণ্ঠ ভাষায় সমর্থন করে বললেন—"সামান্য সংখ্যায় হলেও ভারত গভর্নমেণ্টের এই সৈন্যবল দিয়ে সাহায্যের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গতই হয়েছে। ফলাফলের কর্তা ভগবান। কিন্তু মানুষ আপন কর্তব্যের জন্য মৃত্যুকেও বরণ করবার অধিকারী। আজ যদি স্পার্টার যুদ্ধের বীরদের ন্যায় ভারতের এই সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে আমি একফোঁটা চোখের জলও ফেলবো না। কিম্বা যদি সেখ আবদুল্লা তাঁর হিন্দু, মুসলিম ও শিখ কমরেডদের সঙ্গে এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন তবে তার জন্য কোন খেদই নাই। ভারতবর্ষের পক্ষে তা এক উজ্জল দৃষ্টান্তই রেখে যাবে।"

পণ্ডিত নেহেরু বললেন—"ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীরা ও দেশপ্রেমিক

কাশ্মীরবাসী সংকটময় মুহূর্তে হানাদারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরের মত দাঁড়িয়ে ও ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানে যোগদানে তাদের বাধ্য করবার নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে অপূর্ব সাহস, কর্মনিষ্ঠা, সংগঠন শক্তি ও ঐক্যের পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত ভারতবর্ষের পক্ষে যদি এই শিক্ষার উপযুক্ত ফল ফলে তবেই মঙ্গল।"

পাকিস্তান গভর্নমেণ্টকেও পণ্ডিত নেহেরু জিজ্ঞাস করলেন যে, কী ভাবে এবং কেন হানাদারের দল তাদের রাজ্যের পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তের মধ্য দিয়ে তার প্রতিবেশীর ওপর আক্রমণ করতে আসতে পারে? কী ভাবে তারা অতি আধুনিক অস্ত্র পায়, নেতৃত্ব পায়? তিনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করলেন যাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা তাঁরা রক্ষা করেন এবং কাশ্মীরে এই হানাদারদের ঢুকতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। কারণ কাশ্মীরে যে অল্প কয়টি পথ উত্তর পশ্চিমে আছে তা পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য দিয়েই এসেছে এবং তাদের পক্ষে হানাদারদের আগমনের এই পথগুলি বন্ধ করা খুবই সহজ। তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন, "আক্রমণকারীদের হাত থেকে কাশ্মীরবাসীকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি এবং আমরা আমাদের সেই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবো।"

আবার ইসলাম রক্ষার জিগীর

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিজে খোলাখুলি এবিষয়ে কিছু না বলে তাঁর সরকারের নামে প্রেস নোট প্রকাশ করে হানাদারদের প্রতিনিবৃত্ত করবার কোন কথা না বলে জানালেন যে, কাশ্মীরের ভারতে যোগদান "বল ও শঠতা"র দ্বারা করা হয়েছে, তাঁরা তা মানবেন না। গণভোটের কথাকেও তাঁরা অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন। গণতান্ত্রিক পথে কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান, রাজ্যের শাসন সংস্কার ও সর্বোপরি আক্রমণ-কারীদের কাশ্মীরে উপস্থিতির কোন কথাই তাঁরা স্বীকার করলেন না।

হানাদারদের দল যখন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে তখন তাঁরা বললেন, করাচিতে এখন বৈঠক বসানো যায়। অথচ সেই সঙ্গেই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী সেখ সাহেবকে অভিহিত করলেন "কুইসলিং" বলে; আর আইন সভার মুসলিম লীগ দল করাচিতে এক সভায় আরও রং চড়িয়ে বললেন, "সেখ আবদুল্লা মীরজাফরের অভিনয়ই করছেন!" অস্ত্রের মুখেই তাঁরা করাচি বৈঠকের অভিনয় করতে চাইলেন তা পরিষ্কার বোঝা গেল। সীমান্তের আবদুল কোয়ায়ুম খাঁ বললেন মুসলমান-প্রধান কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানেরই অধিকার, সুতরাং "হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের এই কাশ্মীর আক্রমণ" সমস্ত মুসলমানদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের সমস্ত মুসলমানকে প্রস্তুত হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি আফ্‌গানিস্তান, তুরস্ক, ইরাণ ও আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেও ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাহায্যের আবেদন জানালেন। মিঃ জিন্না এই সময়ে লাহোরে সমাবর্তন সভায় বক্তৃতা দেবার উপলক্ষ্যে মুসলিম যুবক সম্প্রদায়কে পাকিস্তান ও ইসলামের নামে মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন।

এই সঙ্গেই ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপাত্র মিঃ চার্চিল ও তাদের সংবাদপত্রগুলি যেমন, টাইমস্, ইকনমিস্ট, ডেলী টেলিগ্রাফ, ডেলী মেল ইত্যাদি পাকিস্তানের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে চীৎকার শুরু করল যে, তাদের মতে "নেহেরুর হিন্দু গভর্নমেণ্টই" আন্তর্জাতিক নীতিকে উপেক্ষা করেছে! "ইকনমিস্ট" ও "টাইমস্" সঙ্গে সঙ্গেই সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল— ইউ-এন-ও'র তত্ত্বাবধানে কাশ্মীর বিভাগ করলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে। তাদের মতে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা এবং লাদক ভারতবর্ষে যাবে [illegible] গিলগিট পাকিস্তানে যাবে। এই প্রস্তাব কাশ্মীর আক্রমণের ৬ দিনের মধ্যেই করা হলো। এর কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ অফিসারের নেতৃত্বে ও পাকি-

স্থানী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহায়তায় গিলগিটেও আক্রমণ সুরু হলো। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা গিলগিটের এই দুর্ভাগ্যকে "অক্টোবর বিপ্লব" আখ্যা দিয়ে সোভিয়েট সীমান্তে ইংরেজদের জন্য এই গিলগিট ঘাঁটিকে দখল করবার চক্রান্ত থেকে জনমতকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে আষাঢ়ে গল্প ছড়াতে লাগল—(স্টেট্সম্যান, ১৫-১-৪৮)।

কিন্তু তখন বারমূলায়—

*　*　*　*

[বারমূলার নিশাত টকীজের নীচে বন্দী মকবুল শেরোয়ানী ও হানাদার সর্দার]

হানাদার সর্দার : "তোমার নামই মকবুল শেরোয়ানী ?"

শেরোয়ানী : হ্যাঁ

সর্দার : "তুমিই ত' আমাদের কায়েদে আজমকে আর একবার সভায় অপমান করেছিলে ?"

শে : "তিনি কাশ্মীরে অতিথি হয়ে এসে কাশ্মীরবাসীকে অপমান করেছিলেন, গরীব কাশ্মীরীদের জমায়েৎ ন্যাশনাল কনফারেন্সকে অপমান করেছিলেন, কাজেই জনসাধারণ তার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল।"

সর্দার : "তুমিই তাদের নেতা ?"

শে : "আমি তাদের বান্দা।"

সর্দার : "ওসব বুঝিনা। এবার তোমায় যখন পেয়েছি তখন তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতেই হবে। তোমাদের দলে অনেক লোক আছে।"

১ম হানাদার : "সর্দার এদের দলের লোকই ত' কাল আমাদের তথাকে শ্রীনগরের পথে এগোতে বাধা দিয়েছে। একদল পেছন থেকে আমাদের আক্রমণ করে উরি-বারমূলার পথের ব্রীজটাকে ভেঙে দিয়ে

আমাদের দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এরা কাফেরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলছে 'কাশ্মীর কাশ্মীরীদের থাকবে'।"

সর্দার: "যুবক, তোমাদের দলের নওজোয়ানদের বীরত্বের প্রশংসা করি। তুমিও মুসলমান আমরাও মুসলমান, আমাদের সঙ্গে এক হয়ে কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করাই ত' কাজ।"

শে: "কাশ্মীরে কাফের কেউ নেই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলকে কনফারেন্সের ঝাণ্ডার নীচে শের-ই-কাশ্মীর এক করেছেন, কাশ্মীরে আমরা সবাই কাশ্মীরী। সবাই আমরা ধনী-রাজা-বাদশার দুশমন।"

২য় হানাদার: "আমরাও ত' হিন্দু মহারাজাকে চাই না। আমরা এখানে পাকিস্তানের শাহানশাহকে নিয়ে এক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবো।

শে: "মিথ্যা কথা, সব ধোঁকা। তোমরাই ত' নিজামের জন্য দিনরাত মাথা কুটছ, ইসলামের নামে তোমরা কালি মাখিয়েছো শত শত নরনারীকে হত্যা করে, কত নারীকে তোমরা বেইজ্জৎ করছো। কত বাচ্চাকে তোমরা কেটে টুকরো টুকরো করেছো; আর সোনার কাশ্মীরের কত শত সহস্র সোনার সংসার তোমরা শ্মশান করেছো। আমরা এর উত্তর দেবই দেব। কাশ্মীরে কোন শাহানশারই বাদশাহী চলবে না। রাজা-বাদশাহীর দিন খতম হয়েছে।"

সর্দার: "দেখ ভালভাবে বলছি, কনফারেন্সের ঝাণ্ডা ছেড়ে পাকিস্তানের ঝাণ্ডার নীচে এসে, আমাদের ফিরতি দলের সঙ্গে পালন্ডিতে চলে যাও। সেখানে আমাদের খোদ সর্দার ইব্রাহিম তোমাকে চাই-কি সেনাপতি করেও দিতে পারেন। তুমি কাফের আবদুল্লার দল ছেড়ে আমাদের দলে এস।"

শে: "দস্যু সর্দার, আমরা শের-ই-কাশ্মীরীর নওজোয়ান—আমরা জান দেব ত মান দেব না। তোমরা ইসলামের বেইমানী করেছ। কাশ্মীর থেকে তোমরা দূর হও।"

১ম : "দেখ তোমাদের রাজ্যের আর একজন সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংহ সেদিন মরবার আগে পর্যন্ত লড়াই করে বলল যে, মহারাজা নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই না। তিন দিন পর্যন্ত না খেয়েই বোকার মত লড়াই করে বুনিয়ারের কাছে মারা গেল।"

শে : "আমরা কোন রাজা-মহারাজার দিকে চেয়ে নেই। আমরা নিজেরাই অস্ত্র নিয়ে আজাদীর জন্য লড়াই করছি। শের-ই-কাশ্মীর দিল্লী থেকে আজই ফিরে আসবেন। নয়া ভারতের নওজোয়ানেরাও আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে। তোমাদের এখান থেকে শিগ্‌গীরই প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে দেখো।"

সর্দার : "বেশী কথার কাজ নেই। এই তোমায় শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি—তুমি ওদের দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগ দেবে কিনা ?"

শে : "নিশ্চয়ই না।"

সর্দার : (ইসারা করে)—"বাঁধ ওকে ঐ দুই থামের সঙ্গে। হাত দুটো ফাঁক করে বাঁধ।"

শেরোয়ানীকে টেনে নিয়ে যাবার সময় বলতে শোনা গেল—"খোদা, মনে বল দিও"। শেরোয়ানীকে বাঁধা হয়ে গেলে—

সর্দার : "জোয়ান, বুঝে দেখ—এখনও বলছি, বুঝে দেখ। তোমার এই তরুণ বয়স, তোমার বাঁচবার সাধ নাই ?"

শে : "হ্যাঁ আছে, নয়া কাশ্মীরের জন্যই বাঁচবার সাধ আছে।"

সর্দার : "নয়া কাশ্মীর ছাড়, বল শেখ আবদুল্লা মুর্দাবাদ, বল পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

শে : "শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ, নয়া কাশ্মীর জিন্দাবাদ।"

সর্দার : (ইসারা করতেই শেরোয়ানীর ওপর বেত্রাঘাত হতে লাগল) "বল, এখনও মত বদলাবে কিনা।"

শে: "না" (সঙ্গে সঙ্গেই শেরোয়ানীর মুখের ওপর বেত্রাঘাত)। "দস্যু সর্দার, ব্রিটিশও একদিন এমনি করেই বন্দুক আর কামানের জোরে ভারতবর্ষকে দখল করেছিল, ঐ দেখ সে আজ ভাগ্‌ছে। তোমাদের মতই হিট্‌লারের দঙ্গল দেশের পর দেশের আজাদী কেড়ে নিয়ে, হাজার হাজার দেশভক্তকে খুন করেছিলো—আজ কোথায় তারা ?"

সর্দার: "না, এর কথা অসহ্য। দাও, বন্দুক দাও।" (শেরোয়ানীর পায়ে গুলী)।

সর্দার: "বল আবদুল্লা মুর্দাবাদ"—

শেরোয়ানীর চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে।

শে: "আমি মরছি, কিন্তু আমার রক্তে শত সহস্র মকবুলের জন্ম হবে তোমাদের খতম করবার জন্য। শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ, নয়া কাশ্মীর জিন্দাবাদ।"

সর্দার: "অসহ্য, অসহ্য"—(পর পর চৌদ্দটি গুলী শেরোয়ানীর শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করল। উন্মত্তের মত সর্দার ছুটে এসে শেরোয়ানীর মুখের ওপর একটা ছুরি বসিয়ে দিল)—"দাও, ওর কপালের ওপর লিখে দাও 'এর নাম শেরোয়ানী—প্রত্যেক বেইমানই এই শাস্তি পাবে'।"

"এইত শহীদের মরণ। হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর শিখই হোক, সবাই এরূপ মৃত্যুকে গর্বের সঙ্গে বরণ করবে"—বললেন মহাত্মা গান্ধী শেরোয়ানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ২০শে নভেম্বর তারিখ দিল্লীতে তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে। শহীদের কথা ফললো দু'দিনের মধ্যেই; শ্রীনগর-বারমুলার পথে, গোলার মুখে শত্রুদল শেরোয়ানীর কথার সত্যতা বুঝলো।

প্রতি-আক্রমণ

বিমান থেকে শ্রীনগরে নেমেই ভারতীয় বাহিনী বারমুলার পথে সামান্য কয়েক জনকে নিয়ে এগোতে মনস্থ করল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্য দল, একেত' সংখ্যায় তখন অল্প, দ্বিতীয়ত তাদের জন্য মোটর, ট্রাক বা সাঁজোয়া গাড়ী তখনও এসে পৌঁছায় নাই। কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্সের 'পীস ব্রিগেড' ইতিমধ্যেই সশস্ত্র জাতীয় রক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছে। তারাই ভারতীয় বাহিনীকে নিজেদের ট্রাকে ক'রে বারমুলার পথে যুদ্ধ করবার জন্য নিয়ে চলল।

প্রথম বার প্রতি-আক্রমণ করতে গিয়েই ভারতীয় দলের অধিনায়ক মারা গেলেন এবং বেশ বোঝা গেল যে শত্রু সুসজ্জিত, ও তাদের নেতৃত্বও সুপরিকল্পিত। কাজেই তাদের পিছু হটতে হলো। কিন্তু শত্রুও আর এগোতে সাহস পেল না যখন দেখতে পেলো যে কাশ্মীরীদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদলও যুদ্ধে নেমেছে তাদের বিরুদ্ধে। শত্রু অতি আধুনিক অস্ত্র নিয়ে বারমুলায় ভারতীয় বাহিনীর ওপর আক্রমণ করলে ভারতীয় বাহিনীকে বাধ্য হয়েই বিমান আক্রমণ করতে হলো হানাদারদের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠতে থাকে এই দস্যু দলকে বিমান আক্রমণ ক'রে পুঞ্চ ও সীমান্ত প্রদেশের ঘাঁটি থেকে কেন এদের বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে না?

প্রতি-আক্রমণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে, স্থানের দূরত্ব ও যাতায়াতের অসুবিধা বোধে স্বাভাবিক ভাবেই বিলম্ব হলো, এবং এর মধ্যেই হানাদারের দল বারমুলা শহরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, লুট-তরাজ ও খুন-খারাবী করে পিছু হটতে আরম্ভ করল ট্রাক ভর্তি লুটের মাল ও অপহৃতা নারীদের নিয়ে। এখানে খৃষ্টানদের একটি গির্জাকেও এরা লুঠ তরাজ ক'রে কয়েকজন কর্মীকে হতাহত করে। গুলমার্গও এরা লুঠ করে পালিয়ে যায়।

৩১শে অক্টোবর তারিখ সেখ সাহেব কাশ্মীর ও জম্মুর জরুরী সরকারের

প্রধান রূপে শপথ গ্রহণ করলেন সরকারীভাবে; এবং জরুরী সরকারে (Emergency Administration Council) তাঁর আজীবন সহকর্মী-দের মধ্যে যে নয় জনকে নেওয়া হলো তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নামই প্রধান :—বক্সী গোলাম মহম্মদ, গোলাম মহম্মদ সাদিখ, পণ্ডিত শ্যামলাল স্রফ, পণ্ডিত কাশ্যপ বন্ধু, খাজা গোলাম মহীউদ্দিন, সর্দার বুধা সিং এবং মৌলানা মহম্মদ সাইদ। বক্সী গোলাম মহম্মদও প্রধান সহকারী হিসাবে জম্মুর গভর্নর নিযুক্ত হলেন কয়েকদিন পরেই।

অন্তর্বর্তী জরুরী সরকারের শপথ গ্রহণ করবার সময় সেখ সাহেব কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বললেন—"মনে রাখবেন শাসক-সম্প্রদায়ের নিকট আপনাদের আনুগত্য সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে; প্রজাসাধারণের কাছেই এখন থেকে আপনাদের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। প্রজার স্বার্থের বিরোধিতা আর বরদাস্ত করা হবে না। উপজাতি আক্রমণ-কারীদের বন্দুকের ভয়ে আমরা পাকিস্তানের পক্ষে কোনদিনই যোগ দেব না। আমরা স্বাধীন হতে চাই এবং স্বাধীন আমরা হবই।" তিনি মিঃ জিন্নাকেও অনুরোধ করলেন, যাতে পাকিস্তান এই হানাদারদের কাশ্মীর থেকে উঠিয়ে নেয় সে জন্য তিনি যেন তাঁর ব্যাক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির সদ্ব্যবহার করেন।

গোলাম মহীউদ্দিন ও বক্সী গোলাম মহম্মদ সাহেবের নেতৃত্বে কাশ্মীর জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অপূর্ব সাহস ও ঐক্য প্রচেষ্টা এবং ভারতীয় বাহিনীর আগমন ও প্রতি-আক্রমণ সবকিছু মিলিয়ে শ্রীনগরে জীবন যাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে, ৩০ তারিখেই দেখা গেল উৎসুক জনতা বারমুলার পথে "যুদ্ধ" ও "হাওয়াই জাহাজ" দেখবার জন্য ছেলে-পেলে নিয়ে বেরিয়েছে। এমনি একদলের পথ আটকালো জাতীয় রক্ষী ও সৈন্যদলের যুক্ত পাহারাদার বাহিনী শ্রীনগর-বারমুলার পথে। জিজ্ঞাসা করা হলো,

তারা কোথায় যাচ্ছে ? সেই ছোট দলের মাতব্বর উত্তর করলেন যে, তিনি একজন স্কুল মাস্টার, শুনেছেন যে, শত্রু পালিয়ে যাচ্ছে, তাই ছেলে-পেলেদের একটু "যুদ্ধ" আর "হাওয়াই জাহাজ" দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছেন মাত্র।

ভারতবর্ষ থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে জম্মুর মধ্য দিয়ে প্রায় ৩শত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী শ্রীনগরে পৌছলে, ৭ই নভেম্বর থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে পুরোপুরি আক্রমণ শুরু হয়। বারমুলার সম্মুখে বিমানবাহিনীর সহায়তায় প্রায় বিশ মাইল ফ্রন্টে ১২ ঘণ্টার যুদ্ধের পর ৫শত হানাদার ধ্বংস ক'রে ৮ই নভেম্বর বিকাল বেলা বারমুলায় ভারতীয় বাহিনী প্রবেশ করে। পরে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে, বারমুলার যুদ্ধে হানাদারদের যারা নেতৃত্ব করেছিলেন তার মধ্যে পাকিস্তানের অফিসার ছাড়াও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের "আই-এন-এ"র অন্যতম বিখ্যাত ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদও ছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদীমাত্রেই এ সংবাদে দুঃখিত হন। শহরের ধ্বংস, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাহিনী ছাড়া যে বস্তু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে নিশাত টকীজের নীচে শেরোয়ানীর পৈশাচিক হত্যার চিহ্নসমূহ। তারা সেখানে ন্যাশনাল কনফারেন্সের লাঙ্গল মার্কা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে শহীদের প্রতি সম্মান দেখালেন। বারমুলার অভিযানে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন একজন বাঙ্গালী, তাঁর নাম ব্রিগেডিয়ার এল, পি, সেন।

বারমুলা বিজয়ের পর ১২ই নভেম্বর মাহোরা বিজলীকেন্দ্র দখল করা হয় এবং বারমুলাই তখন ভারতীয় সৈন্যের ঘাঁটি হয়। এখান থেকে পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে ৬ দিনের মধ্যেই শত্রুকে ৬৫ মাইল দূরে উরিতে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে সমস্ত শত্রুদল ঢুকে পড়েছিল তাদের উচ্ছেদের কাজ চলতে থাকে এই সঙ্গে। ভারতের

সামরিক শক্তিই যে কাশ্মীরে বড় কথা নয়, কাশ্মীরের জাগ্রত গণতান্ত্রিক জনমতই এই সংগ্রামের বড় কথা, একথা ভারতের সামরিক বাহিনীর নেতারা প্রথম থেকেই সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ন্যাশনাল কনফারেন্সের নির্দেশমত তাঁরা কাশ্মীরের সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও শত্রু-অধিকৃত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেও, কনফারেন্সের নির্দেশ নামা হাজারে হাজারে ছাপিয়ে বিমান যোগে বিলির ব্যবস্থা করলেন। এতে দেশপ্রেমিক কাশ্মীরীদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীর জয়লাভের সংবাদ দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তারা যেন অবিলম্বে শান্তি-সেনা গঠন করে এবং শত্রুকে যেন কোনরূপ সাহায্য না দেয়।

১৯৪৭ সালের শীত কালে উরি ফ্রণ্টে যেখানে ১০।১২ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়, বরফ ও অত্যধিক শীতে যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থাকে ক'রে তোলে অসম্ভব—সেখানে এই দুঃসহ শীতের মধ্যেই ভারতীয় ও জাতীয় রক্ষী বাহিনী হানাদারদের ঠেকিয়ে রেখে মুখোমুখি বসে থাকে কয়েক মাস ধরে সতর্ক প্রহরীর মত। অবশ্য মাঝে মাঝে সুযোগ মত ঠোকাঠুকি যে না হ'ত তা নয়, তবে আক্রমণ আর হতো না, আস্ফালনই হ'ত; সময় সময় পাঠান বা পাঞ্জাবী হানাদারের দল ও জাতীয় রক্ষী বাহিনী বা ভারতীয় বাহিনী পাহাড়ের অতি সন্নিকট চূড়ায় দাঁড়িয়ে পরস্পরে বাক্‌-যুদ্ধও করেছে। বসন্ত কালে বরফ গলার পরই আবার উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়।

১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে উরি সীমান্তে যুদ্ধ সুরু হলে উরির উঃ পঃ অবস্থিত হান্দওয়ারা থেকে একটা বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে জুন মাসে মজফ্‌ফরাবাদ শহর থেকে ১৮ মাইল দূরে টিথোয়াল দখল করে। আর একটি বাহিনী উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের প্রান্তে ডোমেলের পথে এগোতে থাকলে প্রকাশ্য ভাবেই এখন পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এদের প্রতি-আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেও এই ফ্রণ্টে ভারতীয়

বাহিনী আর এগোতে পারে না। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে ইউ-এন-ও'র কমিশন ভারতে এলে তাদের আবেদনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ এই রণাঙ্গনে মোটামুটি এইখানেই থেমে যায়। যুদ্ধবিরতি সীমারেখার মানচিত্রটী দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

জম্মু-গিলগিট-বালটিস্তানের পথে

কাশ্মীর উপত্যকায় তাড়া খেয়ে হানাদারের দল পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝিলাম থেকে মীরপুর, গুজরাট থেকে ভীমবর এবং শিয়ালকোট থেকে জম্মু—প্রধানত এই তিনটি পথে জম্মুতে ঢুকে পড়ে জম্মুর মীরপুর ও পুঞ্চ জেলার কেবল মাত্র সদরঘাঁটি ছাড়া প্রায় সমস্ত অঞ্চলই তারা কবলিত করে। তাছাড়া জম্মু থেকে যে রাস্তা পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রায় ২০ মাইল পাশ দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকেছে তাও মাঝে মাঝে হানা দিয়ে এরা বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। জম্মুর সামরিক ঘাঁটিগুলি, যথা মীরপুর, পুঞ্চ, নওশেরা, কোটলি, ঝানগর ইত্যাদি অবরুদ্ধ করে সেই সমস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গৃহদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা ও নারীহরণ করতে থাকে পাঠান হানাদার বাহিনী। ডোগরা-রাজের সৈন্যদল এদের সম্মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এই অঞ্চলে আক্রমণ এত তীব্র হয় যে, একমাত্র বিমান আক্রমণ চালিয়েই ভারতীয় বাহিনী শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে সমর্থ হয়। মীরপুরের সামরিক ঘাঁটিকে ত্যাগ করেই আসতে হয়, এবং কোটলি থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রায় ৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থী বহু কষ্টে শত্রু বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে এসে শত্রুর হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করে। অবরুদ্ধ পুঞ্চ গ্যারিসন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আত্মরক্ষার সংগ্রাম করে টিঁকে থাকে ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশ পথে যে সাহায্য দেয় তার সাহায্যে। পুঞ্চ শহর থেকে ৩২ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকেও উদ্ধার করা হয় বিমানযোগে।

ভারতীয় বাহিনী জম্মুতে দুঃসহ শীতে ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি-

আক্রমণ আরম্ভ করে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হলে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে একজন "ইয়োরোপীয়ান"-এর নেতৃত্বে প্রায় ৬ হাজার হানাদার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে নওশেরাতে। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী কৃতিত্বের সঙ্গে এই বিরাট এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আক্রমণকে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়; এবং জম্মু থেকে আখনুর, বেরীপত্তন, নওশেরা, ঝানগর, কোটলি—এই পথ ধরে ক্রমাগত প্রতি-আক্রমণ করে নওশেরাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। তারপর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঝানগর, এপ্রিল মাসে রাজৌরী দখল করে। মে মাসে পুঞ্চ শহরের অবরুদ্ধ গ্যারিসনটিকে ভারতীয় বাহিনী মুক্ত করে, এবং জুন মাসে জম্মু হেড-কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এত সত্ত্বেও পুঞ্চ ও মীরপুর জেলার অর্ধাংশ শত্রুর হাতেই থেকে যায়। কারণ জুলাই মাসে ইউ-এন-ও কমিশনের ভারতে পদার্পনের পর তাদের আবেদনক্রমে ভারতীয়-বাহিনী আক্রমণাত্মক কার্য থেকে বিরত থাকে। কিন্তু জম্মুতে শত্রুদল মাঝে মাঝে হানা দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে থাকে। পণ্ডিত নেহেরু যদিও বললেন যে, এমতাবস্থায় ভারতীয় বাহিনীর পাকিস্তানে শত্রুর শিক্ষা-শিবির ও আশ্রয়স্থল আক্রমণের অধিকার আছে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশায়ই সে কাজ থেকে ভারতীয় বাহিনীকে বিরত রাখা হলো।

জম্মু ছাড়াও হানাদারেরা সোয়াৎ রাজ্যের শাসনকর্তার প্ররোচনায় কাশ্মীর উপত্যকায় ঢুকবার জন্য প্রথমে গিলগিটে ঢোকে। সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গিলগিট স্কাউট দল শত্রুর হাতে গিলগিটকে অর্পণ করে। এই গিলগিট স্কাউট দলের নেতা ছিলেন মেজর ব্রাউন—একজন ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার। ঠিক এই সময়, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য চিত্রাল, সেখানেও এইরূপ ব্যাপার ঘটে ম্যাথেশন নামে আর একজন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনের সহায়তায়। গিলগিটকে দখল করে

হানাদারের দল গিলগিট-শ্রীনগরের ২ শত মাইল- দীর্ঘ পথ ধরে এগোতে থাকে; কিন্তু শ্রীনগরের ৪০ মাইল উত্তরে বান্দীপুরার শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীর তাড়া খেয়ে পূর্বদিকে বালটিস্তানে ঢুকে পড়ে। স্কারদু এলাকা পার হয়ে এখান দিয়ে সোনমার্গ উপত্যকার পার্বত্য পথে শ্রীনগরের দিকে ঘুরে আবার আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে যোজি গিরিবর্ত্মে ভারতীয় বাহিনী দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ট্যাঙ্ক আক্রমণ চালিয়ে এদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্ত গিলগিট ও কারগিলের সামরিক ঘাঁটি শত্রুর দখলে চলে যায়। তার পর হানাদারেরা শ্রীনগর থেকে ১শত মাইলের মধ্যে বৌদ্ধ-প্রধান লাদাকে ঢুকলে ভারতীয় সৈন্যদল বিমানযোগে রাজধানী লে শহরকে ঘাঁটি করে এদের বাধা দেয়। এই অঞ্চলেও হানাদারেরা বৌদ্ধ মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙে, জনসাধারণের ওপর অসম্ভব অত্যাচার করে। কিন্তু নওশেরার ৩০ মাইল উত্তরে রাজৌরী অঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার নারী-হরণ ও প্রায় ২০ হাজার নরনারীকে হত্যা করে তাদের মৃতদেহকে বিরাট গর্তে পুরে ফেলে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলো তা বর্বরতার সকল সীমাকে অতিক্রম করে যায়। এই অঞ্চলের হিন্দু নারীদিগকে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উঃ পঃ সীমান্তে প্রকাশ্যে বিক্রয়ের কথা শোনা গিয়েছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্সের একজন নেতার মতে হানাদারেরা কাশ্মীরে প্রায় ২লক্ষ থেকে ৩লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

পণ্ডিত নেহেরু যখন ১১ই নভেম্বর (১৯৪৭) প্রথম শ্রীনগর ও বারমুলায় যান তখন এই দুঃখের মধ্যেও কাশ্মীরবাসীদের দৃঢ়তা ও উচ্চ মনোবল দেখে এক সভায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "এখন সত্যই কাঁদবার অবকাশ নেই; হানাদারদের হটিয়ে তাড়িয়ে দিতেই হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন: "অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষ ও কাশ্মীর ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আমি শের-ই-কাশ্মীরের মারফৎ আপনাদের সকলের

কাছে আজ এই অঙ্গীকার করছি—আমরা কাশ্মীরকে শত্রুমুক্ত করতে চাই। —প্রত্যেকটি হানাদার, প্রত্যেকটি আক্রমণকারী এবং যেকেউ কোনরূপ দুরভিসন্ধি নিয়ে আসবে তাকেই বিতাড়িত করতে চাই।"

সেখ আবদুল্লাও সেই সভায়ই ঘোষণা করেন, "আমি কাশ্মীরের জনগণকে হিন্দু, মুসলিম, শিখ ইত্যাদি ক্ষুদ্র গণ্ডিতে কিছুতেই বিভক্ত হতে দেব না। ঐক্যের পথে যে কোন বাধাই আসুক না কেন তা আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো। পৃথিবীর সকলের কাছে আমি সাহায্যের আবেদন করবো এবং যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেকটী হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নরনারীর আমি পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই।" (১১-১১-৪৭)।

তার কয়েকদিন পরেই তিনি শ্রীনগর থেকে স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রগুলির নিকট আবেদন করেন যে, "ইসলামের নামে" পাকিস্তান থেকে হানাদারের দল কি অত্যাচার মুসলিম-প্রধান কাশ্মীর রাজ্যে তাদের সমধর্মাবলম্বীদের ওপরেও করেছে তা স্বচক্ষে যেন তাঁরা একবার দেখে যান। তিনি মনের দুঃখ ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন যে, যারা এই আক্রমণকারীদের "কাশ্মীরের উদ্ধার-কর্তা" বলে বলছে তারা ইতিহাসে মহাপাপী বলেই খ্যাতি লাভ করবে। এরা পবিত্র কোরাণকে অপবিত্র করেছে, মসজিদকে পরিবর্তিত করেছে বেশ্যালয়ে, এবং কাশ্মীরের নরনারীর জীবনকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও তিনি শপথ নিলেন যে, একটি হানাদারকেও কাশ্মীরের ভূখণ্ডে থাকতে দেওয়া হবে না। অদূর ভবিষ্যতেই তাদের বিতাড়িত করা হবে, এবং সভ্য দুনিয়ার সহায়তায় কাশ্মীরকে আবার সুন্দর করে তিনি গড়ে তুলবেন।

কিন্তু জাগ্রত কাশ্মীর যে চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কি সহজ হবে?

রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে কাশ্মীর

১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত গভর্নমেণ্ট বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের (United Nations Organisation) নিকট এক আবেদন পত্রে জানান যে, উপজাতীয় হানাদারের দল পাকিস্তানের সহায়তায় কাশ্মীরে ঢুকে যে আক্রমণ ও অত্যাচার চালাচ্ছে তা আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে অতি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব করেছে; কাজেই নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) যেন এখনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রে পাকিস্তানকে হানাদারদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে অবিলম্বে বারণ করেন, কারণ কাশ্মীর-আক্রমণ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণেরই নামান্তর মাত্র। যদি পাকিস্তান অবিলম্বে এরূপ না করে তবে ভারত সরকারকে আত্মরক্ষার জন্যই হানাদারদের বিতাড়িত করবার কাজে পাকিস্তানের সীমানার মধ্যেও ঢুকতে বাধ্য হ'তে হবে। ভারত সরকার কাশ্মীরের জনগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও শাসনকর্তার ভারতীয় ডমিনিয়নে যোগদান ও সশস্ত্র সাহায্যের আবেদন এইজন্যই গ্রহণ করেছে যে, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কি বৈদেশিক সম্পর্ক, কি আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই বল প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ ভাবে নির্ধারিত হতে দিতে পারে না। তারচেয়েও গুরুতর ব্যাপার এই যে, জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতীয় ডমিনিয়নে যোগদানের পর উহা ভারত রাষ্ট্রেরই একাংশ। সুতরাং কাশ্মীর আক্রমণ ভারতবর্ষ আক্রমণেরই রকম-ফের মাত্র।

রাষ্ট্র সঙ্ঘকে অনুরোধ করা হলো যে, নিরাপত্তা পরিষদ যেন পাকিস্তান গভর্নমেণ্টকে অবিলম্বে এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে বলেন—(ক) পাকিস্তানের কর্মচারীবৃন্দ সামরিক বা অসামরিক এবং পাকিস্তানের কোন নাগরিক আক্রমণে কোনরূপ সাহায্য বা অংশ গ্রহণ না করে। (খ) হানাদারদের কাশ্মীর আক্রমণের জন্য কোন ঘাঁটি এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ

ইত্যাদি দেওয়া অবিলম্বে পাকিস্তান বন্ধ করে। আক্রান্ত কাশ্মীরে শান্তি স্থাপনের প্রথম সোপান হিসাবে ভারতবর্ষ মনে করে যে নিরাপত্তা পরিষদ যদি কাল বিলম্ব না ক'রে তড়িৎ-কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তবেই কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসতে পারে। কাশ্মীর থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করবার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণভোট বা তদনুরূপ কোন ব্যবস্থা দ্বারা কাশ্মীরের জনগণের মতামত জানা যাবে, একথাও ভারতবর্ষ স্পষ্ট করেই জানালো। কিন্তু তার আগে এই ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীদ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান সরকারকে কয়েকটি বৈঠকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে তাঁরা হানাদারদের কোনরূপ সাহায্য না দেন এবং কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলন বিরোধী মনোভাব অবলম্বন গ্রহণ করায় এবং হানাদারদের পক্ষ ত্যাগ করতে কৌশলে অসম্মতি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে "শান্তির ললিত বাণীর" অন্তরালে কাশ্মীরে সহস্র সহস্র হানাদারদের লেলিয়ে দেওয়ার জন্য তা' ব্যর্থ হয়। ১লা নভেম্বর তারিখ মিঃ জিন্না ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে জানালেন যে, "কাশ্মীরে উপজাতীয় হানাদারদের নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে"। কিন্তু প্রস্তাব করলেন যে, উপজাতীয় হানাদারবাহিনী, ভারতীয় বাহিনীর সাথে সাথেই কাশ্মীর রণাঙ্গন ত্যাগ করতে পারে। মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বললেন, সীমান্তের উপজাতিদের মনঃক্ষুণ্ণ করেই এ প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করলেন যে, কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার অন্তর্বর্তী সরকারকে ভেঙে একটি নিরপেক্ষ শাসনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে— অর্থাৎ কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের গদিতে বসিতে দিতে হবে।

বোঝা গেল, পাকিস্তান হানাদারদের শাণিত ছুরিকা মুক্তি-সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ কাশ্মীরের বক্ষস্থলে শুধু বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতে চান না, তারা আরও চান যাতে সেই ছুরিকার শাণিত ফলক কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মর্মস্থল পর্যন্ত পৌছায় এবং তার তদারক করবার জন্য শেখ আবদুল্লার পরিবর্তে চাই তাদের মনোমত এক "নিরপেক্ষ" সরকার।

যখন কাশ্মীর রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ও অফিসারেরা হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৩১শে ডিসেম্বরে অম্লান বদনে বললেন, "কাশ্মীরে কোন পাকিস্তানী সৈন্যই যুদ্ধ করছে না।" অথচ যখন পাকিস্তানী সৈন্য সাজসজ্জাসহ ধরা পড়তে লাগল তখন তাদের বলা হলো এরা বিদায়ী সৈন্য।

শুধু তাই নয় নিজেদের কাশ্মীর আক্রমণকে ঢাকবার জন্য তারস্বরে বলতে আরম্ভ করলেন—"ভারতবর্ষ পাকিস্তানকেই ধ্বংস করতে চায়"। নবলব্ধ "স্বাধীনতা" ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে এই ভাষণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক কলঙ্ক কাহিনী হয়েই রইল পাকিস্তানের পক্ষে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন রাষ্ট্র সঙ্ঘে আবেদন করলেন অপর দিকে স্পষ্ট ভাষায়ই পাকিস্তানের হানাদারদের সতর্ক করেন যে: "একটী বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে বর্বর শত্রুর আক্রমণের নীতিকে যদি উৎসাহ দেওয়া হয় বা স্বীকার করে লওয়া হয় তবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের কোন ভবিষ্যতই নাই। সুতরাং এই আক্রমণকে বাধা দেওয়াই উচিত এবং আমরা যথাসাধ্য বাধা দেব। কাশ্মীর রাজ্যকে সম্পূর্ণ শত্রু-মুক্ত করতেই হবে।"

আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেলে পণ্ডিত নেহেরু ২৫শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে "পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের একই সঙ্গে কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য ও হানাদারদের অপসারণের প্রস্তাব খুবই

অদ্ভুত, এবং তা-থেকে একমাত্র এই বোঝা যায় যে, পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের মতানুসারেই হানাদারেরা কাশ্মীরে ঢুকেছে। আমরা হত্যাকারী জল্লাদ হানাদারদের কোন ক্রমেই স্বীকার করবো না। এরা কোন রাষ্ট্র নয়; অবশ্য এদের পশ্চাতে কোন রাষ্ট্রের উস্কানী থাকতে পারে। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের আক্রমণ পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই সংগঠিত করেছেন।...কাশ্মীর রাজ্যকে বলপূর্বক পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে, কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগদানের কথা ঘোষণা করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।......জনগণের ভাগ্য খোলাখুলিভাবে বল প্রয়োগ দ্বারাই নির্দ্ধারিত হবে কিনা কাশ্মীরের সমস্যা তাহাই।......রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পন্থাকে কিছুতেই জয়যুক্ত হতে দিতে আমরা পারি না। ...বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরের জনগণকে কিছুতেই আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না।"

২৮শে ডিসেম্বর জম্মুতে এক জনসভায় সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন যে, "ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে আমি এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, কাশ্মীরকে রক্ষা করবার জন্য সাধ্যমত সব কিছু করবো। বস্তু ও ব্যয় কোন কিছুর চিন্তাই আমরা করবো না। যা কিছুই ঘটুক না কেন, কাশ্মীরকে আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করবো না—আমরা এর শেষ পর্যন্ত দেখবো।" তাঁর কণ্ঠ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কলকাতার এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে। সেখানে তিনি কঠোর ভাবে বললেন—"বলকে বল দ্বারাই বাধা দিতে হবে, কাশ্মীরের এক ইঞ্চি জমিও ত্যাগ করা হবে না" (৩-১-৪৮)।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের কাছে পণ্ডিত নেহরু যে কত উচ্চাশা নিয়ে আবেদন করেছিলেন সে কথা তাঁর জয়পুরের এক বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন "আমরা কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন

করেছি এইজন্য যে, আমরা যে-কোন কাজই করি না কেন তা সভ্যতা নির্দ্ধারিত পথেই করবো"—(৩-১-৪৮)। রাষ্ট্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট: "বিচার্য বিষয় অতি পরিষ্কার। নিরাপত্তা পরিষদ সমস্যার গুরুত্ব বোধে অতি সত্বর আলোচনা ক'রে—কয়েক মাস নয়—কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কার্যকরী নির্দেশ দিতে পারেন" (২-১-৪৮)। কিন্তু রাষ্ট্র সঙ্ঘে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র কাশ্মীর সমস্যাকে আশ্রয় ক'রে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করল।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সালের ৬ই জানুয়ারী এবং চার মাস ধরে বাকবিতণ্ডার পর এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক এমন এক প্রস্তাব ভোটাধিক্যের জোরে গ্রহণ করলেন যা ভারতবর্ষের মূল অভিযোগের বিচার না করে এই গোলযোগের ছিদ্রপথে তাদের নিজেদের প্ল্যান চালু করবারই নামান্তর মাত্র। ভারতীয় দলের নেতা শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার যদিও উচ্চাশার সুরে বললেন যে "বিষয়টী অতি সরল, এবং নিরাপত্তা পরিষদ কেন তড়িৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন না তার কোন কারণ আমি বুঝি না"—কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব জাফরুল্লা খাঁ 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' গাইতে সুরু করলেন, আর ব্রিটিশ ও মার্কিন দলের নেতৃবৃন্দ কখনও তাকে উস্কানি দিতে আরম্ভ করলেন কখনও বা তাঁর "পিছু সুর টেনে" সমস্ত জিনিষটাকে জটিল করে তোলেন। দীর্ঘ বিতণ্ডার গতি লক্ষ্য করেই দুঃখ ও হতাশার সুরে ভারতীয় দলের নেতা বললেন "কাশ্মীরে যখন আগুন জ্বলছে তখন আমরা এখানে বাঁশী বাজাচ্ছি"। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নের মুখপত্র "ট্রুড" ১১ই জানুয়ারী ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্টির উদ্দেশ্যের কথা বলতে যেয়ে লেখেন যে ব্রিটেন ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারী মনোভাবের ফলেই ভারত

ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সব গণ্ডগোল ইচ্ছা করে বাধানো হয়েছে।

১৫ই জানুয়ারী ভারতীয় দলের নেতা পরিষদের সম্মুখে কাশ্মীর আক্রমণের সমস্ত বিবরণ এবং পাকিস্তানের কপট আচরণের ভূমিকার কথা বিবৃত করে তিনি দাবী করলেন যে কাশ্মীরে যে হত্যাকাণ্ড চলছে তাতে মুহূর্তও আর বিলম্ব করা উচিত নয়। নিরাপত্তা পরিষদ যেন অবিলম্বে তার কর্তব্য সম্পাদন করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান এবং ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর জন্য মহাত্মা গান্ধী যে অনশন করছেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, অবিলম্বে এই আক্রমণকে বন্ধ করবার জন্য দাবী করলেন যে, হানাদারদের কাশ্মীর রাজ্য থেকে অবিলম্বে বিতাড়িত করতে ও পাকিস্তান যে সাহায্য করেছে তা বন্ধ করে এই যুদ্ধ এখনি যাতে অবসান ঘটে তার জন্য কালক্ষেপ না করে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। বর্বর হানাদার ও অন্যান্য আক্রমনকারীদের ইতিহাসে যে ভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে সেই ভাবেই এদের বিতাড়িত করতে ভারতবর্ষ কখনই দ্বিধা করত না, যদি এই কাজ করতে যেয়ে তার সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা না থাকত। সর্দার প্যাটেল স্পষ্টভাবেই জম্মুতে এক জনসভায় বলেছিলেন যে এ যুদ্ধ খোলাখুলি যুদ্ধ নয়। তা যদি হতো, তবে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে কাজ অনেক সহজ হ'ত (১২·১-৪৮)।

১৬ই জানুয়ারী পাকিস্তান প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নির্লজ্জ ভাবে বললেন যে হানাদারদের কোন সাহায্য তারা দিচ্ছেন না, এবং পাকিস্তানের কোন সামরিক কর্মচারী হানাদারদের নেতৃত্ব করছে না। তিনি ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেই আক্রমণের উল্টো অভিযোগ দিয়ে দাবী করলেন যে (ক) কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ব্যাপার এখনি গণভোট দিয়ে নিষ্পন্ন করতে, এবং (খ) নিরপেক্ষ অবস্থার সৃষ্টির জন্য

ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর ত্যাগ করবে। আর যদি ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে থাকে তবে পাকিস্তানী সৈন্যও কাশ্মীরে সরকারী ভাবে ঢুকবে। (গ) সেখ আবদুল্লার অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্টকে ভেঙে দিয়ে সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে এক নিরপেক্ষ সরকার এখনি গঠন করতে হবে। এই সঙ্গে তিনি জুনাগড় থেকে আরম্ভ করে ভারতের বিরুদ্ধে আর্থিক চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগও উত্থাপন করলেন।

ইঙ্গ-মার্কিন দলটি নিরাপত্তা পরিষদে খোলাখুলি ভাবেই পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন ক'রে দিনের পর দিন বক্তৃতার মালা গেথে চললেন। আর কাশ্মীরে তখন হাজার হাজার হানাদার মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। অথচ এই যুদ্ধকে অবিলম্বে বন্ধ করবার জন্য কোন কার্যকরী পন্থা তাঁরা গ্রহণ করলেন না। সোভিয়েট প্রতিনিধি দাবী করলেন এখন আলোচনা বন্ধ করে, যাতে উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সদ্ভাব আবার স্থাপিত হয় সেজন্য চেষ্টা করা হোক। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। আর্জেণ্টিনা, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা এবং গ্রেট ব্রিটেন এমনভাবে আলোচনা চালালেন যাতে ভারতবর্ষকে কাশ্মীরে আক্রমণকারী আর একটি পক্ষ বলেই পরোক্ষে গণ্য করা হলো; এবং কাশ্মীর আক্রমণের মূল বিষয়কে ডিঙিয়ে তাঁরা ভরতবর্ষ ও পাকিস্তানের সকল সমস্যা সমাধানে মাতব্বরির এবং কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পথ খুঁজতে লাগলেন। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ কাশ্মীর সরকারের নেতা সর্দার ইব্রাহিমকেও নিউইয়র্কে হাজির করা হলো। তিনি দাবী করলেন "নিরাপত্তা পরিষদ যদি আমার সঙ্গে আলোচনা না করে তবে যুদ্ধ-বিরতি কে করবে"? তিনি এখনি গণভোটের দাবী করলেন। পাকিস্তান ঠিক সেই দাবীই করলেন নিরাপত্তা পরিষদে এবং ইঙ্গ-মার্কিন দল এই দাবীকেই প্রথম স্থান দিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি হতাশ হয়ে বললেন—

' কাশ্মীরে যখন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ বেড়ে চলেছে তখন কি এই-ভাবেই এখানে সময় নষ্ট করা হবে ?"

পাকিস্তানের প্রতিনিধি কাশ্মীর যুদ্ধের পরিণতি বিশ্ব-যুদ্ধ হতে পারে বলে ভয় দেখালেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী আলোচনার সময় মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ অষ্টীনও সকলকে ভয় দেখিয়ে বললেন "সমস্ত পৃথিবী চেয়ে আছে যে এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ থেকে পৃথিবীতে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠবে কিনা ?"...কাজেই তিনি পরামর্শ দেবার ছলে বললেন "উপজাতীয় হানাদারদের আপনারা কী ভাবে চলে যেতে বলতে পারেন ? কেবলমাত্র যদি তারা আশ্বাস পায় যে নিরপেক্ষ গভর্নমেণ্টের আওতায় গণভোটের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হবে তবেই তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে যেতে পারে"।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি ৬ই ফেব্রুয়ারী আরও চমৎকার কথা বললেন যে, কাশ্মীরে গৃহযুদ্ধ চলছে। সুতরাং হানাদারেরা কাশ্মীরের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য এসেছিল কিনা বিচার করা বৃথা ! সুতরাং চাই এখনই গণভোট এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স ও মুসলিম কনফারেন্সকে নিয়ে চাই এক যুক্ত নিরপেক্ষ সরকার।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি বললেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাশ্মীরের প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতেই থাকবে।"...সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে এখনই গণভোটের এবং তার জন্য নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার। যারা যুদ্ধ করছে এই পথেই তাদের আস্থা অর্জন করা যাবে বলে তিনি ঘোষণা করলেন।

সর্বজনবিদিত আর্জেন্টিনার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি হঠাৎ প্রজাদরদী হয়ে বলে উঠলেন রাষ্ট্র সঙ্ঘ "...স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে বরদাস্ত করতে পারে না।" আমেরিকা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের হানাদারদের পক্ষ সমর্থনের যুক্তি শুনে

ভারতীয় প্রতিনিধি আশ্চর্য হয়ে বললেন--"মানুষ রূপধারী পশু" এই হানাদারদের মর্যাদা কী? কোন নীতি ও আইনের মর্যাদার বলে এই দস্যুর দল গণভোটের ও নিরপেক্ষতার আশ্বাসের দাবী করতে পারে?

এই সব হঠাৎ-প্রজাদরদী বন্ধুদের আসল উদ্দেশ্য যে কী তা ভারতীয় দলের বুঝতে আর বাকি রইল না। সাম্প্রদায়িক বিষের আগুন জ্বালিয়ে অকর্মন্য নিরপেক্ষ সরকারের আওতায় সীমান্তে গণভোটের অভিজ্ঞতা এখনো কেউ ভোলে নাই। সুতরাং তারা বললেন যে কাশ্মীরে প্রথম কাজ হচ্ছে যুদ্ধ বিরতি ও হানাদারদের কাশ্মীর রাজ্য থেকে বহিস্কার। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন চক্র চাইলেন ঠিক বিপরীতটী বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই।

৬ই ফেব্রুয়ারী সেখ আবদুল্লা নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন "কাশ্মীরে মহারাজার শাসন বিষয়ে, কিম্বা রাজ্যের ভারতে যোগদানের বিষয় বিচারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আমরা প্রার্থনা করি নাই।" পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান অভিযোগ এই যে "কাশ্মীর আইন সঙ্গত ভাবেই ভারতবর্ষে যোগদান করবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সহায়তায় উপজাতীয় হানাদারবৃন্দ তাকে আক্রমণ করেছে"। তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন—"পাকিস্তান এমন সমস্ত হানাদারদের সাহায্য করেছে যারা আমাদের রাজ্যে দলে দলে ঢুকে সহস্র সহস্র নারী হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, এবং নিরীহ জনসাধারণের ওপর হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালিয়েছে। আর এখন বিশ্ব সভায় এসে হঠাৎ পাকিস্তানের প্রতিনিধি কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার বড়াই করতে আরম্ভ করেছে"।

ব্রিটেনের প্রতিনিধি একটু রাগত ভাবেই বলে উঠলেন—"কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতির জন্য তাঁর কী প্রস্তাব আছে?" সেখ সাহেব সহজ সরল ভাবে

উত্তর দিলেন : "পাকিস্তান হানাদারদের জম্মু ও কাশ্মীরে আসবার জন্য যেন ঘাঁটি না দেয়, যেন অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা বারুদ এবং নেতৃত্ব না দেয়, পাকিস্তান যেন কাশ্মীরে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠিয়ে এই আক্রমণকে দীর্ঘস্থায়ী না করে। কারণ আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে তা কিছুতেই পাকিস্তান করতে পারে না। পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব মানাতে হবে—এই হল পরিষদের কর্তব্য"।

আলোচনা ক্রমশ তিক্ততার দিকে যেতে আরম্ভ করল কিন্তু মূল সমস্যার সমাধানের কোন আশা না দেখে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতাই জ্ঞাপন করেন, এবং পরামর্শ গ্রহণের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্যার জাফরুল্লা লণ্ডনে গেলেন বিভিন্ন অছিলায় মিঃ এটলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

নিরপত্তা পরিষদের এই মনোভাবে পণ্ডিত নেহরু বলতে বাধ্য হলেন "আমরা পরিষদের কাছে যে বিষয় উপস্থিত করেছি সে সম্বন্ধে আলোচনা না করে, এবং সোজাসুজি ভাবে কোন কিছু স্থির না করে দলগত রাজনীতির আবর্তে পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছেন।"

সেখ আবদুল্লা দিল্লীতে স্পষ্টই বললেন "রাষ্ট্র সঙ্ঘ থেকে আমরা খুব বেশী আশা করি নাই। কারণ সেখানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেই সমস্যাটিকে বিচার করেছেন। এমতাবস্থায় কিছুই হতে পারে না।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন "আমরা যদি শক্তিশালী হতে পারি তবে শুধু কাশ্মীর স্বাধীনই হবে না, ভারতবর্ষের সঙ্গে সে ঐক্যবদ্ধও হতে পারবে। অন্যথায় কোন কিছুই ধরা দেবে না।" বলা বাহুল্য এ শক্তি বলতে সেখ সাহেব কাশ্মীরের জাগ্রত জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিকেই লক্ষ্য করেছেন।

১০ই মার্চ আবার বৈঠক আরম্ভ হয় এবং বিভিন্ন প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হয়। মূলত তাদের উদ্দেশ্য ও সুর একই। কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, আবদুল্লা শাসনের অবসান এবং হানাদারদের বিতাড়িত করবার কাজের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে একজন ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিয়ে গণভোটের ব্যাপারকে এখনই নিস্পত্তি করা। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বলা হলো যে এরূপ কোন প্রস্তাবই তারা গ্রহণ করতে পারে না যা কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক নীতি উপেক্ষার কোন কথাই উল্লেখ করবে না। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাব পরিষদ গ্রহণ করে না। ২১শে এপ্রিল তারিখ বেলজিয়ম, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা এক জোটে এক প্রস্তাব ভোটাধিক্যের বলেই গ্রহণ করলেন; এবং প্রস্তাবের নামাকরণ করলেন "ভারত পাকিস্তান সংক্রান্ত প্রস্তাব"। কাশ্মীর গোলযোগ যেন একটা উপলক্ষ মাত্র।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব

এই প্রস্তাবে বলা হল :—

(ক) যেহেতু বর্তমান গোলযোগ আন্তর্জাতিক শান্তিকে ব্যাহত করতে পারে, সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদ ৫জন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি কমিশন ঘটনাস্থলে যেয়ে তদন্ত করবার জন্য নিয়োগ করছে। (খ) ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে প্রস্তাবে অনুরোধ করা হলো যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং নিরপেক্ষ গণভোট দ্বারা কাশ্মীরের প্রশ্নকে মীমাংসা করবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি যেন অবলম্বন করা হয়। "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার নির্দেশে বলা হলো: (গ) পাকিস্তান উপজাতীয় হানাদার ও পাকিস্তানী নাগরিক যারা যুদ্ধের জন্য কাশ্মীরে ঢুকেছে তাদের ফিরিয়ে আনবে। ভারত সরকারকেও বলা হলো যে কমিশন যখন মনে

করবে যে হানাদারেরা চলে যেতে আরম্ভ করছে, তখন অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যও তাদের পরামর্শ ক্রমেই কাশ্মীর ত্যাগ করতে থাকবে এবং শুধু কমিশনের নির্দেশ অনুসারেই বাকি সৈন্য মোতায়েন থাকবে। কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সম্মতিক্রমে উভয় ডমিনিয়নের সৈন্যবাহিনীকেই কাজে নিযুক্ত করতে পারবে। গণভোটের ধারায় নির্দেশ দেওয়া হলো: (ঘ) প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে কাশ্মীরে মন্ত্রীসভা এবং একটি "গণভোট তত্ত্বাবধানকারী সভা" গঠনের প্রতিশ্রুতি ভারত গভর্ণমেণ্টকে দিতে হবে। এই সভা রাজ্যের সৈন্য সামন্ত এবং পুলিশ বাহিনীর ওপর খবরদারী করতে পারবে। এমন কি প্রয়োজন বোধে ভারতীয় সৈন্য দিয়েও তাদের সাহায্য করতে ভারত সরকারের দায়িত্ব থাকবে। ভারত সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সেক্রেটারী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকেই "গণভোট" পরিচালক পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু তিনি কাশ্মীর সরকারের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন। সেই অবস্থায় তাঁর কর্মচারী নিয়োগ করবার, গণভোটের নিয়ম পদ্ধতি রচনার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এই যে এই সবগুলিই কাশ্মীর সরকারের নামেই করা হবে। ভারত সরকারকে আরও দায়িত্ব নিতে হবে যে গণভোট পরিচালক যাকে মনোনীত করবেন তাকেই কাশ্মীর সরকারের "স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট"রূপে নিয়োগ করতে হবে। গণভোট পরিচালকের সরাসরি চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের ক্ষমতা থাকবে,—তা ভারত সরকারই হোক, পাকিস্তান সরকারই হোক, বা কমিশনই হোক—সকলের সঙ্গেই। তাঁর কর্মচারীবৃন্দ সম্পর্কে কাশ্মীর সরকারের প্রকাশ্যে কতকগুলি ঘোষণা পূর্বাহ্নেই করতে হবে, এবং রাজ্যের সকল কর্মচারীই তা মানতে বাধ্য থাকবেন। গণভোটের সময় রাজ্যের অধিবাসীদের রাজনৈতিক

স্বাধীনতা সহ রাজ্যে ইচ্ছামত ঢোকবার ও বাইরে যাবার স্বাধীনতা দেবার ঘোষণাও করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্ত করতে হবে এবং রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের নাগরিকদের কাশ্মীর ত্যাগ করতে হবে।

এখানে বলা দরকার যে ২০শে জানুয়ারীর প্রস্তাবে পরিষদ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে (শুধু কাশ্মীর নয়) একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। বর্তমান প্রস্তাবে উক্ত কমিশনের সভ্য সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৫ জন করা হলো; এবং কমিশনকে প্রয়োজন মত রাজ্যে "পরিদর্শক" নিয়োগ করবার ক্ষমতাও দেওয়া হলো। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠি কমিশনের কার্য ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেন ৩রা জুন তারিখের গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে। এই প্রস্তাবটী আনেন বৃটিশ প্রতিনিধি পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়েই এবং তাতে বলা হলো যে পাকিস্তান কর্তৃক আনীত তিনটি অভিযোগ, যথা—জুনাগড়, ভারতবর্ষে মুসলমান হত্যা, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ—এ বিষয়েও বিবেচনা করে রিপোর্ট দাখিল করবার ক্ষমতাও কমিশনকে দেওয়া হলো। মূল প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হলে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার উদ্দেশমূলকভাবে গঠিত এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন প্রসঙ্গে কঠোর ভাবে বললেন যে, যে বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়েছিল সে বিষয়ে খুব সামান্যই বিচার করা হয়েছে। "এই প্রস্তাবে কোথাও পাকিস্তানের কর্তব্যের ত্রুটির উল্লেখ খুঁজে পাওয়া ভার।...যতক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে আইন-সঙ্গত ভাবে যুক্ত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মীরকে বহিরাক্রমণ হ'তে রক্ষার দায়িত্ব কখনই ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে না।...গণভোট পরিচালক কেন পূর্বাহ্নেই রাজ্যের সৈন্য ও পুলিশ বিভাগের ওপর সর্বাত্মক ক্ষমতা চাইছেন? ... কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীকে হটিয়ে কেন অপর সৈন্যদলের প্রবেশ পরিষদ

চান ? উহা কি পরোক্ষভাবে আক্রমণে সহায়তা করবার অভিযোগ অভিযুক্ত পাকিস্তান বাহিনীকে কাশ্মীরে ঢুকিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই করা হয় নাই ? এই কার্যের পরিণাম ভয়ানক—এবং ভারতবর্ষ কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারে না।...কাশ্মীরের শাসনকে অচল করবার উদ্দেশ্যে যে পরস্পর-বিরোধী আদর্শের রাজনৈতিক দলের 'সংযুক্ত শাসন' গঠনের জন্য বলা হচ্ছে তাও এস্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতবর্ষ এরূপ সংযুক্ত মন্ত্রীসভার কার্যের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছে"।

অপর পক্ষে পাকিস্তান প্রতিনিধিও উক্ত প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন না; কারণ তাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করা হয় নাই।

পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই-এর অধিবেশনে (২৪শে এপ্রিল) ঘোষণা করলেন "ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা অসম্ভব।...যতক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত আছে ততক্ষণ তাঁকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। যে কেউ কাশ্মীরের ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করতে আসবে তাকে যুদ্ধ দ্বারা অভ্যর্থনা করাই আমাদের কর্তব্য।"

কিন্তু ভারতবর্ষের আগেই কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জমায়েৎ ন্যাশনাল কনফারেন্স সর্বসম্মতিক্রমে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ২২শে এপ্রিল তারিখ কনফারেন্সের জরুরী জেনারেল কাউন্সিলের প্রস্তাবে বলা হ'ল যে, এই প্রস্তাব একদিকে যেমন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কতদূর স্বার্থান্ধ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, অপর দিকে তেমনি এর উদ্দেশ্য হ'লো জাগ্রত কাশ্মীরের জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে দেওয়া। দীর্ঘ ১৭ বৎসর সংগ্রামের পর কাশ্মীরের জনগণ যে স্বাধীনতা অর্জন ক'রেছে তা'তে বাইরের কোন হস্তক্ষেপই তারা আর বরদাস্ত করবে না।

প্রস্তাবে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংগ্রামী জনগণকে উক্ত প্রস্তাবের কার্যাবলী তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার জন্য আহ্বান করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের জনপ্রিয় সরকারকেও অনুরোধ করা হলো যেন সমস্ত রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সরকার প্রস্তুত থাকেন। বলা বাহুল্য শের-ই-কাশ্মীর সেখ আবদুল্লাই এই সভার সভাপতিত্ব করেন। বিখ্যাত ভারতীয় সাহিত্যিক ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ আগস্ট মাসে লণ্ডণে মিঃ চার্চিল প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের স্বাধীনতা লাভ করবার পরেও তর্জন-গর্জন এবং নিরাপত্তা পরিষদের কার্যের ধারা দেখে মন্তব্য করেন যে, রাষ্ট্র সঙ্ঘের কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অসহ্য।

নিরাপত্তা পরিষদের "অন্যায় এবং অহেতুক" প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশময় বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যাতে সুসঙ্গতভাবে হয় তার ব্যবস্থাও করা হলো। এই দেশময় প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে কনফারেন্সের সদস্য সংখ্যাও বেড়ে প্রায় ৭ লক্ষ হ'য়ে দাঁড়ালো।

* * *

"রাষ্ট্র সঙ্ঘের উপদেশ ত' ভালই"—মন্তব্য করলেন ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী।

"ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে এরূপ উত্তর অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়। তাঁরা এরূপ বলতে বাধ্য"—মন্তব্য করলেন মিঃ আয়েঙ্গার নয়াদিল্লীতে ৬ই মে এক প্রেস প্রতিনিধির নিকট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখানের কথা ঘোষণা প্রসঙ্গে। ইতি-পূর্বেই পণ্ডিত নেহরু ১লা মে তারিখ নয়াদিল্লীতে আর একটী সাংবাদিক সভায় স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান প্রস্তাবের কোন আইনগত ভিত্তি নাই, ইহা উপদেশ মাত্র।...সুতরাং কোন

গভর্ণমেণ্টেরই ওপর ইহাকে চাপিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ৫ই মে (১৯৪৮) তারিখ যে পত্র রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভাপতির নিকট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হ'লো তা'তে পরিষদের প্রস্তাবের আপত্তিকর অংশ সম্বন্ধে প্রতিবাদ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে গঠিত সর্ত্ত পূরণের দায়িত্ব গ্রহণের অসম্মতির কথা জানানো হ'লেও তা'তে কিন্তু একথাও বলা হলো যে এই আপত্তি সত্বেও যদি পরিষদ কমিশন পাঠাতে স্থির করেনই তবে "ভারত সরকার আনন্দের সঙ্গে এবিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করবে"!

২৬শে মে আমেরিকার প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে একটু মেজাজের সঙ্গে যে কথা বললেন তার সহজ অর্থ হলো এই যে, আমাদের কাছে এলে আমাদের কথাও শুনতে হবে। সেখ আবদুল্লা কিন্তু ২৫শে মে শ্রীনগরে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, "কাশ্মীরের নরনারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের কমিশন পাঠাবার কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও কমিশন গঠিত হ'ল পাঁচটী দেশের প্রতিনিধিকে নিয়ে। ভারত সরকার পূর্বেই (১) চেকোস্লোভাকিয়াকে কমিশনে নিজ প্রতিনিধি মনোনীত ক'রেছিলেন, পাকিস্তান ক'রলেন (২) আর্জেন্টিনাকে, এবং পরিষদের পক্ষ থেকে (৩) বেলজিয়ম ও (৪) কলম্বিয়াকে মনোনীত করা হলো। চেকোস্লোভাকিয়া এবং আর্জেন্টিনা উভয়ে আর একজনকে মনোনীত করার ব্যাপারে একমত হ'তে না পারায় পরিষদের সভাপতি (৫) আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রকে মনোনীত করলেন। কমিশনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন ডাঃ আলফ্রেড লোজানো। এবং ঠিক হলো প্রতিমাসে সভাপতি বদলাবে। এই পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কমিশন ১০ই জুলাই দিল্লীতে এসে হাজির হলেন প্রায় ২০ জন বিদেশী

কর্ম্মচারীসহ। ভারত সরকার সসম্মানে আপ্যায়ণ ক'রে বিকানীর ও ফরিদকোটের মহারাজার দিল্লীর প্রাসাদে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন; এবং মিঃ ভেল্লোদীকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

৩০শে আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যাকে জরুরী বলে ঘোষণা করবার জন্য একটা প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন দলের নেতৃত্বে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। সোভিয়েট এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবার জন্য ভোট দেন। কিন্তু বিপক্ষে সংখ্যাগুরুদল থাকায় এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সঙ্গেই কাশ্মীর কমিশনের জন্য একজন সামরিক পর্যবেক্ষক এবং শান্তি পর্যবেক্ষকের ব্যবস্থা করতে কিন্তু এরা ভুললেন না। সামরিক পর্যবেক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন কুখ্যাত জেনারেল ডেলভয়; এবং ৬০ জন পর্যবেক্ষকের মধ্যে আমেরিকার ভাগ হলো অর্দ্ধেক। বাকি সংখ্যা কানাডা, নরওয়ে, বেলজিয়ম ইত্যাদির মধ্যে ভাগ হয়। বলা বাহুল্য, এরা সকলেই ঝানু সামরিক বিশেষজ্ঞ। সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ গ্রোমিকো ভাবগতিক দেখে পূর্বাহ্নেই (২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮) এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে যে পথ গ্রহণ করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, নামে ইহা নিরাপত্তা পরিষদের কমিশন হলেও এই কমিশনের পরিষদের সঙ্গে মাত্র কাগজে-পত্রে সম্পর্ক থাকবে। যদি নিরাপত্তা পরিষদেরই পক্ষে এই কমিশন নিযুক্ত হয় তবে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নিয়েই, তা গঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর মত গ্রহণ করা হলো না।

কাশ্মীর কমিশনের কীর্তি

কমিশন দুই মাস সলা-পরামর্শ করে ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট প্রস্তাব করলেন যে, (ক) উভয় সরকারকে জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনে অবিলম্বে

যুদ্ধ-বিরতি (Cease-fire) চুক্তি কার্যকরী করতে হবে, এবং কোনরূপ সামরিক শক্তি আর বৃদ্ধি করা চলবে না একথাও স্বীকার করতে হবে। (খ) পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে যা বলেছে কার্যত কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধরত থাকায় বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীর রাজ্য ত্যাগ করতে হবে এবং উপজাতীয় হানাদারদের ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা পাকিস্তানকে করতে হবে ; এবং তাদের সৈন্যবাহিনীর স্থলে ঐস্থানের শাসন-ব্যবস্থা জম্মু ও কাশ্মীরের আইন গঠিত সরকারের অধীনে যাবে না। ঐ সব অঞ্চলে (মিরপুর, পুঞ্চ, মুজফরাবাদ, বালটিস্থান, গিলগিট) বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা চালু আছে—অর্থাৎ নামে "আজাদ কাশ্মীর," কার্যত পাকিস্তানের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অনুচরের দঙ্গল—তাদের হাতেই থাকিবে। কমিশনের অধীনেই এই শাসন ব্যবস্থা চলবে। অপর দিকে কাশ্মীর রাজ্য থেকে ভারতীয় বাহিনীকে কমিশনের সুপারিশ মত সরিয়ে নিতে হবে ; এবং স্থায়ী শান্তি চুক্তির (Truce Agreement) জন্য আলোচনা করতে হবে। (গ) স্থায়ী শান্তি চুক্তি হবার পর গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য কমিশনের সঙ্গে উভয় গভর্ণমেণ্টকেই আলোচনা করতে হবে।

এখানে বলা দরকার যে কমিশন কাশ্মীরে পদার্পন করলে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে যে খোলাখুলি ভাবে যুদ্ধ করছে তা দশ মাস যুদ্ধ করবার পর হাতে হাতে ধরা পড়ে ; এবং পাক-পররাষ্ট্র সচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ ২রা আগস্ট ওজর দেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ইপির ফকিরের বাহিনীর ভয়েই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে ঢুকে যুদ্ধ সুরু করেছে!

পণ্ডিত নেহরু ২০শে আগস্ট কমিশনকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পত্র দেন তাতে তিনি জানালেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট

আজাদ কাশ্মীরকে স্বীকার করে না, মুক্ত অঞ্চল কাশ্মীরের আইনত সরকারের অধীনে আসবে, কাশ্মীরকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবার মত উপযুক্ত ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে থাকবে, এবং গণভোট ব্যবস্থায় পাকিস্তানের কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু গিলগিটকে হানাদারদের দখলে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে বলে মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কমিশনের এই প্রস্তাব গ্রহণের সর্ত হিসাবে এমন সব প্রস্তাব করা হলো যা প্রস্তাবের প্রত্যাখানের সামিল। বিশেষ ক'রে পাকিস্থান দাবী করল যে "আজাদ কাশ্মীর" যে অঞ্চল দখল ক'রে আছে তা তাদের অধীনেই থাকবে এবং যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে তাদেরও মতামত গ্রাহ্য করতে হবে। লক্ষ্য করবার বিষয়, কমিশনও ভারতকে দিয়ে সেই প্রস্তাব পরোক্ষে মানিয়ে নিতে চাইল। আজাদ কাশ্মীরের নায়ক সর্দার ইব্রাহিম কিন্তু ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) এক বিবৃতিতে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে যুদ্ধের কথাই ঘোষণা করলেন।

কমিশন ব্যর্থ হয়েই ২১শে সেপ্টেম্বর ২মাসের ওপর দূতিয়ালীর কাজ করে প্যারিসে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য যাত্রা করলেন। সেখানে অচলাবস্থা ও তাদের অকৃতকার্যতার কথা উল্লেখ করে এক রিপোর্ট দাখিল করেন। ইতিমধ্যে, মিঃ জিন্নার মৃত্যু (১১ই সেপ্টেম্বর) ও হায়দরাবাদে ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশের পর নিজামের আত্মসমর্পন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী হানাদারদের নিয়ে এই সময় কারগিল ও লাদকের পথে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাদের প্রতি-আক্রমণ করলে পাকিস্তান ইউ-এন-ওতে দাবী করে এই প্রতি-আক্রমণ থামাবার জন্য! অর্থাৎ তারা চাইলেন যে পাকিস্তানী সৈন্য আক্রমণ করবে আর ভারতীয় সৈন্য তা যেন না ঠেকায়। এসম্পর্কে ২রা

জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের "আবেদন" সত্ত্বেও পাকিস্তান গত ৬মাস যাবৎ পুরোদমে "আজাদ কাশ্মীর" বাহিনীকে শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করিয়ে কাশ্মীরকে গ্রাস করবার সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক কাজ করছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কাশ্মীর কমিশনের নাকের ডগার উপর দিয়েই পাকিস্তান এই সামরিক প্রস্তুতি চালায়; যা শেষ পর্য্যন্ত ৩২টী ব্যাটেলিয়ানে ৪০ হাজার সৈন্যবাহিনীর "আজাদ" বাহিনীতে পরিণত হয়। কমিশন এবিষয়ে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে নীরব দর্শকের অভিনয় ক'রে এই সামরিক প্রস্তুতিতে সময় দেয় এবং না দেখার ভান ক'রে পাকিস্তানকে সাহায্যই করে। ঠিক এই সঙ্গেই 'লণ্ডন টাইমস' মাতব্বরির সুরে বললেন—"অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নাই।... উভয় পক্ষই যদি কিছুটা ছেড়ে দিতে রাজী থাকে তবেই মীমাংসা হ'তে পারে। সমাধানের জন্য অপরিহার্য রূপে কাশ্মীর বিভাগ মেনে নিতে হবে" ৩-১২-৪৮। কলকাতার স্টেট্‌সম্যানও ইতিমধ্যেই কাশ্মীর বিভাগের জন্য পাক-ভারতের এক গোপন আলোচনার কথা ফলাও ক'রে প্রচার করে ২৬-১১-৪৮ তারিখ। সংশ্লিষ্ট সরকারীমহল কিন্তু এই সংবাদ অস্বীকার করেন। স্টেটস্ম্যান বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পরের দিন ভারত সরকারের বিবৃতি ছাপালেন যে এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু স্টেটস্ম্যানের উদ্দেশ্য যে কল্পনা নয় তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

যুদ্ধ বিরতি

প্যারিসে রাষ্ট্র সঙ্ঘের বৈঠকের সময় পণ্ডিত নেহরু উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কমিশনের সঙ্গে আলোচনার যে সূত্রপাত হয় সেই পথে কমিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ লোজানো এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘের সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ডাঃ কোলবান ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী ও করাচিতে আরও আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে ১৯৪৯ সালের ১লা

জানুয়ারী তারিখ রাত্রি ১১-৫৯মিঃ সময়ে কাশ্মীরে জম্মু থেকে আরম্ভ ক'রে লাদাকের উপত্যকা পর্যন্ত প্রায় ৮শত মাইল চক্রাকারে বেষ্টিত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ বিরতি হয়। ১৩ই আগস্টের প্রস্তাবের ১ম সর্তের নামে এই যুদ্ধ-বিরতি হলো।

কাশ্মীরে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কাশ্মীর সংগ্রামের ১ বৎসর ২ মাস পর ভারত ও পাকিস্তান গ্রহন করলেও ৫ই জানুয়ারী (১৯৪৯) যে সর্তাবলী কমিশন লেক সাকসেস্ থেকে প্রকাশ করলেন তাতে বোঝা গেল সমস্যার সমাধান কমিশনের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নয়। প্রস্তাবের মূল বিষয় হলো—(১) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক ব্যক্তির কাশ্মীরে গণভোট পরিচালক নিয়োগ, (২) ১৩ই অগস্টের চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি ও স্থায়ী শান্তির নামে কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য উঠিয়ে আনবার জন্য ফাঁদ তৈরী করা। (৩) বর্তমানে শত্রু অধিকৃত অঞ্চল থেকে পাকিস্তান বাহিনীর অপসারণের বিষয়ে নীরব থাকা। বোঝা গেল কাশ্মীর বিভাগের প্লান চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে।

৮ই জানুয়ারী (১৯৪৯) স্টেট্সম্যান দিল্লী থেকে স্পষ্টই জানালো যে প্রস্তাবটি দু'টি পরস্পর বিরোধী পক্ষের "বাস্তব আপোষনামা"। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব লোভেট ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে কমিশনের প্রস্তাব মেনে নেবার জন্য অভিনন্দন করলেন। পণ্ডিত নেহরু ও জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁও তাঁকে তার যোগে (১২-১-৪৯) জানালেন যে, তাঁরা শান্তিপূর্ণ পথেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ক'রে নেবেন। কাশ্মীর সমস্যায় আমেরিকার বিশেষ দরদ এখন থেকে ক্রমশ খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ পেতে থাকে। কমিশনের প্রস্তবের গূঢ় তাৎপর্য ভারত সরকারের দৃষ্টি অবশ্য এড়িয়ে যায়নি। ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুদিনের বৈঠকে ভারত সরকারের মনোভাব ইউ-এন-ও'র বিশেষ প্রতিনিধি ডাঃ লোজানো

ও মিঃ কোলবানের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত ক'রে বললেন যে, পাকিস্তান কমিশনের সর্তানুযায়ী শান্তির পথে সমস্যা সমাধানের জন্ম কাজ না করলে ভারতবর্ষ কমিশনের সর্ত মানতে বাধ্য থাকবে না। আজাদ কাশ্মীর বাহিনী ভেঙে দেবার ব্যাপারেও তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী জানালেন। আলাপের খসড়া থেকে জানা যায় যে, এ বিষয়ে নাকি কমিশনের প্রতিনিধিরা পণ্ডিত নেহরুর পক্ষেই মত দেন। পণ্ডিত নেহরু আরও বললেন যে, গণভোট গ্রহণ করা কাশ্মীরে সম্ভবপর না হলে অন্য কোন উপায়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। অনেকেই একে কাশ্মীর বিভাগের পূর্বাভাষ বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ১৬ই জানুয়ারী (১৯৪৯) ঘোষণা করলেন যে, বর্তমানে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা কাশ্মীরের অধিকৃত অংশ "আজাদ কাশ্মীরের" অধীনে থাকবে এবং "আজাদ বাহিনী"কে ভেঙে দেওয়া হবে না এই সর্ত কমিশন মেনে নিয়েছে বলেই পাকিস্তান ১৩ই আগস্টের প্রস্তাব গ্রহন করেছে! কমিশনের এই দু'মুখো নীতির আরও চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল যখন 'লণ্ডন টাইমস্' ১০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) এক সম্পাদকীয়তে স্বীকার করলো যে, কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের কাছে পরস্পর-বিরোধী আশ্বাস দিয়েছিল। এই দু'মুখো খেলা খেলে কমিশনের সদস্যবৃন্দ লেক সাকসেসে চম্পট দিলেন; কিন্তু তার বিষময় ফল হ'ল এই যে বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধ বিরতির ভাওতায় কাশ্মীরের শত্রু অধিকৃত এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হলো না ; এবং পাকিস্তানের চমূদিগকে কাশ্মীরে নির্বিবাদে শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়বার সুযোগ ক'রে দেওয়া হলো; এবং গণভোটের আশ্বাসে সাম্প্রদায়িক হানাদারদের কাশ্মীরের অধিকৃত অংশ থেকে হটিয়ে না দিয়ে ভালভাবে বসবার সুযোগ ক'রে দেওয়া হলো। কিন্তু জনমতকে বিভ্রান্ত করবার

জন্য স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা ৩রা ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সংবাদ পরিবেশন করলো যে হানাদারেরা কাশ্মীর থেকে দলে দলে চলে যাচ্ছে ; ১০ই ফেব্রুয়ারী আরও খবর দিল যে, অধিকৃত এলাকার লোকেরা পাকিস্তানের দিকেই এখন চেয়ে আছে (স্টেট্‌সম্যান, ৪ঠা ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাউলপিণ্ডি থেকে বিশেষ সংবাদদাতার তার)। এই সব কাণ্ড কারখানা থেকে বোঝা গেল কাশ্মীরের দুই পাশে দু'টি বিপরীতমুখী সরকারকে বসিয়ে পরস্পরের মধ্যে বাক বিতণ্ডার সুযোগ ক'রে দিয়ে, কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবার চক্রান্তই ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী করে গেলেন। স্টেটস-ম্যান ১৬ই ফেব্রুয়ারী সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল যে "ডি ফ্যাকটো" (বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান) "আজাদ সরকারের" অধিকৃত অঞ্চল পরিদর্শন করবার জন্য আর একটি সাব-কমিশনও নিযুক্ত হচ্ছে! আর এই "বাস্তব" অবস্থাকে স্থায়ী করবার উৎসাহে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা "আজাদ কাশ্মীর সরকারের" টেণ্ডারের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত ছাপাতে সুরু করলে দেশে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। লক্ষ্ণৌর "ন্যাশনাল হেরাল্ড" মন্তব্য করলেন যে, ১৫ই আগস্টের পর যদি কেউ সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়ে থাকে তবে স্টেট্‌সম্যানই পেয়েছে ; পত্রিকাটি হুঙ্কার দিলেন যে, "স্টেট্‌সম্যান আত্মবিক্রয় করে 'ভারত ছাড়'।"

মিঃ এটলি-ট্রুম্যানের "আবেদন"

কমিশন মার্চ মাসে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করলো যাতে কাশ্মীরে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ-বিরতি হবার পর (১৭ জুলাই) "স্থায়ী শান্তি"-চুক্তি সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কয়েক বার চেষ্টার পর সেপ্টেম্বর মাসে এই চেষ্টা ব্যর্থ হলো বলেই কমিশন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ব্যর্থতার প্রথম কারণ পাকিস্তানের "আজাদ বাহিনী" ভেঙে দিতে

অসম্মতি। বিশেষ করে শত্রু-মুক্ত উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীরের আইনত গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠার দাবিকেও পাকিস্তান গ্রহন করলো না। অপর পক্ষে কাশ্মীরের সমস্যাকে "কোন একজনের" ওপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির (Arbitration) ভার দেবার প্রস্তাব করলেন কমিশন। পাকিস্তান কিন্তু সানন্দে এই প্রস্তাব মানল। কিন্তু ভারতবর্ষ স্পষ্টভাবেই জানালো যে, কোনো জাতি বা দেশের ভাগ্য যে-কোন একজনের ওপর ছেড়ে দিতে ভারত রাজি নয়। কাশ্মীরের সমস্যার মূল কারণ দূরীভূত না হলে সমাধান অসম্ভব।

ইতিমধ্যে মার্চ মাসে রাষ্ট্র সঙ্ঘের পক্ষ থেকে **প্রাক্তন মার্কিন নৌসচিব এ্যাডমিরাল নিমিৎসকে** কাশ্মীরে গণভোট পরিচালক নিযুক্ত করা হলো। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহনকালে তাঁর ৩ হাজার লোকের প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য ৯০ লক্ষ ডলার খরচ ভারত ও পাকিস্তানকে দিতে হবে। তিনি আরও দাবী করলেন যে, এই ৩ হাজার লোক অন্য কোন দেশের হলে চলবে না, তাঁরা হবেন মার্কিন সৈন্য বা নৌবাহিনীর লোক!

এ্যাডমিরাল নিমিৎসের নিয়োগ এবং কমিশনের নূতন প্রস্তাবের (অর্থাৎ একজনের হাতে চূড়ান্ত সালিশীর ক্ষমতা দেওয়া) সঙ্গে সঙ্গে ৩১শে আগস্ট সমস্ত জগৎকে চমকিত করে সরাসরি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী এটলী পণ্ডিত নেহরুর কাছে "কড়া আবেদন" ক'রে বললেন যাতে কমিশনের শেষ প্রস্তাব পণ্ডিত নেহরু মেনে নেন।

এলাহাবাদে ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বললেন—"এই ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও প্রধান মন্ত্রী এটলীর হস্তক্ষেপে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কাশ্মীর-সমস্যার মূল কারণকে বুঝবার এবং তার সমাধানের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। সমস্যার মূল কেন্দ্র হলো—ভারতবর্ষের এক অংশ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হানাদারেরা

আক্রমণ করেছে, তথাকার নরনারীকে হত্যা ও লুণ্ঠন করে আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘণ করেছে ; এবং তা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য আক্রমণ।" তিনি আরও বললেন, "হিন্দু-মুসলিম জনতার ঐক্যবদ্ধ কাশ্মীর মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের দুই জাতি-তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট উত্তর। ...কিন্তু পাকিস্তানের মতই রাষ্ট্র সঙ্ঘও চান যে যেহেতু কাশ্মীরের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান সেই হেতু কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দিক্।"

একদিকে ভারত সরকার যেমন এই "সালিশী" প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, তেমনি কাশ্মীরের মুক্তি-আন্দোলনের জমায়েৎ ন্যাশনাল কনফারেন্সও ২৭শে সেপ্টেম্বর বাৎসরিক সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে এই সালিশীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। শুধু তাই নয়, সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্যের মত হলো এই যে, ইউ-এন-ও থেকে ভারতবর্ষ কাশ্মীর সংক্রান্ত অভিযোগ উঠিয়ে নিয়ে আসুক। কিন্তু সেখ আবদুল্লার অনুরোধেই মাত্র এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহন করা হয় না ; কারণ সেখ সাহেব স্পষ্টই বললেন যে, এবিষয়ে আমরা পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গেই থাকবো ! যদিও তিনি স্বীকার করলেন যে, সালিশীর পথ 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিউনিকে'রই পথ মাত্র !

কমিশনের ব্যর্থতা ও ডেলভয়ের অপকীর্তি

গত ১১ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এক বৎসরের চেষ্টার ব্যর্থতার কথা কাশ্মীর কমিশন ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক রিপোর্টে ব্যক্ত করেন।

যে সকল কারণে কমিশন অচল-অবস্থায় এসেছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলিই প্রধান বলে তারা মনে করেন :—(ক) আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর ভবিষ্যৎ, (খ) কাশ্মীর থেকে ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর অপসারণ, এবং (গ) উত্তর অঞ্চলীয় এলেকা, পার্বত্য

এলেকা ও পাকিস্তান সীমান্তবর্তী কাশ্মীর এলেকার অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা। কমিশন সিদ্ধান্ত করলেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে মতভেদ এরূপ দুরতিক্রম্য যে, কোনরূপ আপোষের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কমিশন অমিমাংসীত বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য "ব্যাপক ক্ষমতা ও অবিচ্ছিন্ন দায়িত্ব" দিয়ে একজন ব্যক্তিকে নিয়োগের সুপারিশ করলেন।

এই রিপোর্টে জানা গেল যে, পাকিস্তান সরকারীভাবেই স্বীকার করেছে যে 'আজাদ কাশ্মীর' বাহিনীর নেতৃত্ব ও সংগঠন তারাই করছেন।

পাকিস্তানের আক্রমণকারী হানাদারদের সন্তুষ্ট ক'রে বিভক্ত কাশ্মীরে শান্তি প্রচেষ্টার পেছনে যে গোপন ইচ্ছা থেকে যাচ্ছিল তা ট্রুম্যান-এটলী "কড়া আবেদনের" মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পরে। কলকাতার দৈনিক বসুমতি এই বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যে "সমস্ত ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও কাশ্মীর কমিশন আজাদ কাশ্মীর ফৌজ ভাঙিয়া দিবার সুপারিশ করেন :নাই। প্রকৃত পক্ষে একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ হইলে যাহাতে কাশ্মীরের অংশ বিশেষ ব্রিটীশ ও আমেরিকান সৈন্যের ঘাঁটী স্থাপন করা যায়, সেই দিকেই কাশ্মীর কমিশনের লক্ষ্য। শান্তি স্থাপন একটা উপলক্ষ্য মাত্র"—১০ই আশ্বিন ১৩৫৬ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্য)। অপর দিকে কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ডেলভয় অক্টোবর মাসে এক হীন ষড়যন্ত্রের কাজে হাতে-নাতে ধরা পড়েন। তিনি শ্রীনগরে শত্রুর চর জনৈক ধনী পরিবার (সর্দার এফেন্দি ও তাঁর ফরাসী রূপসী স্ত্রী বেগম এফেন্দি) যারা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের রাউলপিণ্ডিতে পলায়িত তাদের কতকগুলি মূল্যবান আটক সম্পত্তি কমিশনের বিমানযোগে গোপনে শ্রীনগরের একটি বৃটিশ ব্যাঙ্ক থেকে অপসারণ করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের একজন মুখপাত্র এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এসব দেখে শুনে মনে

হয় কমিশনের এই রকম সদস্য শুধু সামরিক পরিদর্শকই নহেন, তাঁরা আরও কিছু। এই সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্যাদি যে শত্রুপক্ষের হাতে যায় নাই তারই বা কী নিশ্চয়তা আছে ?

এসম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা খুব বেশী কিছু নাই তার প্রমান পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। ডাঃ জে. কে. ব্যানার্জি কাশ্মীর থেকে ঘুরে এসে যে প্রবন্ধাবলী আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন তা থেকেই জানা যায় যে, "কাশ্মীর কমিশন যখন কাশ্মীরে উপস্থিত ছিল তখন একদল ইংরেজকে গুপ্তচর সন্দেহ করিয়া কাশ্মীর হইতে বিতাড়ন করা হয়। কি করিয়া ঐ ব্যক্তি সংবাদ সরবরাহ করিত তাহা লইয়া তখন যথেষ্ট গবেষণাও হইয়াছিল।" ৫ই অক্টোবর আরও একটী সংবাদ প্রকাশ পায় যে কমিশনের জন্য যে বিমান দেওয়া হয়েছিল, সেই বিমানে ক'রে একজন "আর, এ, এফ" অফিসার গোপনে সন্দেহজনক ভাবে কাশ্মীরে ঢুকলে কাশ্মীর সরকার তাঁকে আটক ক'রতে বাধ্য হন।

ডাঃ চাইলের রিপোর্ট

১৭ই ডিসেম্বর ভারত কর্তৃক মনোনীত কমিশনের চেক্ প্রতিনিধি ডাঃ অল্ডরিক চাইলে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে পৃথক রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে তিনি কমিশনের বিরুদ্ধে এমন কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ করেন যাতে কমিশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সন্দেহ গভীরতর হয়। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন যে প্রথমত কমিশন সালিশীর প্রস্তাব ক'রে ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করেছে ·কারণ কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে সালিশীর কথা ছিল না; দ্বিতীয়ত সালিশী নিয়োগের গোপন প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তানের নিকট দেবার পূর্বেই মিঃ এট্‌লি ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট গোপনে পৌছিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁরা এবিষয়ে জনমতের চাপ সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তৃতীয়ত

"আজাদ কাশ্মীর" বাহিনী ছত্রভঙ্গ করবার ব্যাপারে এবং কাশ্মীরের উত্তর অঞ্চল কাশ্মীরের আইনত সরকারের অধীনে আনবার জন্য ভারত কর্তৃক সুস্পষ্ট নীতি গ্রহন করা সত্বেও কমিশন কোন নির্দিষ্ট মত ও পথ গ্রহন না ক'রে সমস্যাকে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঝুলিয়ে রেখে "আজাদ কাশ্মীর" বাহিনীকে বাড়বার সুযোগ দেয়। মোট কথা ডাঃ চাইলের রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশ পায় তা থেকে কমিশনের বাকি সদস্যবর্গ যে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থেই কাশ্মীর সমস্যাকে পরিচালনা করছেন তা প্রমাণ হয়। ভারতের জনসাধারণের মনে তখন এই কথাই জেগেছে যে "কমিশনের উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ মধ্যস্থতা নয়, অন্য কিছু"। ডাঃ চাইলে তাঁর রিপোর্টে প্রস্তাব করলেন যে কমিশন যাতে কোন রাষ্ট্রগোষ্ঠির স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে বিশ্ব-শান্তির জন্যই কাজ করতে পারে তজ্জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ১১ জন সদস্য নিয়ে নূতন কমিশন নিয়োগ করা হোক। বলা বাহুল্য তা গ্রহন করা হয় না।

ম্যাকনটনের চাল

কাশ্মীরে যে অচল অবস্থা ইচ্ছা করেই ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী কমিশনের মাধ্যমে সৃষ্টি করছে, সেই অবস্থার সুযোগে জেনারেল ম্যাকনটন এই বৈঠকেই প্রস্তাব করলেন যে :—(ক) গণভোট গ্রহনের পূর্বেই প্রধান সর্ত হিসাবে কাশ্মীরে (শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে এবং মুক্ত অঞ্চলেও) সৈন্যবাহিনীকে কমিয়ে নিরস্ত্রীকরণ চালু করতে হবে এবং পাকিস্তানী হানাদার "আজাদ বাহিনী"র সৈন্যসংখ্যা কমাবার সর্ত হলো এই যে, কাশ্মীরের জাতীয় রক্ষী বাহিনী ও কাশ্মীর রাজ্যের সৈন্যদলেরও নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। এর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সংখ্যাও কমিয়ে আনলে পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনী ক্রমে কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চল থেকে সরে যাবে। অর্থাৎ কাশ্মীরকে পঙ্গু করতে

হবে। (খ) কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল, যা এখন শত্রু অধিকৃত হয়ে আছে তা কমিশনের অধীনে শত্রুর অধিকারেই থাকবে এবং কাশ্মীরের মুক্ত অঞ্চলের সঙ্গে তা যুক্ত হবে না। (গ) সৈন্য অপসারণের কাজ তদারক করবার জন্য আর একজন প্রতিনিধি কাশ্মীরে যাবেন। বলা বাহুল্য তিনি ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকেরই প্রতিনিধি হবেন। (ঘ) একাজ করা হলেই এই রন্ধ্র পথেই গণভোট পরিচালক মার্কিন নৌসচিব তিন হাজার মার্কিন বাহিনী নিয়ে গণভোটের কাজে "পঞ্জু" কাশ্মীরে ঢুকবেন! এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইংলণ্ডের নিউ কমনওয়েলথ সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, কাশ্মীরে "আন্তর্জাতিক" সৈন্যবাহিনী পাঠানো হোক্! মিঃ চার্চিল এই সভার সভাপতি এবং মিঃ এটলী এর সহ-সভাপতি।

বলা বাহুল্য, ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক ম্যাক্‌নটনের প্রস্তাবকে জোট বেঁধেই সমর্থন করলেন এবং পাকিস্তানী প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। আশ্চর্যের বিষয়, ভারতীয় প্রতিনিধি স্যার নরসিংহ রাও জেনারেল ম্যাক্‌নটনের প্রশংসায় হঠাৎ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। সোভিয়েট প্রতিনিধি কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে স্পষ্টই বললেন যে, ম্যাক্‌নটনের প্রস্তাব বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের আদর্শের বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যাক্‌নটন ১৭ই ডিসেম্বর থেকে দূতিয়ালীর কাজে লেগে যান।

ম্যাক্‌নটন যখন তাঁর এই প্রস্তাব নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দূতিয়ালীর কাজ করছিলেন তখন কানাডা পাকিস্তানের নিকট যুদ্ধোপকরণ বিক্রী করছিল; আর লর্ড ওয়াভেল বলছিলেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধে পাকিস্তানের গুরুত্ব খুবই বেশী। সুতরাং তাকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না।

ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ ও ৮ তারিখ ম্যাক্‌নটন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য মূলক ধারাগুলির বিরোধীতা করে স্যার নরসিং রাও স্পষ্ট করে বললেন যে, "আজাদ বাহিনী" ছত্রভঙ্গ করা হ'লে

পাকিস্তানী বাহিনী কাশ্মীর রাজ্য ত্যাগ করবার পর কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল কাশ্মীর সরকারের অধীনে না আসা পর্যন্ত অন্য কোন প্রস্তাব গ্রাহ্যই হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে পুঙ্গু করবার কোন প্রস্তাবই ভারত গ্রহণ করবে না। সর্বোপরি পাকিস্তানী প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রেসী (ব্রিটিশ) কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণের সাহায্য করবার পরামর্শ দিয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অপর সভ্য ভারতকে আক্রমণ করবারই পরামর্শ দিয়েছেন। এ বিষয়েও বিচার হওয়া দরকার। এই সব বিষয়ের মীমাংসা না হ'লে ভারতবর্ষ এরূপ কোন প্রস্তাব কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের নামে গ্রহণ করতে অক্ষম তা তিনি দৃঢ় ভাবেই জানালেন। কারণ ম্যাকটন প্রস্তাবে কাশ্মীর সমস্যার নীতিগত ও আইন-গত প্রশ্নকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইঙ্গ মার্কিন ব্লকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও কাশ্মীর কমিশনের সমাধি

ভারতবর্ষের শত আপত্তি সত্ত্বেও গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পরিষদের বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, নরওয়ে ও কিউবা একজোট হয়ে এক প্রস্তাব আনলেন যাতে কাশ্মীর কমিশনকে বাতিল ক'রে তার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্তাব গ্রহণের একমাসের মধ্যে একজন প্রতিনিধির হাতে দেওয়া হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকটনের প্রস্তাব অনুযায়ী ৫ মাসের মধ্যে সৈন্যাপসরনের কাজ শেষ করবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হলো। এই প্রতিনিধিটির পাঁচ দফা কাজের মধ্যে, (ক) নিরস্ত্রীকরন ও সৈন্যাপসরণের প্রস্তাব কার্যকরী করা এবং (খ) কাশ্মীর বিরোধ দ্রুত মীমাংসার জন্য উভয় সরকার ও রাষ্ট্র সঙ্ঘের সঙ্গে আলোচনা করে ৫মাসের মধ্যে যে কোন প্রস্তাব দাখিল করবার কাজই প্রধান। তা ছাড়া নিরস্ত্রীকরনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সময় বুঝে গণভোট পরিচালকের

কাজের সুযোগ করে দেবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ক'রে ৯ই মার্চ লেক সাকসেসে স্যার টেরেন্স সোন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বললেন যে, ম্যাক্‌নটনের প্রস্তাবের মূল বিষয়ই তাদের বর্তমান প্রস্তাবের ভিত্তি! ম্যাক্‌নটনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেন যে, ম্যাক্‌নটনের প্রস্তাব শুধু সবদিক দিয়ে ভাল এবং যুক্তিসঙ্গতই নয়, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—উত্তরাঞ্চলের (শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের) বর্তমান শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠি একরূপ খোলাখুলিভাবেই "আজাদ কাশ্মীর" হানাদার ও পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করতে আরম্ভ করলেন। ঠিক এই সময়েই (২০-৩-৫০) লণ্ডনের "ডেলী ওয়ার্কার" পত্রিকা এক বিশেষ-প্রবন্ধে প্রকাশ করে যে, কাশ্মীর সমস্যায় গ্রেট বৃটেন খোলাখুলিভাবেই ভারতের বিরোধিতা ক'রে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে এবং করছে। ভারতের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কেসকার ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ বেতার বি. বি. সি. প্রকাশ্যেই নিয়মিতভাবে 'বে-আইনী' "আজাদ কাশ্মীর" সরকারের বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বিবরণ প্রচার করে থাকে! ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠি কাশ্মীরের ব্যাপারে সমস্ত চক্ষু-লজ্জা ত্যাগ করে প্রকাশ্যেই কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলো। তাদের নিজেদের স্বার্থেই আজ তারা কাশ্মীর বিভাগের পথেই সমাধান চায়।

নিরাপত্তা পরিষদে ৯ই মার্চ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্যার নরসিং রাও সুর ঘুরিয়ে বললেন যে, ভারত সরকার কাশ্মীর কমিশনের পরিবর্তে এক জনের প্রতিনিধিত্ব গ্রহন করতে রাজী আছেন এই সর্তে যে, প্রতিনিধি ভারতের মনোমত হবেন। সরকারীভাবে ১৪ই মার্চ তারিখ ভারত

সরকার এই কথা নিরাপত্তা পরিষদকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ম্যাক্নটন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের যে আপত্তি ছিল বর্তমান প্রস্তাব গ্রহন করবার সময়ও সেই আপত্তি আছে। এই সর্তেই বর্তমান প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করছে।

ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার ঝানু আইনজ্ঞ স্যার ওয়েন ডিক্সনকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থ নিয়োগ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর চার মাসের প্রচেষ্টায় ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্টি পাকিস্তান ও ভারত সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও কাশ্মীরে তাদের নিজেদের মনোমত সমাধানের পথে যে অনেক দূর সাফল্য লাভ করেছেন তাতে কি সন্দেহ আছে? এমন কি পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত এখন বলতে সুরু করেছেন যে কাশ্মীর বিভাগ করেও এ সমস্যার সমাধান করতে তিনি রাজী হতে পারেন (১৬।১১।৪৯ তারিখের নয়াদিল্লীতে বক্তৃতা)। কিন্তু দেশ বিভাগ যে জাতীয়তাবাদের সর্বনাশ ডেকে আনে ও প্রতিক্রিয়াশীলদের তাণ্ডবে জনগণের জীবন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গৃহযুদ্ধের চোরাবালিতে ঠেলে দেয় তা' কি ভারত বিভাগ বিশেষ, ক'রে বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগের পরও প্রমান হয় নি? কাশ্মীরেও কী এই সর্বনাশা পন্থাই গ্রহন করা হবে?

চৌদ্দ

জাগ্রত কাশ্মীর কোন পথে ?

কাশ্মীরের অসমাপ্ত মুক্তি-আন্দোলনের আলোচনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, পরাধীন দেশের নরনারীর কাছে বিদেশী শৃঙ্খল মুক্তির আদর্শই শেষ কথা নয়, সেই আদর্শকে যে নেতা বা পার্টি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কাজ করবেন জনগণ তাঁকেই সমর্থন করে। কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স ইংরেজকে শুধু "ভারত ছাড়" বলেই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে ইংরেজদের পোষিত সামন্ত রাজকেও কাশ্মীর ছাড়বার চরম-পত্র দিয়ে ভারতের গণ-আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ঠিক এমন সময়ই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস আপোষ ক'রে ভারত বিভাগে সম্মত হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্স কিন্তু সামন্ত প্রথার সঙ্গে আপোষ না ক'রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কাশ্মীরের পুনর্গঠনের জন্য "নয়া কাশ্মীরের" নূতন দিনের ছবি লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, শোষিত মুক্তি পাগল জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে ঘোষণা করে 'লাঙ্গল যার জমি তার'। তাঁরা আরও বললেন, "শিল্পের জাতীয়করন করতে হবে। কৃষককে ঋণভার থেকে মুক্ত ক'রে তার হাতে জমি দিতে হবে, জনগণের শিক্ষা ও জীবিকা উপার্জনের গ্যারান্টি সরকারকে দিতে হবে।" কাশ্মীরে জনগণ তাদের এই পথের প্রথম বাধা দেখতে পেল মহারাজা স্যার হরি সিংকে। তাই যে মুহূর্তে সেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহকর্মীগণ বললেন ডোগরা রাজ "কাশ্মীর ছাড়" সেই মুহূর্তেই জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁরা লাভ করলেন! শুধু তাই নয়, এই বিপ্লবী গণ জোয়ারের সম্মুখে মিঃ জিন্না

ও তাঁর লীগের ভেদপন্থী সব বাধা পর্যন্ত ভেঙে যায়। কিন্তু এই বিপ্লবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পথে এল নূতন চক্রান্ত ও প্রতিবিপ্লব।

বিপ্লব না সংস্কার ?

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীরের আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ডোগরা রাজও এই আন্দোলনকে কী ভাবে দমন করেছে তা আমরা আগেই বলেছি। সেখ আবদুল্লা যখন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেলেন তখন ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের গতি তীব্রতর না হয়ে দেশ-বিভাগের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাশ্মীরের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেখ আবদুল্লাও কিন্তু এবার আর তাঁর সেই বিপ্লবী ধারা রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি এখন "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনের নূতন ব্যাখ্যা করে ৯ই অক্টোবর (১৯৪৭) যে বিবৃতি তাঁর কারামুক্তির পর শ্রীনগর থেকে দেন তাতে তিনি বললেন যে, "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবার পর ক্ষমতা জনগণের হাতে এলেও মহারাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে শাসন করতে পারবেন!

এর কয়েক দিন পরেই পাকিস্তানী হানাদারের দঙ্গল কাশ্মীর আক্রমণ করলে মহারাজা শ্রীনগর থেকে পালিয়ে যান, কিন্তু সিংহাসন বা ক্ষমতা কোনটা প্রজাসাধারণের হাতে অর্পন করলেন না। কাশ্মীরের বীর নও জোয়ানেরাই ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। ভারত সরকারের তরফ থেকে মহারাজার ওপর চাপ দেওয়া হয় জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার জন্য। মহারাজা প্রথমে সেখ সাহেবকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গ্রহন করতে অমত করেন; এবং তাঁকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনের সহকারী হিসেবে কাজ করতে বলেন! ইতিমধ্যে দেশীয় রাজ্য দপ্তরের

তার সর্দার প্যাটেলের হাতে পুরোপুরি এলে তিনি তাঁর প্ল্যানমত দেশীয় রাজাদের কখনও চোখ রাঙিয়ে, কখনও বা গণ-আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে কখনও-বা তাদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করে একে একে ভারত ডমিনিয়নের মধ্যে আসতে বাধ্য করেন।

সেখ সাহেবও ক্রমে এই পথই গ্রহন করেন। ২৩শে নভেম্বর এক জনসভায় মহারাজার প্রশংসা করেই তিনি বললেন যে, মহারাজা তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি আর অস্ত্রের সাহায্যে রাজত্ব না ক'রে প্রেমের দ্বারাই প্রজাদের হৃদয় জয় করতে চান! তিনি আরও বললেন যে, মহারাজা নাকি তাঁকে বলেছেন, যদি প্রজারা তাঁকে না চায় তবে তিনি রাজ্য ত্যাগ করতেও প্রস্তুত আছেন! কিন্তু রাজ্য ত্যাগ ত' দূরের কথা, প্রধান মন্ত্রীর পদে সেখ সাহেবকে নিযুক্ত করতেই তখনও টালবাহানা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসে মহারাজার সঙ্গে তাঁর আবার প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হলে তিনি উষ্মার সঙ্গেই বলেন যে, কাশ্মীরের নর-নারী গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। মহারাজাকে তাঁর প্রিয় পাত্র মেহের চাঁদ মহাজন কিম্বা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার—এই দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। যদি ক্ষমতা নিতেই হয় তবে সত্যি-কারের ক্ষমতাসহ পুরোপুরি দায়িত্বই নিতে হবে। আজকের অবস্থায় কাশ্মীরের জনগণকে বুঝতে দিতে হবে যে, তারাই এখন দেশের প্রকৃত শাসক (২৬-১২-৪৭)। তিনি ১০ই জানুয়ারী ('৪৯) আরও তীব্রভাবে বললেন, "মহারাজাকে আমরা মাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবেই মানতে পারি। যদি তিনি এতে সন্তুষ্ট না হন তবে কাশ্মীরে কোন মহারাজাই থাকবে না।"

এই সময় ডোগরা সৈন্য জম্মু এলেকায় যে মুসলমান হত্যা চালায় তার খবরে দেশভক্তমাত্রেই বিচলিত হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী মহারাজাকেই

এই কুকার্যের জন্য দায়ী করেন এবং দাবী জানান যে, শাসন-ক্ষমতা এখনই সেখ আবদুল্লার হাতে তিনি ছেড়ে দিন (২৫-১২-৪৭)।

সর্বনাশে সমুৎপন্নে……

মহারাজা যখন সেখ সাহেবের সঙ্গে টালবাহানা করছিলেন বিপদ তখন আর একদিক থেকে এসে উপস্থিত হলো। ১৯৪৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক সেখ আবদুল্লার খ্যাশনাল কনফারেন্সের "জরুরী শাসন ব্যবস্থা"র হাতে যে সামান্য ক্ষমতাটুকু এসেছে তাঁকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে এবং কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঢোকাবার জন্য এক যুক্ত শাসন পরিষদ গঠন করবার জন্য দাবী করতে থাকে। এই বিপদের মুখে জম্মুতে সর্দার প্যাটেল, কাশ্মীরের মহারাজা ও সেখ আবদুল্লার যুক্ত বৈঠকে শেষ পযন্ত মহারাজা স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মতি দিতে বাধ্য হন; একথা বলাই বাহুল্য সেখ সাহেবকেও সর্দার প্যাটেলের দেশীয় রাজ্য নীতিতে সম্মতি দিতে হয়। "বিপ্লবী" আবদুল্লাকে "আপোষ" করতে হলো।

১৯৪৮ সালের ১৮ই মার্চ তারিখ এই নূতন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহন করে। সেখ আবদুল্লা হলেন প্রধান মন্ত্রী, এবং অন্যান্য পদে গোলাম মহম্মদ বক্সী (সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র), মহম্মদ আফজল বেগ (আয়কর ও রাজস্ব), সর্দার বুধা সিং (স্বাস্থ্য ও পুনর্বসতি), গোলাম মহম্মদ সাদিখ (উন্নয়ন), গিরিধরীলাল ডোগরা (অর্থ) শ্যামলাল শরফ (খাদ্য) এবং কর্নেল পীর মহম্মদ খাঁ (শিক্ষা) নিযুক্ত হলেন। পীর মহম্মদ খাঁ মুসলীম কনফারেন্সের একজন প্রাক্তন সদস্য ও সভাপতি। হানাদার দলের আক্রমণের সময় মুসলিম কনফারেন্স কাশ্মীরের জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আক্রমণকারীদের মুক্তি ফৌজ বলে সাদর অভ্যার্থনা জানালে তিনি মুসলিম কনফারেন্সের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘৃণার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন

করেন। সেখ সাহেবও এই প্রবীন জননায়ককে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে মন্ত্রীসভায় স্থান দেন। নিরাপত্তা পরিষদে সেখ সাহেব এই কথা এক পত্র মারফৎ জানিয়ে দিলে পাকিস্তানী প্রতিনিধি ও ইঙ্গ-মাকিন ব্লক বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে। এখনও কাশ্মীরে এই মন্ত্রীসভাই বর্তমান।

গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য ভারতে যোগদান

সেখ আবদুল্লা গণতান্ত্রিক আদর্শের যে উচ্চাশা নিয়ে লেক সাকসেসে গিয়েছিলেন সে মোহ কিন্তু তাঁর ভেঙে যায়। কয়েকদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে তিনি বাধ্য হন—আর লেকসাকসেসে নয়, কাশ্মীরী-দের ভাগ্য কাশ্মীরীদের হাতেই নির্দ্ধারিত হবে। তাদের এই গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য যে কোন ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত।

গণতান্ত্রিক শক্তিকে রক্ষা করবার জন্য লেক সাকসেসের দিকে চেয়ে না থেকে ১৯৪৮ সালের ১২ই অক্টোবর শ্রীনগরে এক বিশেষ অধি-বেশনে ন্যাশনাল কনফারেন্স ভারতবর্ষের সঙ্গে কাশ্মীরের স্থায়ীভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে! কিন্তু যোগদানের সর্ত হলো এই যে, কাশ্মীরের পুনর্গঠন "নয়া কাশ্মীর" পরিকল্পনা মতই চলবে, এবং এই সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে স্পষ্টই বলা হলো যে:

"দীর্ঘদিনের মুক্তি সংগ্রাম এই শিক্ষাই তাদের দিয়েছে যে জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বা লোক বিভাগ দ্বারা সমাধান হ'তে পারে না। তাদের মুক্তির একমাত্র পথ হলো ধনদৌলত উৎপাদনের উৎসের জাতীয়করণ। মুনাফাখোরীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন ধনের জনগণের স্বার্থে সমবন্টন, এবং তার জন্য শোষণকারী ও মুনাফাকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম।"

প্রস্তাবে আরও বলা হলো যে, বর্তমানে কাশ্মীরবাসীকে যে গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হয়েছে তা-হতে মুক্তি লাভের একমাত্র

পথ হলো নয়া কাশ্মীরের প্রগতিশীল কর্মপন্থা ; এবং সে কাজ কখনই এই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে পারে না। পাকিস্তান জনগণের মধ্যে যে বিভেদের সূত্রপাত করেছে তা' দ্বারা জনগণের স্বার্থকেই তারা বিসর্জন দিয়েছেন। কাজেই ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে জমায়েৎ কাশ্মীরের স্থায়ীভাবে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত করলো। ভারতবর্ষের জনগণ ও সরকারের কাছে দাবী জানানো হলো যে, কাশ্মীরের এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামকে যেন তারা সর্বতোভাবে সমর্থন করে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংগ্রামই যে কাশ্মীরবাসীকে সকল বিভেদ-চক্রান্তের মুখেও ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য। সেই লক্ষ্যের কথাই সেখ আবদুল্লা তখন স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, "কাশ্মীর হবে সোস্যালিস্ট রিপাবলিক"। ন্যাশনাল কনফারেন্সের মুখপত্র 'খিদমত'ও দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, "কাশ্মীর প্রগতিশীল ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে এক সাথে অগ্রসর হবে। কারণ কাশ্মীর মুসলমানদের যেমন মাতৃভূমি, হিন্দু ও শিখদেরও সেইরূপ মাতৃভূমি। কাশ্মীরীগণ কখনই এই নীতি পরিত্যাগ করবে না" (৪-১-৫০)। কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক জমায়েৎ ব্যক্তিগতভাবে নেহরু বা গান্ধীকে তুষ্ট করতে যে ভারতে যোগ দেয় নাই সেকথাও সেখ সাহেব তখন বলেছিলেন। দারিদ্র্য ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে (২৭-১১-৪৭)। তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক চেতনায় পাকিস্তানের চেয়েও অগ্রগামী ; সুতরাং কাশ্মীরীরা ভারতের সঙ্গেই যোগ দেবে (১৩-১-৪৭)।

তখন আর এখন

পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরের নেতা সর্দার ইব্রাহিম বারে

বারে এই কথাই সদম্ভে ঘোষণা করছেন যে সেখ আবদুল্লা আজ মহারাজার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন। যে পাকিস্তানের দেশীয় রাজ্যে আজ পর্যন্ত কোন গণতান্ত্রিক পরিবর্তনই হয়নি, পাকিস্তানের সেই প্রতি-ক্রিয়াশীলদের আশ্রয়ে পুষ্ট সর্দার ইব্রাহিম স্পষ্টই সেখ আবদুল্লাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে আবদুল্লা সরকারের সাথে তার একমাত্র তফাৎ এই যে, সেখ আবদুল্লা মহারাজাকে কাশ্মীরে অধিষ্ঠিত রাখতে চান, আর "আমরা চাই রাজ্যে জনগণের সরকার!" (করাচী বক্তৃতা ১২-১-৪৮)। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর কিন্তু সেখ সাহেব একমাত্র "কাশ্মীর ছাড়" দাবীর পুনরুক্তির মধ্য দিয়েই করতে পারেন। কিন্তু তিনি ভারতের নূতন দেশীয় রাজ্যের নীতিকে গ্রহন করে মহারাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর নয়া দিল্লী থেকে "ফ্রী প্রেস"-এর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখ আবদুল্লা নাকি গণভোটের পূর্বে মহারাজার পদত্যাগ দাবী করেছিলেন। কিন্তু দু'দিন পরে সেখ সাহেব নিজেই এই সংবাদ অস্বীকার করে বলেন যে, তিনি মহারাজার পদত্যাগ চান নাই। তিনি যা চেয়েছেন তা' হচ্ছে, মহারাজা শাসন না করে রাজত্ব করুন। অথচ এই মহারাজা সম্পর্কে সেখ সাহেব নিজেই বলেছিলেন যে, "বর্তমানে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাশ্মীর জড়িয়ে পড়েছে তা মহারাজারই সৃষ্টি"—(২৯-৯-৪৮)।

বর্তমান সংকটে জাগ্রত কাশ্মীরীদের সম্মুখে মহারাজা তাদের গোলামীর প্রতীক। এই কারণেই তাঁরা "কাশ্মীর ছাড়" দাবীকে রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছে সেখ সাহেবেরই আহ্বানে, এবং গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা জয়যাত্রা করেছে নয়া কাশ্মীরের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে। সেখ আবদুল্লা সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করেন বলেই তিনি বলেছিলেন—"যে অল্প সংখ্যক শাসক সুদীর্ঘ কাল কাশ্মীরের জনগণকে

শোষণ করে এসেছে তাদের শোষনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আর্থিক উন্নতি বিধানই হবে কাশ্মীরীদের প্রকৃত জয়লাভ”—(২৯-৯-৪৮ তারিখের বিবৃতি)। কাশ্মীরের এই সংকট মুহূর্তে-তাঁকে আজ স্পষ্ট করে জনগণকে বলতে হবে কাশ্মীরে গোলামীর ও শোষণের প্রতীক রাজতন্ত্রের অবসান হবে কিনা। সমাজতান্ত্রিক “নয়া কাশ্মীরে” সামন্ত রাজের স্থান কী ভাবে থাকতে পারে ?

সমাজ সংস্কারের পথে

শাসনভার গ্রহন করবার পরেই সেখ সাহেব বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পরিকল্পিত আর্থিক নীতি প্রবর্তনে দেরী হলেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু কাশ্মীরে এই নীতি এখনই কার্যকরী করতে হবে। সেই পথ অনুসরণ করেই তিনি ও তাঁর মন্ত্রীসভা কাশ্মীরে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাজ সুরু করেন। শত্রুর আক্রমণে কাশ্মীরের বিপর্যস্ত রাজস্ব ও আর্থিক ভিত্তি একেবারে ভেঙে গেলে মহারাজার ব্যক্তিগত তহবিলের (Privy Purse) দেয় টাকা মাসিক ৪০,০০০ থেকে ১০, ০০ টাকায় ধার্য করেন। কিন্তু যেখানে নিজাম বাহাদুর বৎসরে ৫০ লক্ষ, গোয়ালিয়রের মহারাজা ২৫ লক্ষ, ইন্দোরের মহারাজা ১৫ লক্ষ, উদয়পুরের মহারাজা ৫ লক্ষ টাকা ভারত ডোমিনিয়নে পাচ্ছেন এবং পাকিস্তানে যেখানে রাজা-মহারাজাবৃন্দ অবাধ শোষণ চালাবার সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে কাশ্মীরের মহারাজা এই অল্প টাকায় তুষ্ট হবেন কেন ? আজ পর্যন্তও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিলের এই কাটছাট মেনে নেন নি।

এরসঙ্গে জায়গীরদারী প্রথাকে উচ্ছেদ করে প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে আনবার সাথে সাথে পতিত জমিতে সরকারী প্রচেষ্টায় কাশ্মীরে সর্বপ্রথম ছোট ছোট সমবায় সমিতির অধীনে চাষের ব্যবস্থা করে ভূমিহীন

কৃষকদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার প্রচেষ্টাও সুরু হয়। চাষীকে উৎপন্ন ফসলের তিন-চতুর্থাংশের অধিকারী বলে আইনও করা হয়েছে। পূর্বে জমির মালিকেরা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকেরও বেশী গ্রাস করত। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ঋণ মকুবের জন্যও ঋণসালিশী আইন করা হয়েছে।

জমির মালিক কে?

'কৃষকেরাই জমির প্রকৃত মালিক'—এই নীতি ন্যাশনাল কনফারেন্স সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে নিজ আদর্শ বলে কী ভাবে গ্রহন করেছে তা আমরা আগেই বলেছি; এবং একথাও বলেছি যে, মাটির টানে কৃষকের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা সমাজের কৃত্রিম বাধাকে ভেঙে আত্মপ্রকাশ করতে চায় তা কনফারেন্সের আদর্শের মধ্যে কী ভাবে প্রধান স্থান লাভ করেছে। কাজেই সেখ আবদুল্লা যখন সর্বপ্রথম তাঁর সরকারের নীতি ঘোষণা করেন তখন তিনি বলেন, "আমার সরকারের মূল নীতি হলো সর্বপ্রকার শোষণ সমূলে দূর করা এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীবিভাগের অবসান করা।" কনফারেন্সের পতাকাকে লক্ষ্য করে তিনি তখন একথাও বলেছিলেন যে, ঝাণ্ডার লাল রং মজুরের এবং লাঙল কৃষকের প্রতীক। আজ কাশ্মীরের সরকারী দপ্তরে এই ঝাণ্ডা উঠাবার অর্থ হলো, কাশ্মীরে মানুষের দ্বারা আর মানুষের শোষণ চলবে না।"—(৯-৫-৪৮ তারিখ শ্রীনগর সেক্রেটারিয়েটে সেখ সাহেবের ভাষণ)।

সেখ সাহেবের এই আদর্শ আজও কাশ্মীরে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। যদিও জমিদারী প্রথাকে উচ্ছেদ করে কৃষকের হাতে জমি দেবার চেষ্টা চলেছে কিন্তু যে আইন ও কমিটির সাহায্যে এইসব করা হচ্ছে তাতে পাঁচ বৎসরের আগে কিছু হবার আশা কম। তার ওপর এই জমিদারী উচ্ছেদের কমিটিতে জমিদারদের প্রতিনিধিদেরও স্থান দেওয়ায় কাজের বাধা ও বিলম্ব হচ্ছে। এই বিলম্ব জনতার মধ্যে এনে দিয়েছে তীব্র অসন্তোষের

ভাব। ন্যাশনাল কনফারেন্সের জেনারেল কাউন্সিলের যে অধিবেশন গত এপ্রিল মাসে হয় তাতে ৭ শত প্রতিনিধির কাছে যখন প্রত্যেক মন্ত্রী আপন আপন বিভাগের কাজের জবাবদিহি করেন তখন অর্থমন্ত্রীকে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে "নয়া কাশ্মীর" পরিকল্পনাকে অবিলম্বে প্রবর্তন করতে কেন দেরী হচ্ছে তার জন্য প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয়।

কাশ্মীরীদের এই আগ্রহের মূল কারণ জানেন বলেই ভূমি ও রাজস্ব সচিব মহম্মদ আফজল বেগ গত ১৮ই মার্চ আবার বলেছেন যে, কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ কৃষাণকে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ঝাণ্ডার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে হলে কৃষককেই জমির মালিক বলে স্বীকার করতে হবে। কৃষকের অর্থনৈতিক বন্ধন-মুক্তি ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। সেখ আবদুল্লা যদিও এই আদর্শ কনফারেন্সের আদর্শ বলে অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তাঁকে একথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে—"জমিদারদের যাতে উপোষ করতে না হয় তাও তিনি দেখবেন"—(৯-৫-৪৮ তারিখ শ্রীনগর সেক্রেটারিয়েটে বক্তৃতা)। এই থেকেই বোঝা যায় ভেতর থেকে জমিদারী প্রথা অবসানের বিরুদ্ধে দৃশ্য ও অদৃশ্য বাধা কীভাবে এসেছে! কিন্তু কাশ্মীরে প্রগতিশীল গণশক্তিও সজাগ প্রহরীর ন্যায় ন্যশনাল কনফারেন্সের নেতাদের বাধ্য করছে জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে পরিচালনা করতে। তাই সেখ সাহেব কনফারেন্সের জেনারেল কাউন্সিলের গত এপ্রিল মাসের অধিবেশনে আবার ঘোষণা করেছেন যে' ন্যাশনাল কনফারেন্স "লাঙল যার জমি তার"—এই নীতি থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না। শুধু তাই নয় কনফারেন্সের এই অধি-বেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে যে, শোষক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত আছে এমন কোন ব্যক্তি কনফারেন্সের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত পর্যন্ত হতে পারবে না (এই সংবাদটী কেবলমাত্র মাদ্রাজের "হিন্দু"

পত্রিকায় ১৬-৪-৫০ তারিখে প্রকাশিত হয়, অন্য কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি)।

কাশ্মীরে আরও কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে সশস্ত্র জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন অন্যতম। এই বাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষে যখন সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হচ্ছে, এমনকি ছাত্র ও যুবকদেরও বলা হচ্ছে যে তারা যেন সযত্নে রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে চলে, তখন কাশ্মীরে দেশ প্রেমিক যুবকদের রাজনীতিতে শিক্ষা দিয়ে জাতীয় রক্ষী বাহিনী (National Militia) গঠন করা হয়েছে। পরলোকগত ব্রিঃ ওসমান এই বাহিনী সম্বন্ধে বলে গিয়েছেন যে এই বাহিনী ভারতের সামরিক ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় রচনা করেছে, কারণ এই সর্ব প্রথম যুবকদের রাজনৈতিক জ্ঞানে শিক্ষা দিয়ে দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে সৈন্য বাহিনীতে সংগঠিত করা হচ্ছে—(২৮-৪-৪৮ তারিখে শ্রীনগরে বক্তৃতা)।

বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নিরাপত্তা পরিষদের "ম্যাকটন প্রস্তাবে" কাশ্মীরে নিরস্ত্রীকরণের নামে এই বাহিনীকেই ভেঙ্গে দেবার দাবী করা হয়েছে, এবং স্যার আওয়েন ডিক্সন এই প্রস্তাব নিয়েই ভারতবর্ষে এসেছেন ২৭শে মে তারিখ। ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সাথে সুর মিলিয়ে আরও একজন এই বাহিনীকে ভেঙ্গে দেবার জন্য প্রস্তাব করেছেন তিনি হচ্ছেন "আজাদ কাশ্মীর" বাহিনীর নেতা সর্দার ইব্রাহিম। তিনি কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাবার শেষ চেষ্টা ক'রে বলেছেন যে যদি সেখ আবদুল্লা জাতীয় বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে একটী মুসলিম রক্ষী বাহিনী গঠন করেন তাহলে তিনি সেখ সাহেবের সঙ্গে আপোষ করতে পারেন! (২০-৪-৫০ তারিখের বিবৃতি)।

আবার গণজাগরন?

কাশ্মীরে আর একটি ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে

চোরাকারবারীর জন্য "চাবুক মারা" শাস্তির ব্যবস্থা। জনসাধারণের এই শত্রুর জন্য শাস্তি বিধানের দৃঢ় ইচ্ছা কাজে রূপান্তরিত করেছেন কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দ। গত ২৮।১২।৪৯ তারিখ দশ হাজার জনসাধারণের সামনে একজন লবণের চোরাকারবারীকে প্রকাশ্যে বেত মারা হয়। সমাজের এইরূপ ঘৃণিত শত্রুদের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় এইরূপ কঠোর শাস্তি ব্যবস্থার ফলে কনফারেন্সের জনপ্রিয়তাও বেড়ে গিয়েছে। বক্সী গোলাম মহম্মদ দৃঢ়ভাবেই বলেছেন যে কাশ্মীরে সমাজ বিরোধী শক্তির সঙ্গে কোন আপোষ নেই। মজুতদার ও মুনাফা খোঁরীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিনাম যে কী তা চিন্তা করেই কাশ্মীরের ধনিকদের মুখপাত্র বনিক সভা (Chamber of Commerce) শঙ্কিত হয়ে উঠে কাশ্মীরে শিল্পোন্নতির সকল কাজ বন্ধ রেখেছে। অপর দিকে নয়া কাশ্মীরের নীতি অনুসারে শিল্পের জাতীয় করণ এখনও আরম্ভ না করবার ফলে, এবং নুতন কোন শিল্প ব্যবস্থা না গড়ে ওঠায় জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারী বেড়ে যাচ্ছে। এর সাথে কাশ্মীরেও যুদ্ধের ফলে প্রায় লক্ষাধিক গৃহহারা নরনারীর পুনর্বসতির সমস্যাও যোগ হয়েছে। কিন্তু এই সমস্যায় জর্জরিত হয়েও জাগ্রত কাশ্মীর তার "নয়া কাশ্মীরে"র কথা ভোলে নাই। জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শের কথা আর জোরের সঙ্গে প্রচার করবার জন্য ও কনফারেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য কাশ্মীরের প্রগতিশীল সাহিত্যিক, শিল্পী ও সঙ্গীতকার এক লোকনাট্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রাতষ্ঠানের আহ্বানে সাধারণ কাশ্মীরের মধ্য থেকে বেড় হয়েছেন কবি "আসী" যাকে "কুলি কবি" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন সাধারণ দিনমজুর কিন্তু নয়া কাশ্মীরের ডাক তাঁর অন্তরের কবি মানসকে জাগিয়ে তুলেছে। তিনি কাশ্মীরের 'অখ্যাত জনের, নির্বাক মনের' আশাআকাঙ্খার ভাবকে ভাষায়

রূপান্তরিত করেছেন। কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনগণ সেই ডাকে আবার সাড়া দিয়ে উঠেছে। অস্তাচলের পারে দাঁড়িয়ে বোধহয় এমনই এক কবির উদ্দেশ্যে ভারত রবি আহ্বান জানিয়ে গিয়েছিলেন যে—

"মর্মের বেদনা করিয়া উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

কাশ্মীরের জনসাধারণের 'মর্মের বেদনা' মথিত "নয়া কাশ্মীরের" বানীকেই তিনি প্রচার করছেন। তিনি প্রচার করছেন সেই সমাজ ব্যবস্থার দাবীকে যেখানে রাজা বাদশাহের শোষণ আর থাকবে না, যেখানে বেকারী থাকবে না, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে যে, যে-মহারাজার শোষণের বিরুদ্ধে সেখ সাহেব তাদের "কুইট্ কাশ্মীরের" মুক্তি-সংগ্রামকে পরিচালনা করেছেন তিনিই আজ মহারাজার প্রধানমন্ত্রীরূপে বিরাজ করছেন, তিনিই আবার রাজপুত্রের বিয়েতে উপহারের ডালা সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সর্বোপরি তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্তেও নয়া কাশ্মীরের পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত হচ্ছে না। সেখ সাহেবের এই দুর্বলতার সুযোগ পাকিস্তানে পুরোপুরি নিয়েছে।

কাশ্মীরে তাই জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আবার চতুর্দিকের চক্রান্ত থেকে বাঁচবার আশায় তারা দাবি করেছে ইউ-এন-ও থেকে কাশ্মীর প্রশ্নকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে, কাশ্মীরকে স্বাধীন রিপাবলিক বলে ঘোষণা করতে এবং সর্বোপরি ইঙ্গ-মাকিন ব্লকের মনোনীত মধ্যস্থের হাতে কাশ্মীরের ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে বলেছে কাশ্মীরে কাশ্মীরীদের কথাই শেষ কথা।

কাশ্মীরের জমাট বাঁধা বরফকে সরিয়ে এক সম্পূর্ণ নূতন কাশ্মীর বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাই কাশ্মীরে আবার আজ—

"গলে গলে পড়ছে বরফ—
ঝরে ঝরে পড়ছে জীবনের স্পন্দন—"

আবার লাল জুজুর জিগীর

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কাশ্মীরে যে সামান্য প্রগতিশীল পরিবর্তন হচ্ছে তাতেই কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই! ব্রিটিশ বণিক-স্বার্থের মুখপত্র স্টেট্সম্যান পত্রিকা গত দুই বৎসর ধ'রে আতঙ্কের চিৎকার সুরু করেছে যে, কাশ্মীরে কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং সোভিয়েট সীমান্তবর্তী কাশ্মীর সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন এচিসনও কাশ্মীরের ব্যাপারে এট্লী-ট্রুম্যানের "কড়া" আবেদনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরুকে লালাতঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যাকে দেখবার জন্যই পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা, ত' গোড়া থেকেই বলতে সুরু করেছেন যে, আবদুল্লা গভর্ণমেণ্ট কমিউনিস্ট গভর্ণমেণ্ট। যে সর্দার ইব্রাহিম কথায় কথায় কাশ্মীরে মহারাজার শাসনের অবসান (?) দাবী ক'রে থাকেন এবং কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান তিনিও কিন্তু কাশ্মীরে এই প্রগতিশীল পরিবর্তনে আঁৎকে উঠে বলতে সুরু করেছেন যে কাশ্মীরে সেখ আবদুল্লার 'আধা কমিউনিস্ট' সরকার স্থাপিত হয়েছে এবং "নয়া কাশ্মীর" কমিউনিস্টদের দলিল—(ঢাকার দৈনিক আজাদ (২৯-১১-৪৯) পত্রিকায় প্রকাশিত সর্দার ইব্রাহিমের লণ্ডনে এক প্রেস কন-ফারেন্সের রিপোর্ট)। ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল একই রকমভাবে আবদুল্লা-সরকারের বিরোধিতা করাতে আরম্ভ করেছে এবং কাশ্মীরে কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের আখ্যা দিয়ে এই প্রগ্রতিশীল আন্দোলনের

বিরোধিতা করছে। (দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি ন্যাশনা-লিস্ট' '৫০ সালের মে মাসের ৪টি সংখ্যা ও কলিকাতার দৈনিক বসুমতি ১৮।৫।৫০ তারিখ দেখুন)। শুধুমাত্র তাই নয়, এরা মহারাজার পক্ষে প্রচার কার্য বেশ খোলাখুলিভাবেই এখন করতে আরম্ভ করেছে। শোনা যে, এদের পেছনে জম্মু ও কাশ্মীরের শুধু হিন্দু জমিদার-মহাজন শ্রেণীই নয় মুসলমান জায়গীর শ্রেণীও আছেন। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য বিভাগও মহারাজার অপসারণের কথা কাশ্মীরের এই সংকটময় মুহূর্তেও বলছেন না।

সোভিয়েট ও কাশ্মীর

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে হতে পারে যে কাশ্মীর সমস্যার প্রতি সোভিয়েটের মনোভাব কী? সোভিয়েট কী কাশ্মীরকে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ-ন্বেষীদের মত পরোক্ষে কবলিত ক'রে সামরিক ঘাঁটি করতে চায়? নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে কাশ্মীর সমস্যা যাতে বাইরের কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠির স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে কাশ্মীরের জনগণের স্বার্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই সমাধান হয় সোভিয়েট তাই চান। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের লণ্ডন সংবাদদাতা ১৯৪৭ সালের ৮ই নভেম্বর লণ্ডনের বিশেষ দায়িত্বশীল সোভিয়েট মহলের মনোভাব উল্লেখ ক'রে এক সংবাদে বলেছিলেন—"কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী যে শক্তি তার প্রতিই সোভিয়েটের সমর্থন রয়েছে"—(হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৯-১১-৪৭)।

হানাদারদের সম্বন্ধেও ঐ মহলের মত হলো যে, হানাদারদের পেছনে কাশ্মীরে মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই সমর্থন রয়েছে। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ইন্দোনেশীয়াতে ডাচ সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ও ইন্দোনেশীয়ার স্বার্থন্বেষী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের

মুখপাত্র ওয়েষ্টালিংয়ের কুকীর্তি দেখে কি তা অস্বীকার করা যায়? হায়দরাবাদে অষ্ট্রেলিয়ান বৈমানিক সিডনী কটনের কুকীর্তির কথা আমরা আজও ভুলতে পারি কি? ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ যে কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে ব্যর্থ করবার জন্য যে চক্রান্ত করছে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ আছে কি?

জাগ্রত কাশ্মীরে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ

কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রাম আজ চরম সংকটের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার দানব তার দিকে চেয়ে ছুরি শানাচ্ছে, আর একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের স্বার্থবাদীরদল কাশ্মীরের প্রগ্রতিশীল গণতন্ত্রের সংগ্রামকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। গিলগিটকে ইতিমধ্যেই কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং "আজাদ কাশ্মীরের" অধিকৃত মীরপুর ও পুঞ্চে কার্যত পশ্চিম পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই রাজত্ব চলছে। পাকিস্তান তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সমস্ত কাশ্মীরকেই গ্রাস করতে চায়, কাশ্মীরের, ভারতবর্ষের এবং পাকিস্তানেরও জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে—যেমনভাবে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে গ্রাস করেছে। বিলম্বে হলেও স্বাধীন "পাখতুনিস্তানের" দাবীতে আজও তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যেমন হয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালী জাতির ঐক্যের সামান্যতম সম্ভাবনার গণতান্ত্রিক আত্মপ্রকাশে ও নয়া কাশ্মীরের দাবীতে।

১৯৪৭ সালের এক চরম মুহূর্তে কাশ্মীরে প্রগতিশীল শক্তিকে রক্ষা করবার জন্য যে অভিযান ভারতবর্ষকে চালাতে হয়েছিল তাতে দল-মত-নির্বিশেষে সকলেরই সমর্থন ছিল। শান্তিকামী মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সংগ্রামকে সমর্থন করে গিয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু স্পষ্ট ভাষায় বারে বারেই

বলেছেন যে, কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক শক্তিকে পশু-শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই কাশ্মীরে এই লড়াই। কোন রাজা-মহারাজাকে রক্ষা করবার জন্য নয়। এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে কোন কিছুতেই তাঁরা পিছু হটবেন না—একথাও বহুবার ভারতীয় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্ন বারে বারে উঠেছে যে, সেই সংগ্রামকে অসমাপ্ত কেন রাখা হলো? পুঞ্চ ও মীরপুরকে কেন শত্রুমুক্ত করা হলো না? কেন গিলগিটে শীতের অবসানে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানকে বন্ধ করে গিলগিটকে হানাদারদের হাতে তুলে দিতে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত স্বীকার করলেন? শুধু তাই নয়, সর্বশেষ যে প্রস্তাব শান্তির নামে করা হচ্ছে তাতে মনে হয়, ভারতবর্ষকে কাশ্মীর বিভাগ মেনে নিয়েই আপোষ করতে হবে। ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে প্রস্তাব উঠেছে যে, জম্মু ও লাদাক ভারতবর্ষে আসবে আর মীরপুর, পুঞ্চ ও গিলগিট পাকিস্তানে যাবে; শুধু কাশ্মীর উপত্যকায় গণভোট গ্রহন করা হবে ('সত্যযুগ' পত্রিকার লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট—১৩-৫-৫০)। অর্থাৎ কার্যত যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা ধরেই কাশ্মীর বিভাগ হয়ে যাবে। মহাত্মা গান্ধী, যাঁকে আমাদের নেতৃবৃন্দ কথায় কথায় স্মরণ করে থাকেন তিনি কি একথা বলেন নি যে, ভারতবর্ষকে দু'ভাগ করা হয়েছে তাই যথেষ্ট; কাশ্মীরকে যেন দু' টুকরো করা না হয়; তিনি কি বলেন নি যে, কাশ্মীরের ভাগ্য একমাত্র কাশ্মীরীরাই নির্ধারণ করবে এবং সেখানে জনগণের কথা ও তাদের স্বার্থই সকলের চেয়ে বড় ও সত্য! পণ্ডিত নেহরু অবশ্য ঘোষণা করছেন যে কাশ্মীরীদের ভাগ্য কাশ্মীরীরাই নির্দ্ধারণ করবে। কিন্তু জাগ্রত কাশ্মীরের জনসাধারণ "নয়া কাশ্মীরে"র শপথ নিয়ে তাদের পথকে কি তারা অনেক আগেই বেছে নেয় নি? তাই আজকের সমস্যা হ'লো সামরিক ঘাঁটি অন্বেষণ-কারী ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের হাত থেকে ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতাবাদী

প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত থেকে এই নূতন কাশ্মীরের বাঁচবার উপায় নির্ধারণ করা।

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, পাকিস্তান জোর করে কাশ্মীরকে জয় করতে এসে সমূহ পরাজয়ের মুখেই গণভোটের কথায় সম্মত হয়। গোলাম মহম্মদ বক্‌শী তাই স্পষ্টই বলেছিলেন যে, কাশ্মীরে পাকিস্তান গণ-ভোটের দাবীর অধিকার হারিয়েছে। পশুবলের আক্রমণ আর গণতান্ত্রিক গণভোটের অধিকার পরস্পর-বিরোধী। কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এখন পাকিস্তানের কথা বলবার কোন নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই। তিনি কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাবকে গ্রহন ত' করেনই নাই, তিনি বরং দাবী করেছেন যে, কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি জমি পুনরায় কাশ্মীরের সঙ্গে গিলগিটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যুক্ত করতে হবে। সেখ আবদুল্লাও এই কথাই বারে বারে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ বিভাগের ষড়যন্ত্রের মুখে সেখ সাহেব দাঁড়াতে পারবেন কি? গোলাম মহম্মদ বক্‌শী কিন্তু বলেছিলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্মত হলেও কাশ্মীর দেশ বিভাগে সম্মত হবে না (১।৪।৫০ তারিখের বিবৃতি) এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর বিকল্প প্রস্তাব আছে। কিন্তু বিকল্প প্রস্তাব কী তা' তিনি বলেন নি।

পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা ও কাশ্মীর

পূর্ব বঙ্গের দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে পণ্ডিত নেহরু বলে-ছিলেন যে, কাশ্মীর ও পূর্ব বঙ্গের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে পূর্ব বঙ্গের ক্ষুধিত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে আনবার প্রয়াসকেই এই দাঙ্গার কারণ বলে অনেকেই বলেছেন। একথাও বলা হয়েছে যে এই সাম্প্রদায়িক আগুন যাতে ভারতবর্ষেও জ্ব'লে, সেখানেও একই অবস্থার

সৃষ্টি করে, এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান প্রধান কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জলে ওঠে তাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেখ আবদুল্লা ও ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের আদর্শকেই কাশ্মীরের পথ বলে বারে বারে ঘোষণা করছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছেন, কাশ্মীরী জনগণ গান্ধীজীর প্রদর্শিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথকেই আপনাদের পথ বলে গ্রহন করেছে। নয়া কাশ্মীরের নয়া জগৎকেই তারা গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তারা দুই জাতি তত্ত্বকে চিরদিনের মত শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদানের মধ্য দিয়ে পিছু ফেলে এগিয়ে গেছে।

পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছেন যে, শান্তিপূর্ণ পথেই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রকার প্রয়াস করা হবে। কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের মধ্যে থেকে কি গণতান্ত্রিক পথে কাশ্মীর সমস্যা সমাধাণের কোন সুযোগ মিলবে? সীমান্ত প্রদেশে বৃটিশের গণভোটের কারসাজি এবং বীর খান ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাবাসের কথা কাঁটা হয়ে আমাদের প্রাণে প্রতিদিন কি বাজে না? আজ এই সন্দেহ কর্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে যে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হ'লে তারা আপন স্বার্থে কাশ্মীরকে বলি দিয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে তুষ্ট ক'রে কাশ্মীরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়াসে লেগে যাবে। ম্যাকনটন প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য যে এই, সেকথা অনেকেই বলেছেন। আর স্যার ওয়েন ডিক্সনের আগমণে অনেকেই কাশ্মীর বিভাগ অনিবার্য মনে করেন।

স্বাধীন কাশ্মীর?

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা স্মরণ করতে পারি যে, সেখ আবদুল্লা নাকি কয়েকবার কাশ্মীরের স্বাধীনতার কথা কয়েকটী বিদেশী সাংবাদিকের কাছে বলেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি প্রকাশ্যে সে কথা অস্বীকার করেছেন ("হিন্দু" পত্রিকা ৫।৫০)! কিন্তু "সোস্যালিস্ট রিপাবলিক"

রূপেই সেখ সাহেব কাশ্মীরকে কল্পনা করেছেন একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু কাশ্মীরকে যদি সোস্যালিস্ট রিপাবলিকে পরিণত করতে হয় তবে তাকে এক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হ'তে হবে এবং মহারাজার শাসনের বদলে এক শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থাকেও অবশ্যই কায়েম করতে হবে। কাশ্মীরের নেতারা কিন্তু সেকথা আজ আর জোর করে বলছেন না! কিন্তু তাদের কথার মধ্য দিয়ে আকাঙ্খার যে সামান্যতম ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছিলো তাতেই বৃটিশ স্বার্থের মুখপত্র স্টেট্সম্যানের টনক নড়েছে। গত ২৭শে মে তারিখে স্টেটসম্যান ভারত ও পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছে কাশ্মীরের দেশরক্ষা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ও যাতায়াত-ব্যবস্থাকে যুক্তভাবে গ্রহণ করতে ও এইভাবে পঙ্গু কাশ্মীরকে "স্বাধীনতা" দেবার নাম ক'রে তার প্রগতিশীল আন্দোলনকে মুঠোর মধ্যে আনতে।

পণ্ডিত নেহরু গত ১৬ই এপ্রিল শ্রীনগরের এক বক্তৃতায় অবশ্য ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীরীরাই কাশ্মীরের ভাগ্য স্থির করবে। তারা যদি বিচার ক'রে স্থির করে যে কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দেবে তাতেও তাঁর খেদ নেই। শ্রীনগরের জনসাধারণ কিন্তু পণ্ডিত নেহরুকে "নয়া কাশ্মীর জিন্দাবাদ" ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করেই আভাষ দিয়েছে তাদের পথ কী? অন্য দিকে সেখ আবদুল্লাও বলেছেন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শই কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

"নয়া কাশ্মীর" সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে কিছুই এখনো না বলায় সমস্যা ক্রমশ জটিল হচ্ছে। কারণ কাশ্মীরের আসল সমস্যা ভারতবর্ষে বা পাকিস্তানে যাওয়া নয়, আসল সমস্যা হলো কাশ্মীরী জনসাধারণের সামন্ত-প্রথার হাত থেকে গণতান্ত্রিক সমাজের পথে মুক্তি লাভের সমস্যা। তাতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের নেতারা কী সাহায্য

করেন তার মধ্য দিয়েই কাশ্মীরের নরনারীর প্রতি তাদের সত্যিকারের মনোভাব ফুটে বেরুবে। "কাশ্মীর কাশ্মীরীদের"—এই কথাকে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তকারীদের অক্টোপাসের বাঁধন ছিঁড়ে সফল ও সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে কাশ্মীরে "নয়া কাশ্মীরের" ভিত্তিতে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করাই হবে জনসাধারণের চিত্ত জয়ের সুনিশ্চিত পন্থা। মহারাজা-বিহীন শোষণ-বিমুক্ত গণতান্ত্রিক কাশ্মীরই হবে পাকিস্তানের প্রতি যোগ্য প্রত্যুত্তর। অপর দিকে যদি পাকিস্তান তার দেশীয় রাজ্যে রাজা-বাদশাহের শাসন ও শোষণের অবসান ক'রে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিযোগিতা করতে চায় তবেই তার অধিকার আছে কাশ্মীরে গণভোট দাবী করবার এবং তখনই শুধু কাশ্মীরীদের স্বার্থে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে। অন্যথায় 'ইসলামী গণতন্ত্রের' ভাঁওতা থেকে কাশ্মীরের জনগণকে রক্ষা করাই হবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পবিত্র কর্তব্য। সমাজ-জীবনে সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করে যে আন্দোলন নূতন সভ্যতার আলোকে নবজীবনের পথে চলতে আরম্ভ করেছে তাকে শান্তির নামে কিছুতেই মধ্য যুগের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক হবে না।

ডিক্সনের দুতিয়ালী

সম্প্রতি কাশ্মীরে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের আসল উদ্দেশ্য নগ্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। প্রথমত ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের কবলিত রাষ্ট্র সঙ্ঘের "মধ্যস্থ" স্যার ওয়েন ডিক্সন কাশ্মীর বিভাগের পরিকল্পনাকে পরোক্ষভাবে ভারত সরকারকে দিয়েই প্রস্তাবিত করিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত খোলা-খুলিভাবেই তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা ধ'রে কাশ্মীর বিভাগ হয়ে গেলে মাত্র কাশ্মীর উপত্যকায় গণভোটের প্রহসন

করা হবে ; এবং তার জন্য তিনি দাবী করেছেন, কাশ্মীরে আবদুল্লা-সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্র সঙ্ঘের নামে কাশ্মীরে ইঙ্গ-মাকিন ব্লকের গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে হবে (স্যার ওয়েন ডিক্সনের বিবৃতি, ২২-৮-৫০)। এই প্রস্তাব লিয়াকৎ আলী সাহেব প্রত্যাখ্যান করেছেন এই ব'লে যে, সমগ্র কাশ্মীর ভিন্ন কিছুতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না। আর পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তানের সঙ্গে অর্ধেক কাশ্মীর দিয়েও "আপোষ" করতে ব্যর্থ হওয়ায় বলেছেন যে, কাশ্মীরে আবার "পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়া গেল"। তিনি আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্র সঙ্ঘকে ১৯শে সেপ্টেম্বরের বার্ষিক বৈঠকে কাশ্মীরে "আক্রমণকারী" কে, তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে এবং সেই মত কাজ করতে হবে।

খুবই লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই ভাগাভাগির প্রস্তাব তোলা হয়েছে এমন সময় যখন কাশ্মীরে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা ঘোষণা ক'রে সেখ সাহেব পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে কৃষকদেরও আহ্বান করেছেন জমিদারদের নিকট হ'তে লড়াই ক'রে এই দাবী আদায় করতে (১৩-৭-৫০ তারিখের বিবৃতি)। অবশ্য সেখ সাহেব কাশ্মীরে এখনো যুবরাজের আসনকে অটুট রেখেই এই কথা ঘোষণা করেছেন এবং ভারত সরকারের চাপে জমিদারদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছেন। কাজেই তাঁর এই কথা সাধারণ কাশ্মীরীকে কতখানি প্রেরণা দেবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নয়া সংস্কারের ফলে কাশ্মীরে প্রায় ৩০ হাজার ভূমিহীন কৃষি-পরিবার চাষযোগ্য জমি পাবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কাশ্মীরে আবার সংঘাত প্রত্যাসন্ন। কাজেই "নয়া কাশ্মীরের" আদর্শকে ভিত্তি করেই যে এই সংগ্রাম জ্বলে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই সংগ্রামকে ইঙ্গ-মাকিন চক্র দেশ ভাগা-

ভাগি ক'রে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে চাইবে ; আর পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কাশ্মীরে নূতন ক'রে "সীমান্ত" প্রদেশের খেলা খেলতে চাইবেন। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারত ও কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত কী পথ অবলম্বন করেন তার ওপর আপাততঃ কাশ্মীরের ভবিষ্যত অনেকখানি নির্ভর করলেও কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামের এইটাই শেষ পর্যায় নয়। আজ যদি ভারত ও কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দ "নয়া কাশ্মীরের" সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য মামুলি পথ ত্যাগ করে বৈপ্লবিক পথে না চলেন তবে কাশ্মীর তথা ভারতের জনসাধারণ তাদের পশ্চাতে ফেলেই মুক্তিপথের জয়যাত্রায় এসিয়ার অন্যান্য দেশের মতই সুকঠোর পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।